মাতৃভাষাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। মাতৃভাষায় সুসমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হলে শিক্ষার বিস্তার ঘটবে জনসাধারণের মধ্যে। ইংরেজী ও সংস্কৃত একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার এইটিই ছিল উদ্দেশ্য। ব্যালেন্টাইনের চোখে তা ধরা পড়েনি। বিদ্যাসাগর ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের উপর মোয়াটকে ১৮৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে, তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখেছেন[৩৮], "Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowldege through the medium of English and you may rest assured that before a few years are over, I shall be enabled, if supported and encouraged by the Council, to furnish you with a body of youngmen who will be better qualified by their writings and teachings to diseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of educated clever of any of your colleges whether English or Oriental."

সংস্কৃত কলেজের সংস্কারের উদ্দেশ্যটি যে শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক হওয়া, বিদ্যাসাগর তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। এটিই ছিল তাঁর প্রিয়তম লক্ষ্য (darling object)। সংস্কৃত কলেজ জনশিক্ষাপ্রসারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহ করবে, যে শিক্ষকরা মাতৃভাষায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে পারবেন অনায়াসে। তাঁর শিক্ষা-চিন্তার মূল কথাই ছিল বাংলাভাষাকে শক্তিশালী করে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযুক্ত বাহন করে তোলা এবং বাংলাভাষার মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কার সেই লক্ষ্যের পথে প্রথম পদক্ষেপ।


প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর



ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

PRASANGA VIDYASAGAR

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

টাইপ সেটিং ঃ
ক্যালকাটা লেসার গ্রাফিক্‌স্‌ (প্রাঃ) লিঃ
৭১, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

বিক্রয়কেন্দ্র
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

আমার বাবার স্মৃতিতে

১

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর ঃ পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক প্রভাব

১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসে আট বৎসরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন ঠাকুরদাসের সঙ্গে বীরসিংহ থেকে কলকাতা রওনা হন, তখন ঐ অঞ্চলের ছাত্রদের পড়শুনার জন্য বাইরে যাওয়ার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বীরসিংহ এবং পাশাপাশি গ্রামেই অনেক টোল-চতুষ্পাঠী ছিল; সংস্কৃতে আরও উচ্চশিক্ষার জন্য নবদ্বীপ, বারাণসী ইত্যাদি দূরবর্তী স্থানে যেতে হোত। শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি জায়গায় এবং ভাগীরথীর ওপারে কলকাতায় ইংরেজী শেখার স্কুল ছিল। প্রথমদিকে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে, ইংরেজী স্কুলে পড়লে ছেলেরা খ্রীষ্টান হয়ে যায় কিংবা নাস্তিক হয়[১]। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার ফলে জীবিকা অর্জনের সুবিধা হয়, এই সত্যটি প্রতিপন্ন হওয়ার পর অবশ্য পুরাতন বিশ্বাসটির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

বিদ্যাসাগরের জন্মকালে (১৮২০) বীরসিংহ ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত ক্ষীরপাই মহকুমার একটি গ্রাম। ১৮৬৪ সালে ক্ষীরপাই থেকে জাহানাবাদে মহকুমার সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয়, এবং মহকুমার নাম হয় জাহানাবাদ মহকুমা। ১৮৭২ সালে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা ও ঘাটালকে হুগলী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়, এবং ঘাটালে করা হয় একটি নোতুন মহকুমার সদর-দপ্তর। জাহানাবাদকেও হুগলী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরে ১৮৭৯ সালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য জাহানাবাদকে পুনরায় হুগলী জেলায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯০০ সালে জাহানাবাদের নাম হয় আরামবাগ[২]।

বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে হুগলী নদীর তীরবর্তী হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর উত্তরপাড়া, বৈদ্যবাটী ইত্যাদি শহরগুলি এবং নদীর ওপারে কলকাতা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। জীবিকা অর্জনের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হয়ে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভীড় করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বর্তমানের ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমা ক্রমাগত বন্যা ও মহামারীর প্রকোপে ধীরে ধীরে নগর-সভ্যতার কেন্দ্রগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্গম ও অস্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রাম রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অবশ্য এই অঞ্চলের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। সেই সময়ের দূরবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে এই অঞ্চলের সড়ক-যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট উন্নত। বণিক, পর্যটক, তীর্থযাত্রী ও সৈন্যদলের যাতায়াতে সড়কপথগুলি সর্বদাই ব্যস্ত থাকত। এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিও ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও যথেষ্ট অগ্রসর। পাঠান-মোগল শাসনকাল থেকেই ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা, খড়ার, রাধানগর,

ভুরিশ্রেষ্ট (হাওড়া জেলার ভুরশুট) ইত্যাদি জনপদের নাম ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি-শিল্প এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। রেশম, মসলিন, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি শিল্প ও সংস্কৃত-শিক্ষার কেন্দ্ররূপে এই স্থানগুলির পরিচিতি ছিল। বিদেশী বণিকেরাও বাণিজ্যের প্রয়োজনে চন্দ্রকোনা, ক্ষীরপাই, রাধানগর প্রভৃতি স্থানে তাঁদের কুঠি স্থাপন করে[৩]। সেই সময়কার বাদশাহী সড়ক বর্ধমান থেকে গড়-মান্দারণ হয়ে খানাকুল-শিয়াখালার ভেতর দিয়ে হাওড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমান থেকে বুদ্‌বুদ্‌চটি হয়ে বারাণসী পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়েই যাওয়া যেত। সেইজন্য আজও হাওড়ার বাঁধাঘাট থেকে শিয়াখালার মধ্য দিয়ে এই রাস্তাটিকে সাধারণ মানুষ বেনারসরোড বলে অভিহিত করে। বর্তমানে সম্পূর্ণ রাস্তাটির অস্তিত্বই নাই। অহল্যাবাঈ এই রাস্তাটির কিয়দংশের মেরামত করে দিয়েছিলেন বলে রাস্তাটির কিছু অংশ অহল্যাবাঈ রোড বলেও পরিচিত ছিল। মৌর্য ও গুপ্ত যুগে গড়-মান্দারণ থেকে আর একটি রাস্তা দক্ষিণমুখী হয়ে রামজীবনপুর-ক্ষীরপাই-বরদার মধ্য দিয়ে দাসপুর ও পাঁশকুড়া হয়ে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। অনুমান করা হয়, এই রাস্তা ধরেই হুয়েন সাঙ্‌ তাম্রলিপ্তে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু পাঠান-মোগল যুগে এই রাস্তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সেই সময় গড়-মান্দারণ থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তার দুটি বাহু পশ্চিমমুখী হয়ে জগন্নাথ সড়কে মিশেছিল[৪]। একটি বাহু ক্ষীরপাই থেকে চন্দ্রকোনা ও কেশপুরের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরের নিকট জগন্নাথ সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল; আর একটি বাহু পাঁশকুড়া থেকে পশ্চিমমুখী হয়ে সুবর্ণরেখা নদীর কাছাকাছি উড়িষ্যাগামী সড়কে মিশেছিল। উল্লেখযোগ্য, অষ্টাদশ শতকে ভাস্কর পন্ডিতের বর্গীবাহিনী এই পথ ধরেই বঙ্গদেশে প্রবেশ করে এবং এই অঞ্চলের বর্ধিত জনপদগুলিকে ধ্বংস করে। সুতরাং রাধানগর-ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর-চন্দ্রকোনা-ভুরশুট-জাহানাবাদ অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিল ; কিন্তু অষ্টাদশ শতক থেকে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে এই অঞ্চলের দ্রুত অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বীরসিংহসহ ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমা বন্যা ও মহামারীর প্রকোপে যোগাযোগ-বিহীন হয়ে দুর্গম, দরিদ্র ও অস্বাস্থ্যকর গ্রামাঞ্চলে পরিণত হয়।

এই অঞ্চলের বহুশতাব্দীব্যাপী সড়ক-যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয় দামোদর-দ্বারকেশ্বর-শীলাবতী-কংসাবতী নদীর ক্রমবর্ধমান বন্যার প্রকোপ। বাংলাদেশের নরম পলিমাটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে ছোটবড় সমস্ত নদীই মাঝে মাঝে গতিপথ পরিবর্তন করে। পুরাতন মানচিত্র ও ভূপর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে দামোদর নদ বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালনার নিকটবর্তী স্থানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হোত। কিন্তু দামোদর গতিপথ পরিবর্তন করে হাওড়া-হুগলীর মধ্য দিয়ে দুটি ধারায় ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর মধ্যে উলুবেড়িয়ার নিকট ভাগীরথীর সঙ্গে যে ধারাটি মিলিত হয়েছে, কালক্রমে সেই নদীখাতটিও মজে যাওয়ার ফলে জলনিকাশীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। অপর ধারাটি কালক্রমে প্রধান ধারা হিসেবে আরামবাগের মধ্য দিয়ে রূপনারায়ণে মিশেছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে উৎপন্ন সমস্ত নদীগুলিই এই পাহাড়ী এলাকা থেকে প্রচুর বালি ও ছোট ছোট পাথর বহন করে নিয়ে আসে। এই অঞ্চলের বনাঞ্চল বিধ্বস্ত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বালিতে নদীখাত ভরাট হওয়ার কাজ দ্রুততর হয়। ফলে নদীর দুই

তীরে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যায়। দ্বারকেশ্বর ও শীলাবতী নদী ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে ঘাটাল ও আরামবাগের নিকটেই রূপনারায়ণে মিশেছে। ফলে এই সমস্ত নদীগুলির নিম্নাঞ্চল বন্যাকবলিত এলাকাতে পরিণত হোল। বস্তুতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই জাহানাবাদ-বরদা-চেতুয়া পরগনা অর্থাৎ বর্তমানের আরামবাগ ও ঘাটাল মহকুমা বাৎসরিক বন্যা-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।

বন্যা-সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করতে শুরু করল তথাকথিত সার্কিট বাঁধগুলি তৈরি হওয়ার পর থেকে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও পত্তনিদাররা জমিদারির মালিক হয়েছিলেন এবং জমি থেকে তাঁদের উপস্বত্ব যাতে কোনও ভাবেই কম না হয়, সেজন্য তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। তাই বন্যার প্রকোপ থেকে ফসল রক্ষার জন্য তাঁদের জমিদারি ঘিরে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে সৃষ্টি হোল সার্কিট বাঁধের'। যেসব জমিদাররা সার্কিট বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলেন, তাঁদের জমিদারি বন্যা থেকে সুরক্ষিত হোল বটে, কিন্তু ছোট পত্তনিদাররা এই ব্যবস্থা করতে না-পারার ফলে তাঁদের এলাকাগুলিতে বন্যার প্রকোপ স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে গেল। এইরূপ বন্যার ফলে যে সড়ক-যোগাযোগ-ব্যবস্থা এই অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করেছিল, সেই যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়ে সমস্ত এলাকাটি দুর্গম হয়ে উঠল।

নদীগুলির নাব্যতা কমে যাওয়াতে সমস্ত নিচু জায়গায় জল জমে যায়; ফলে আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। ১৮৬১ সালে যে মহামারী 'বর্ধমান-জ্বর' নামে কুখ্যাতি লাভ করেছিল, সেই জ্বরেই হুগলীজেলার শতকরা ১৩ জন লোক প্রাণ হারায়। জাহানাবাদ-বরদা-চেতুয়া পরগনায় এই হার স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বেশী ছিল। এই সময়ে অনেক গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়; জীবিতদের মধ্যে অবস্থাপন্নবা গ্রাম ছেড়ে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া শুরু করেন। শম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন লিখেছেন যে, এই জ্বরের ফলে বীরসিংহে বিদ্যাসাগর স্থাপিত বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের নিজের কথায়, "ম্যালেরিয়া জ্বরনিবন্ধন কয়েকজন শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া ভয়-প্রযুক্ত হেড্‌মাস্টার বাবু উমাচরণ ঘোষ রিপোর্ট দেন যে, তিনশত ছাত্রের মধ্যে কোনও দিন দুইজন কোনও দিন তিনজন ছাত্র উপস্থিত হয়। উহারা ক্ষণেককাল বেঞ্চে বসিয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন করে। এমতাবস্থায় কোন শিক্ষকই তথায় যাইতে সম্মত নন; সকলেই ভয়ে ব্যাকুল। হেড্‌মাস্টার ও সেকেন্ডমাস্টার রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে পুনর্বার যাইতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা ভয়ে যাইতে সাহস করেন নাই; সুতরাং যতদিন ম্যালেরিয়া থাকিবে ততদিন অগত্যা বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে"[৬]। বস্তুতপক্ষে বিদ্যালয়টি সাময়িকভাবে উঠেই গিয়েছিল। কিছুদিন পরে ঝড়ে বিদ্যালয়ের বাড়ীটিও ধূলিসাৎ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অনেকগ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে অবশ্য ঘাটাল-জাহানাবাদ অঞ্চলের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠেনি। কলকাতা যাওয়ার সড়ক তখনও পর্যন্ত পথিক-চলাচলের উপযুক্ত ছিল, যদিও কোনও কোনও জায়গায় সড়ক ভেঙ্গে জমি হয়ে যাওয়াতে আলপথ ধরেই যেতে হোত। তা সত্ত্বেও, জলপথ ছাড়া এই রাস্তাটিই কলকাতা-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর-তারকেশ্বর যাওয়ার পথ ছিল।

বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে বীরসিংহেই অন্তত দুটি পাঠশালা ও একটি টোল ছিল। ইংরেজী শিক্ষার কোনও স্কুল এই অঞ্চলে ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য তখনও পর্যন্ত

সামাজিক প্রতিষ্ঠার সহায়ক হোত। বীরসিংহে এবং পার্শ্ববর্তী কুরান, উদয়গঞ্জ, দীর্ঘগ্রাম, খড়ার ইত্যাদি গ্রামগুলিতে সংস্কৃতে বিদগ্ধ মানুষের অভাব ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয়ের শ্বশুর উমাচরণ তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন দিগ্বিজয়ী বৈয়াকরণ। সংস্কৃতচর্চার প্রসার থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই শিক্ষার বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল না। বীরসিংহ ও পাশাপাশি গ্রামগুলি ছিল প্রধানতঃ চাষীসম্প্রদায়ের গ্রাম। শম্ভুচন্দ্র লিখছেন, "তৎকালে বীরসিংহবাসী লোকের অবস্থা মন্দ ছিল। সদ্‌গোপেরা কৃষিকার্য করিয়া দিনপাত করিত। ইহাদের সন্তানগণ গোরু চরাইত; কেহ কেহ অন্যের ক্ষেতে মজুরি করিয়া দিনপাত করিত। অনেকের অন্নজোটা দুষ্কর হইত।"[৭] বীরসিংহে বেশ কিছু বাগ্‌দী ও জেলে সম্প্রদায়ের মানুষও বাস করতেন। দিনমজুরি ও মাছধরার কাজই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। এঁরাই ছিল গ্রামের দরিদ্রতম মানুষ। গ্রামের জমিদার 'রায়' উপাধিধারী ব্যক্তিরা বাস করতেন দূরবর্তী জাড়া নামক গ্রামে। সুতরাং বর্ধিষ্ণু বাড়ীর দোল-দুর্গোৎসবের এবং অন্যান্য আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা বীরসিংহবাসীর ছিল না। লৌকিক মনসাপূজা, সত্যনারায়ণপূজা ইত্যাদি এবং বিভিন্ন বারব্রতই ছিল সাধারণ মানুষের ধর্মাচরণের পথ। ঠাকুরদাসের মা দুর্গাদেবী ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। বাবা রামজয় তীর্থ থেকে শালগ্রামশিলা নিয়ে এসেছিলেন; বাড়ীতে তাই পূজিত হোত। কিন্তু সেটি ছিল দৈনন্দিন পূজা, তাতে কোনও আড়ম্বর ছিল না। ১৮৬৯ সালে হঠাৎ আগুন লেগে বাড়ী ভস্মীভূত হলে শালগ্রামশিলাটিও আগুনের হাত থেকে বাঁচেনি। ঠাকুরদাস তখন কাশীতে তীর্থবাস করছিলেন। এই অগ্নিকান্ডের পর বিদ্যাসাগরের পৈতৃক বাড়ীতে আর কোনও পূজো হয়নি। ভগবতীদেবী এই অগ্নিকান্ডের পর কয়েক বছর গ্রামে বাস করেছিলেন। তিনি কিছু লৌকিক বার-ব্রত করতেন, কিন্তু ভিটেতে নোতুন করে দেবতা স্থাপন করে পূজা-অর্চনা করার কোনও উদ্যোগ নেন নি বা আগ্রহ দেখান নি।

বীরসিংহের অদূরবর্তী খড়ার, রাধানগর, চন্দ্রকোনা, রামজীবনপুর, ক্ষীরপাই ছিল পিতল-কাঁসা ও তাঁতশিল্পের কেন্দ্র ও বিখ্যাত বাণিজ্যস্থল। এই শহরগুলিতে অনেক বর্ধিষ্ণু ব্যক্তির বাস ছিল এবং শিল্পে অনেক মানুষের অন্নসংস্থান হোত। বিদ্যাসাগরের বাল্য ও যৌবনে বিদেশী বাণিজ্যের চাপে দেশীয় তাঁত, রেশম ও কাঁসা-পিতল শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি-প্রথা একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী ও এক বিশালসংখ্যার ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুর সৃষ্টি করে গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনে এক অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল। এই অবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে নানা ধরনের সামাজিক অনাচার, যেমন বহুবিবাহ, ভ্রূণহত্যা, পতিতাবৃত্তির প্রসার ইত্যাদি বিদ্যাসাগর তাঁর বাল্যকালেই গ্রামের সমাজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এগুলি তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করত। তাঁর সংস্কার-আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল এই অভিজ্ঞতাগুলিই।

মাত্র আট বৎসর বয়স থেকে কলকাতাবাসী হলেও বিদ্যাসাগর নিয়মিত বীরসিংহ যাতায়াত করেছেন ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত। তারপরেও তিনি বীরসিংহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, প্রধানত তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রের মাধ্যমে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বীরসিংহে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তা শারীরিক কারণে সম্ভব হয়নি। বীরসিংহের কল্যাণ-চিন্তা তিনি

কখনও ত্যাগ করেন নি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বন্ধ হয়ে-যাওয়া বীরসিংহ স্কুলকে তাঁর মাতার নামে "ভগবতী বিদ্যালয়" রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে দাতব্য চিকিৎসালয়টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; চেষ্টা সত্ত্বেও সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি।

শহর-কলকাতায় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা পূর্ণতা লাভ করেছিল। গ্রাম ও শহর এই দুয়েরই প্রভাব ছিল তাঁর উপর। ধুতি-চাদর-চটিতে সজ্জিত এক চিরাচরিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাদুড় বাগানের "ইংরেজ-পছন্দ" বাড়ীতে আড়ম্বরহীন পাশ্চাত্য আসবাবপত্র সহ বাস করতেন। মনন ও চিন্তায় গ্রাম্য পশ্চাদ্‌পরতার লেশমাত্র আভাস নেই—সেখানে আধুনিকতার নির্ভুল স্বাক্ষর। এই দুরূহ সমন্বয়েই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব।

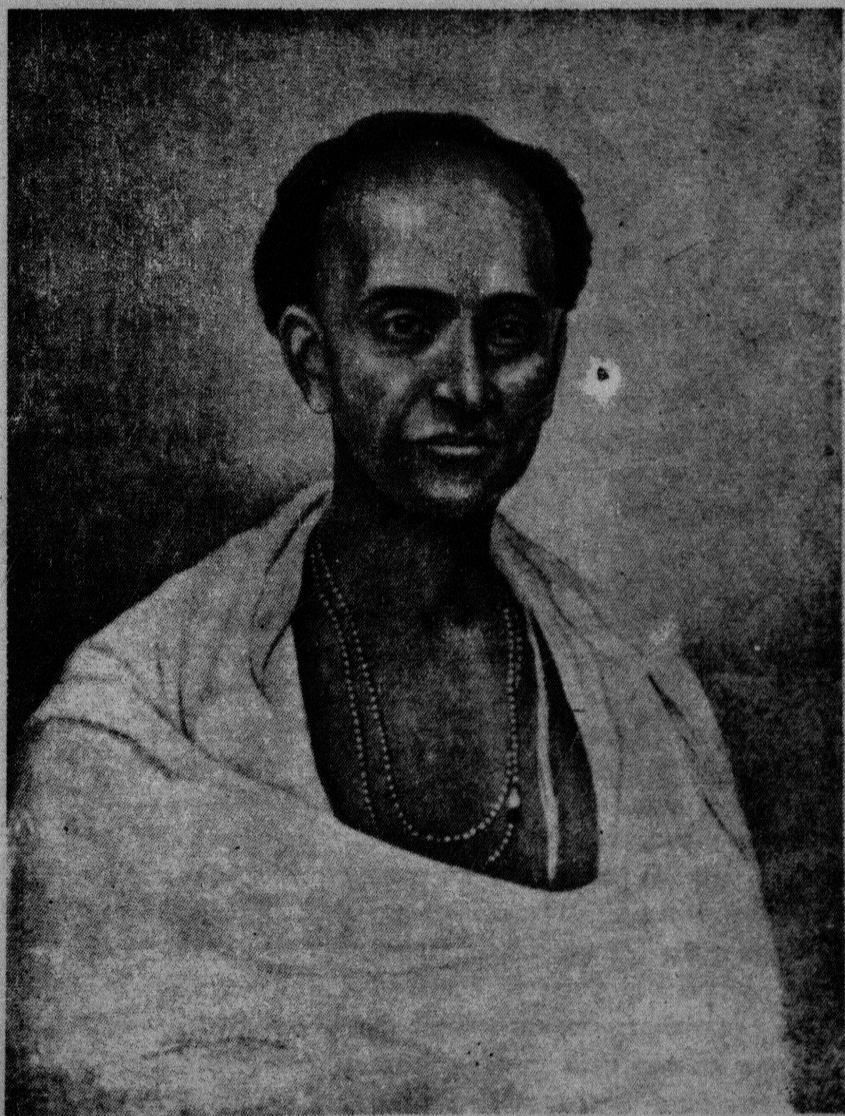
২

বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদাদা রামজয় তর্কভূষণ ঠিক সংসারী মানুষ ছিলেন না। তাঁর পৈতৃক গ্রাম বনমালীপুরে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন সংসারে উদাসীন এবং ভ্রমণবিলাসী। তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর স্ত্রী দুর্গাদেবীর উপর যথেষ্ট নিগ্রহ করতেন। এইরূপ ব্যবহার যখন চরমে উঠল, তখন দুর্গাদেবী তাঁর দুইপুত্র ও চার কন্যাসহ বীরসিংহে পিতা উমাচরণ তর্কসিদ্ধান্তের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। উমাচরণ শুধু বিখ্যাত পণ্ডিতই ছিলেন না, তাঁর সাংসারিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল। তিনি মেয়েকে আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু সংসারের কর্তৃত্ব যেহেতু উমাচরণের বড়ছেলের হাতে, তাই দুর্গাদেবী অবাঞ্ছিত অতিথি হিসেবে অপমান সহ্য করা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। শেষ পর্যন্ত উমাচরণ তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন একটি জায়গায় একটি ছোট বাড়ী তৈরি করিয়ে দেওয়াতে, দুর্গাদেবীর পক্ষে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে বাস করা সম্ভব হোল। সংসার চালাবার জন্য দুর্গাদেবী চরকা বা টেকুয়ায় সুতো কেটে বাজারে বিক্রি করতেন। কিন্তু তাতেও সংসার চলত না। সুতরাং কষ্টের সীমা ছিল না। দুর্গাদেবীর মনোবল কিন্তু অটুট ছিল। পরে পুত্রবধূ ভগবতীদেবীকে চরকায় সুতো কেটে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি। বড়ছেলে ঠাকুরদাস তের/চৌদ্দ বৎসর বয়েস থেকেই কলকাতায় গিয়ে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই সময় একদিন হঠাৎ ফিরে আসেন রামজয়। বনমালীপুরে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের না দেখে বীরসিংহে এসে শোনেন তাদের দুঃখ-কষ্টের কাহিনী।

বীরসিংহেই স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত করে যথাযথ খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত নেন ভিটেজমি। পরিবারের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা হোল। পুত্র ঠাকুরদাসের খোঁজখবর নিতে কলকাতায় গিয়ে ঠাকুরদাসের কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসায় আনন্দিত হলেন। সংসারে উদাসীন হলেও রামজয় সাংসারিক বিষয়ে অন্যায় ও অসততার সঙ্গে আপস করতেন না। যেমন ছিল চিত্তের দৃঢ়তা, তেমনিই ছিল শারীরিক শক্তি ও সাহস। ২১ বৎসরের যুবক এক আক্রমণকারী ভালুককে একাকী পরাস্ত করে হত্যা করেন এবং রক্তাক্ত দেহে ৮ মাইল হেঁটে গিয়ে মেদিনীপুরে আত্মীয়-বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ভারতবর্ষের অনেক দুর্গম তীর্থ তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিনি অর্জন করেছিলেন উচ্চ-নীচ সবার প্রতি সমদৃষ্টি এবং সবার সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা করার ক্ষমতা। স্পষ্টবাক, ঋজুচরিত্রের এই মানুষটি কারুর চাটুকারিতা পছন্দ করতেন

না, কোনও ক্ষমতাশীল ব্যক্তির তোষামোদও করতেন না। তাঁর সৎস্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর রামজয়ের কোনও আস্থা ছিল না, কারণ তাঁরা ছিলেন "নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর, এবং তাহারা আপন ইষ্টসাধনের জন্য না করিতে পারেন এমন কর্ম নাই"। রামজয়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তাঁর অসমাপ্ত জীবনচরিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারী ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিত"[৯]। ১৮২৮ সালে বিদ্যাসাগরের কলকাতা যাত্রার কিছুদিন আগে ৭৬ বৎসর বয়সে রামজয়ের মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর বাল্যবয়সে কিছুসময় রামজয়ের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন; কিন্তু রামজয়ের সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা, সর্বোপরি তাঁর বিভিন্ন দুর্গম স্থানে ভ্রমণের কাহিনীগুলি বস্তুতপক্ষে পারিবারিক গল্পকথায় পরিণত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র জন্মাবার পর ঠাকুরদাসকে খবরটি দিয়ে রামজয় বলেছিলেন, "একটা এঁড়েবাছুর জন্মেছে।" পরবর্তী কালে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জেদের কাছে হার মেনে ঠাকুরদাস বলতেন, "বাবা, তোমাকে এঁড়েবাছুর বলেছিলেন। ঋষিতুল্য মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর মুখ দিয়ে তো আর মিথ্যে কথা বেরুবে না।" রামজয়ের চরিত্রের দৃঢ়তা ও সততা বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল।

দুর্গাদেবী নাবালক সন্তানদের নিয়ে যেভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সংসার টিকিয়ে রেখেছিলেন, তা খুব সাধারণ ছিল না। দুর্গাদেবীর এই অটুট মনোবল বিদ্যাসাগরের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। কঠোর জীবনসংগ্রাম সত্ত্বেও পুত্র-পৌত্রদের জন্য তাঁর স্নেহের অভাব ছিল না। কিন্তু সেই স্নেহ অকারণ উদ্বেগে ও আশঙ্কায় পুত্র-পৌত্রদের গ্রামের নিরাপদ সীমানায় আবদ্ধ করে রাখতে প্ররোচিত করেনি; বরং তিনি তাদের উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য শহর-কলকাতার অনিশ্চয়তার মধ্যে পাঠিয়ে দিতে ইতস্তত করেন নি। ঠাকুরদাসকে ১৩/১৪ বৎসর বয়সেই কলকাতায় জীবিকার্জনের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আসার কয়েকমাস পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে দুর্গাদেবী বীরসিংহ থেকে কলকাতায় এসে ঈশ্বরকে নিয়ে বীরসিংহে ফিরে যান। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর সুস্থ হলে কলকাতায় ফেরার অনুমতি পান। পিতামহীর স্নেহের ঋণ বিদ্যাসাগর কোনওদিন বিস্মৃত হননি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করার পর দুর্গাদেবীর মৃত্যু হয়। ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে যখন তাঁর বয়স আশি বৎসরেরও বেশী, সেই সময় বীরসিংহ থেকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়। "তিনি শালকিয়ায় গঙ্গাতীরে, বিনা আহারে কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া কুড়ি দিন পরে গঙ্গা লাভ করেন[১০]"। বিদ্যাসাগর তখন কলকাতাতেই ছিলেন। অশীতিপর পিতামহীর সজ্ঞানে গঙ্গালাভের বাসনায় সম্ভবত তিনি বাধ সাধতে চাননি। দুর্গাদেবী ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। পরিণত বয়সে বীরসিংহে "চাপড়া" নামক পুষ্করিণীর পাড়ে একটি অশ্বত্থগাছ শাস্ত্রানুসারে "প্রতিষ্ঠা" করেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় দু'তিন বৎসর পূর্বে তাঁদেরই একজন প্রতিবেশী গাছসহ ঐ জায়গাটি জবরদখল করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর দেওয়ানী-ফৌজদারী মোকদ্দমা করে সেই গাছটি রক্ষা করেন। তিনি টাকা ধার করে সেই মোকদ্দমা চালিয়েছিলেন; কিন্তু পিতামহীর 'প্রতিষ্ঠা'-করা গাছটিকে নষ্ট হতে দিতে রাজী ছিলেন না। শম্ভুচন্দ্র পরামর্শ দিয়েছিলেন, "পিতামহী প্রায়



শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে গঙ্গালাভ করিয়াছেন", সুতরাং "তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থবৃক্ষের জন্য মনান্তর করা উচিত নয়"। কিন্তু বিদ্যাসাগর অনড়। তাঁর বক্তব্য, "এ বিষয়ের জন্য যদি সর্বস্বান্ত হইতে হয় তাহাতেও পশ্চাদপদ্ হইব না।"[১১] তেজস্বিনী পিতামহীর স্নেহের স্মৃতিতে বৃদ্ধবয়সেও বিদ্যাসাগর আবেগপ্রবণ ও জেদী হয়ে উঠেছিলেন। দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা করে শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থ গাছটিকে রক্ষা করেন।

৩

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩/১৪ বৎসর বয়স থেকে প্রায় ৪৮/৪৯ বৎসর পর্যন্ত জীবিকার প্রয়োজনে কলিকাতাবাসী ছিলেন। তারপর বীরসিংহে ফিরে ২৪ বৎসর গ্রামে বসবাস করার পর জীবনেরশেষ দশ বৎসর কাশীতে কাটিয়েছিলেন।[১২] ঠাকুরদাসের দাদামশাই উমাচরণ তর্কসিদ্ধান্ত দিগ্বিজয়ী পন্ডিত। বাল্যকালে তাই তাঁর উচ্চাশা ছিল সংস্কৃতে পন্ডিত হয়ে বংশের ধারা রক্ষা করবেন। কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে সংসারে উদাসীন পিতার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিজের উচ্চাশাকে বিসর্জ্জন দিতে হোল। কলকাতায় আসার আগে তিনি বনমালীপুরে ও বীরসিংহে কিছু সংস্কৃত লেখাপড়া শিখেছিলেন; কলকাতায় সওদাগরী অফিসে চাকুরি পাওয়ার আশায় কিছু ইংরেজি লেখাপড়া শেখার চেষ্টাও করেছিলেন। এই সময় কখনও অর্ধাহারে, কখনও অনাহারে দিন কাটিয়েছেন ঠাকুরদাস। তাঁর দুরবস্থা দেখে মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা একজন মহিলা গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁকে খাইয়েছিলেন এবং খাওয়া না জুটলে তার দোকানে এসে খেয়ে যাওয়ার উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঠাকুরদাসের প্রথম যৌবনের এই সহানুভূতি ও করুণার কাহিনীটি পরিবারের মধ্যে একটি গল্পকথা রূপে প্রচলিত ছিল। এই কাহিনীটি নারীজাতির সহজাত স্নেহপ্রবণতার ও মানবিক গুণের উদাহরণ হিসাবে বিদ্যাসাগরকে সমগ্র নারীজাতির প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর অসমাপ্ত জীবন-চরিতে কৃতজ্ঞ-চিত্তে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

মাসিক দু'টাকা বেতনে বড়বাজারে ভাগবত সিংহের ব্যবসায়ে হিসাবরক্ষকের কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর ঠাকুরদাস যে সততা ও কতর্ব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর নিয়োগকর্তা বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁর পিতা রামজয় কলকাতায় এসে ঠাকুরদাসের প্রশংসা শুনে বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছিলেন। ছোট ভাই কালিদাস যখন উপযুক্ত হয়ে উঠল, তখন কালিদাসকে নিজের কাজে বহাল করে ঠাকুরদাস ব্যবসা করে সংসারের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেছিলেন। বীরসিংহ অঞ্চলের পক্ষে সুবিধাজনক রেশম ও কাঁসার ব্যবসার চেষ্টা করেন। ব্যবসা যে তিনি খারাপ করছিলেন তা নয়; কিন্তু ভাগবত সিংহ কালিদাসের কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে না পেরে ঠাকুরদাসকেই হিসাব-রক্ষকের কাজে ফিরে আসার অনুরোধ করেন। তাই বাধ্য হয়ে ব্যবসা বন্ধ করে তাঁকে ভাগবত সিংহের কাজে ফিরে আসতে হয়। এক ব্রাহ্মণ পন্ডিতপরিবারের সন্তানের পক্ষে রেশম ও কাঁসার ব্যবসা শুরু করার মধ্যে কিঞ্চিৎ দুঃসাহসিকতা ছিল; কিন্তু ঠাকুরদাসের পক্ষে এইরূপ দুঃসাহসিক কাজ সম্ভব ছিল। যাই হোক্, দ্বিতীয়বার ভাগবত সিংহের কাজে যোগ দেওয়ার পর তাঁর মাইনে বেড়ে হোল আট টাকা। প্রসঙ্গত ঠাকুরদাস সিংহ-বাড়ীতে বাসস্থানের জায়গা পেয়েছিলেন এবং সর্বোচ্চ মাইনে পেয়েছেন দশ টাকা।

১৮১৩ সালে গোঘাটের রামকান্ত বিদ্যাবাগীশের কন্যা ভগবতীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। সংসারের আর্থিক অনটন কিছুটা মিটলেও, সচ্ছলতা ছিল না সংসারে। তবুও ঠাকুরদাস সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং সংসারের সব দায়িত্বভার নিজেই বহন করেছেন। ঠাকুরদাসের এই কৃচ্ছ্রসাধন ও স্বার্থত্যাগের কাহিনী পারিবারিক উপকথায় পরিণত হয়ে বিদ্যাসাগরকেও বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল।

অবস্থাগতিকে ঠাকুরদাস নিজে লেখাপড়া বিশেষ শিখতে পারেন নি; তাই ছেলেদের পড়াশুনার প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও অন্যান্য ব্যক্তির পরামর্শে তিনি ঈশ্বরকে যখন কলকাতায় নিয়ে এলেন তখন তিনি মনস্থির করতে পারেন নি যে ঈশ্বর সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি পড়বে। যাই হোক্, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি বিবেচনা করে (ইংরেজী স্কুলে পড়ানোর খরচ বেশী) যখন সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়, তখন ঠাকুরদাস অখুশী হননি এই ভেবে যে ঈশ্বর অন্তত "সংস্কৃত ব্যবসায়ী" পরিবারের পরম্পরা বজায় রাখতে পারবেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান তিনি এমন কঠোরতার সঙ্গে করতেন যে মাঝে মাঝে সিংহপরিবারের লোকজনকে হস্তক্ষেপ করে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গুরুতর আঘাত থেকে রক্ষা করতে হোত। ঠাকুরদাসের ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আশা ছিল বলেই পড়াশুনায় অবহেলা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। প্রচন্ড ক্রোধে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন।[১৩] আবার অন্য সময় সস্নেহ পরিচর্যায় পুত্রের ক্লেশ অপনোদনে সাহায্য করতেন। ঠাকুরদাসের কঠোর শাসন অবশ্য অনেক সময়েই ঈশ্বরের জেদের নিকট হার মানত। সম্ভবত ঠাকুরদাসের শাসনের কঠোরতার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র পিতার কোনও কোনও নির্দেশকে অমান্য করার অনমনীয় প্রবণতা দেখাতেন। পিতা-পুত্রের জেদের সংঘাতে অনেক সময় ঠাকুরদাসই হার মেনে নিতেন। বিচক্ষণ ঠাকুরদাস, ঈশ্বরের নির্দেশের বিপরীত কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করে, মাঝে মাঝে এমন নির্দেশ দিতেন যার বিপরীত করলেই তাঁর মনোমত কাজ করা হবে। এই চাতুরি বালক ঈশ্বরচন্দ্র সহজে বুঝতে পারতেন না। বস্তুতপক্ষে, ঈশ্বর ও তাঁর ভাইদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি যে কৃচ্ছ্রসাধন ও স্বার্থ-ত্যাগ করেছিলেন, তার জন্য বিদ্যাসাগরের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল। তাই ঈশ্বরচন্দ্র নিজে উপার্জনক্ষম হওয়ার পরই সংসারের সব দায়-দায়িত্ব নিজে নিয়ে ঠাকুরদাসকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর জীবনের প্রথম বাইশ বৎসর অতন্দ্র প্রহরীর নিষ্ঠায় একটি লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করেছিলেন ঠাকুরদাস। কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে ঈশ্বরের অসাধারণ মেধাকে বিকশিত করে তুলতে তিনি সাহায্য করেছেন। কর্মজীবনে প্রবেশের সন্ধিক্ষণে বিদ্যাসাগর হয়ে উঠেছিলেন এক আত্মপ্রত্যয়ী যুবক, যিনি পিতার বিধিনিষেধের নিগড় ভেঙ্গে তাঁর বিচারবুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ী চলতে চান। বাল্য ও কৈশোরে পিতার সঙ্গে ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত খুব দূরগত স্মৃতি ছিল না। যুবক বিদ্যাসাগরের তাই আর ঠাকুরদাসের কর্তৃত্বের ও তদারকির বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। বরং তিনি অবচেতন মনে ঠাকুরদাসের প্রহরা থেকে মুক্তিই প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই ঠাকুরদাসকে চাকুরি ছাড়িয়ে কলকাতা থেকে বীরসিংহে পাঠানোর মধ্যে প্রৌঢ় পিতার প্রতি উপযুক্ত পুত্রের সামাজিক দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা যেমন ছিল, তেমনি ছিল স্বাধীনভাবে নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশিত করার সুপ্ত ইচ্ছাও।

বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগর, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরি পাওয়ার আগেই তাঁর স্কলারশিপের টাকায় ঠাকুরদাসকে তীর্থে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে চাকুরি পাওয়ার পর ঠাকুরদাসকে বীরসিংহে গিয়ে সংসার দেখাশুনা করার জন্য অনুরোধ করেন। নিজের পঞ্চাশ টাকা মাইনের কুড়ি টাকাই ঠাকুরদাসকে পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুরদাসের সুপরিচালনায় বীরসিংহে সংসারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকল। বাড়ীঘর মেরামত হোল, জমি কেনা হোল। বাগান ও ধানচাষের জমি কেনার পর সংসারে সচ্ছলতা এলো। কিন্তু "সংস্কৃত ব্যবসায়ী" বংশের ধারাকে রক্ষা করার ইচ্ছা কোনও দিনই সফল হলো না। ঈশ্বরের স্কলারশিপের টাকায় তিনি টোলের জন্য জমি ও কিছু পুঁথি কিনেছিলেন। বিদ্যাসাগর পিতার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন না। তিনি ১৮৫৩ সালে ইংরেজী ও বাংলা ভাষার 'বীরসিংহ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের বাড়ী তৈরি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ঠাকুরদাসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল হোল না বটে, কিন্তু বীরসিংহে স্কুল হওয়াতে ঠাকুরদাসের আর কোনও ক্ষোভ রইল না। এই স্কুল ছাড়াও বয়স্ক শিক্ষার জন্য 'রাখাল স্কুল" বা নাইট স্কুল, মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে স্থাপিত হোলো। প্রায় তিনশত ছেলেকে বই-খাতা-পেন্সিল ইত্যাদি দেওয়া হোত। কাউকে স্কুলে আসার জন্য জামাকাপড় ইত্যাদিও কিনে দিতে হোত। ঠাকুরদাসের বাড়ীতে প্রতিদিন প্রায় ষাটজন বালক খাওয়াদাওয়া করে স্কুলে পড়ত। ঠাকুরদাসের আগ্রহ ও উৎসাহের ফলেই এ সমস্ত সম্ভব হয়েছিল। তিনি নিজে সমস্ত তদারকি করতেন, হাটে গিয়ে দৈনন্দিন বাজার করতেন এবং স্কুলের ছেলেদের নিজের ছেলে-নাতির সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াতেন। ঠাকুরদাস যথেষ্ট হিসেবী হলেও গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজে এবং বিদ্যাসাগরের দয়া-দাক্ষিণ্যে যথেষ্ঠ উদারতার সঙ্গে সহায়তা করেছেন।

ঠাকুরদাস শাস্ত্র মানেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীনপন্থী; কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচেষ্টায় তাঁর সম্মতি দিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন যে একবার এ বিষয়ে অগ্রণী হলে আর পিছিয়ে না এসে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের জন্য রক্ষণশীল সমাজে বিদ্যাসাগর তো নিন্দিত হয়েই ছিলেন, বীরসিংহ অঞ্চলের গ্রাম্য সমাজে ঠাকুরদাসকেও অনেক নিন্দা এবং কিছু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বিধবাবিবাহ বিষয়ে গ্রামবাসীগণের মধ্যে যাঁহারা বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা সুযোগ পাইলে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।"[১৪] বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থাগ্রহণের কথা বললে ঠাকুরদাস তাঁকে নিরস্ত করেন। সামান্য বিষয়ে গ্রামের লোকের সঙ্গে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সৃষ্টি করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। বস্তুতপক্ষে রামজয় বা বিদ্যাসাগরের মতো তিনি অনমনীয় ছিলেন না। রামজয় গ্রামবাসীর অকারণ কুৎসা রটনার সঙ্গে আপস করতে পারেন নি; বিদ্যাসাগরও তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ করাকে মেনে নিতে পারেন নি। ঠাকুরদাস কিন্তু গ্রাম্যজীবনের নিন্দা-কুৎসা ও নীচতাকে সহজভাবে উপেক্ষা করে সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বসবাস করতে পারতেন।

একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের প্রধান হিসেবে ঠাকুরদাস বেশ সুষ্ঠুভাবেই সংসার পরিচালনা করতেন। কিন্তু যৌবনে যে কঠোর শাসনের মধ্যে তিনি ঈশ্বর এবং পরবর্তী দুই ছেলেকে মানুষ করেছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে তাঁর শাসনে কঠোরতা আর

ছিল না। তাই কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র এবং পৌত্র নারায়ণ তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বিনীত হয়ে উঠেছিল। দীনবন্ধু-পুত্র গোপাল, যে শম্ভুচন্দ্রের ভাষায়, 'মূর্খ ও মাতাল', মানুষ হতে পারে নি। তাঁর শাসনের অভাব ও অকারণ প্রশ্রয় লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ রসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি (ঠাকুরদাস) নিরামিষাশী হিসাবে পরিচিত হলেও, আসলে তিনি তা নন; কারণ তিনি ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন। কিন্তু তবুও বিদ্যাসাগর ঈশান ও নারায়ণকে পিতার প্রভাব থেকে মুক্ত করে কলকাতায় নিয়ে যাননি, কারণ তাতে ঠাকুরদাস আঘাত পাবেন। নারায়ণ কলকাতায় পড়তে আসেন ঠাকুরদাসের কাশীবাসের পর; তখন তাঁর বয়স ১৬ বৎসরের বেশী।

ঠাকুরদাস ছিলেন প্রচলিত অর্থে ধর্মবিশ্বাসী। বিদ্যাসাগর তাঁর শাস্ত্রানুসারী ধর্মাচরণের প্রয়োজনে অর্থব্যয়ে অকাতর ছিলেন। ঠাকুরদাস বীরসিংহের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা করতে চাইলেন আড়ম্বরের সঙ্গে; ভগবতীদেবী চাইলেন এই উপলক্ষে আড়ম্বর কমিয়ে গ্রামের দুঃস্থ লোকদের খাওয়াতে। বিদ্যাসাগর দু'জনের ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন। মা দুর্গাদেবীর শ্রাদ্ধ করলেন ঠাকুরদাস অনেক খরচ করে। ঐ অঞ্চলের প্রায় তিনহাজার ব্রাহ্মণকে চর্বচোষ্য খাওয়ানো হোল। বিদ্যাসাগর উপস্থিত না-থাকলেও সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন। ১৮৫৯-৬০ সালে গ্রামের দীনবন্ধু কুম্ভকারকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরদাস তীর্থভ্রমণে গেলেন। পুষ্কর থেকে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখলেন, "তোমার শব্দ-পরিচয়ে আমি এদেশে পরিচিত হইতেছি।"[১৫] বিখ্যাত পুত্রের পিতা হিসাবে ঠাকুরদাসের গর্ব ছিল।

কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাশীবাসী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। শম্ভুচন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী, "এক অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনের ফলে ঠাকুরদাস কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঠাকুরদাস স্বপ্নে দেখেছিলেন যে "তাঁর বাসভূমি শ্মশান হবে।"[১৬] স্বপ্নের সত্যতায় বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস ছিল না। তিনি কাশীতে ঠাকুরদাসের একাকী বসবাসে নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হলেন। যাইহোক্, ঠাকুরদাসের কাশীবাসকে আরামপ্রদ করার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন নি বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরদাসের মানসিক দূরত্ব আরও কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। ঠাকুরদাসের একাকিত্ব ঘোচাবার জন্য তিনি পালা করে ভাইদের ঠাকুরদাসের কাছে পাঠিয়ে দিতেন ; কখনও কখনও নিজের জামাতাদেরও পাঠাতেন। তাঁর ধর্মাচরণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। সাংসারিক বিষয়ে ঠাকুরদাসের পরামর্শ নিতেন। কিন্তু ঠাকুরদাস কাশীবাসী হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগর ভাইদের সঙ্গে পৃথগন্ন হন। এতে ঠাকুরদাসের সায় ছিল না ; কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন এ বিষয়ে অনড়। ১৮৭১ সালে ভগবতীদেবীর মৃত্যুর পর এবং পরবৎসর (১৮৭২) জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পর পিতাপুত্রের মধ্যে মানাসিক দূরত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল। অবশ্য পিতার প্রতি কর্তব্যে কিংবা শ্রদ্ধাভক্তিতে কোনও ন্যূনতা নজরে পড়ে না। কেবল এই সময় প্রায় তিনবৎসর তিনি কাশীতে ঠাকুরদাসের কাছে যেতে পারেন নি। এই সময়ে ঠাকুরদাসের একটি চিঠিতে পিতাপুত্রের মানসিক দূরত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঠাকুরদাস লিখেছেন, "আমার ৮৩ বৎসর বয়স হইল। বিশেষ এই অবসন্ন সময়ে সর্বদা আমার ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তুমি আমার বংশের শ্রেষ্ঠ, এতাবৎকাল তুমি আমার ভরণপোষণ প্রভৃতি করিতেছ, এক্ষণে আমার মানস, তোমার মুখদর্শন করি। অতএব লিখি যদি

তুমি শরীরগতিক স্বচ্ছন্দরূপে সুস্থ থাক, তাহা হইলে ইতিমধ্যেই তুমি একদিনের জন্য আসিয়া আমার মানস পূর্ণ করিবে।" বৃদ্ধ পিতার ইচ্ছাপূরণ করতে বিদ্যাসাগর বিলম্ব করেন নি। এরপর অবশ্য ঠাকুরদাস বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। সন ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ তিনি যখন মারা যান, তখন বিদ্যাসাগর-সহ সব পুত্রই শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

৪

তেইশ-চব্বিশ বৎসরের যুবক ঠাকুরদাসের সঙ্গে গোঘাটের পাতুলগ্রাম নিবাসী রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর বিবাহ হয়; তখন তাঁর বয়স ৭/৮ বৎসর। রামকান্ত ছিলেন পন্ডিত ও স্পষ্টবক্তা কিন্তু সংসার সম্পর্কে উদাসীন। জামাতার সংসারে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে শ্বশুর পঞ্চানন তর্কবাগীশ, জামাতা, কন্যা গঙ্গাদেবী এবং তাঁদের দুই কন্যা লক্ষ্মী ও ভগবতীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। এই সময় রামকান্ত হঠাৎ তন্ত্রসাধনায় আকৃষ্ট হয়ে শবসাধনার জন্য রামজীবনপুরের নিকট করঞ্জীগ্রামে চলে যান। সেখানে তিনি সর্বদা নিজের খেয়ালে থাকতেন; ক্রমে রামকান্তের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। পঞ্চানন অনেক চেষ্টা করে জামাতা রামকান্তকে পাতুলে নিয়ে যান এবং তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি আর সুস্থ হননি; পাতুলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাবা মারা যাওয়ার পর পাতুলের বাস উঠল না লক্ষ্মীমণি ও ভগবতীর; বরং স্থায়ী হোল। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের পান্ডিত্যের খ্যাতির সঙ্গে ছিল অবস্থার সচ্ছলতা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল চিত্তের উদারতা। ভগবতীদেবী এই মাতুল-পরিবারে লালিতপালিত হওয়ার ফলে পরিবারের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার এবং পঞ্চানন ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহনের উদারতা ও সবার প্রতি সমান স্নেহশীল মনোভাব ভগবতীর চরিত্রগঠনে সাহায্য করেছিল। পরিণত বয়সে বিদ্যাসাগর এই পরিবারের লোকজনের বিশেষ গুণগুলি স্মরণ করে তাঁর অসমাপ্ত জীবনচরিতে[১১] লিখেছেন, "সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারি সহোদর (পঞ্চাননের চার পুত্র) সমান ছিলেন। এইজন্য চারিজনের মধ্যে কেহ কোনও মনান্তর দেখিতে পান নাই। অতিথির সেবা, অভ্যাগতের পরিচর্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।" এই পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে ওঠার ফলে ভগবতীদেবীও তাঁর আচার-ব্যবহারে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, সৌজন্যে-শালীনতায় বিদ্যাবাগীশ পরিবারের যথার্থ উত্তরাধিকারিণী হয়ে উঠেছিলেন।

মামাবাড়ীতে কিছু বাংলা ও সংস্কৃত লেখাপড়া শিখেছিলেন ভগবতীদেবী। উদার ও সংস্কারমুক্ত মনটিও পেয়েছিলেন মাতুল-পরিবারের অভিভাবকদের নিকট থেকেই। ঠাকুরদাসের সঙ্গে ৭/৮ বৎসরের ভগবতীর বিয়ে হয় ১৮১৩ সালে (শক ১৭৩৫, এবং সন ১২২০)। সুতরাং ভগবতীদেবীর জন্ম হয় আনুমানিক ১৮০৫/০৬ সালে। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণা, সুশ্রী ও সুগঠিতা। কাশীযাত্রার আগে হডসন নামে এক শিল্পীকে দিয়ে ঠাকুরদাসের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কিছুদিন পরে ভগবতীদেবীরও অনুরূপ একটি প্রতিকৃতি করানোর উদ্দেশ্যে ওঁকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন। সাহেবের সামনে বসতে হবে বলে ভগবতীদেবী মৃদু আপত্তি জানালেন; তবে পুত্রের ইচ্ছার কাছে নিজের স্বাভাবিক লজ্জা এবং লোকনিন্দার সম্ভাবনাকে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে রাখলেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন, "তোর যা ইচ্ছে করগে। নিন্দে হলে লোকে তো আর আমার নিন্দে করবে না। তোরই নিন্দে করবে। বলবে, "বিদ্যাসাগর মাকে

ছবি তোলাতে নিয়ে গেছে।"[১৮] ছবি দুটি বিদ্যাসাগর তাঁর বাড়ীর লাইব্রেরীতে সর্বদা দৃশ্যমান একটি জায়গায় টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভগবতীদেবীর এই ছবি দেখেছিলেন এবং ছবি দেখে ভগবতীদেবীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অধিকাংশ প্রতিমূর্তি অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহাতে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলে দৃষ্টির প্রসার পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতীদেবীর এই পবিত্র মুখশ্রী, গভীরতা ও উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু উর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এবং ইহাও বুঝিতে পারি ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতাসাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে কোনও পৌরাণিক দেবী-প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।" বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগর শেষজীবনে যে 'মা' নামে কাতর হয়ে পড়তেন, সে কোনও দেবীমূর্তির কল্পনায় নয়, সে তাঁর নিজের মায়ের স্মৃতিতেই।

ভগবতীদেবীর শাশুড়ী চরকায় সূতো কেটে কষ্টে সংসার চালাতেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাসমাইনেতে সচ্ছলভাবে সংসার চলা সম্ভব ছিল না। তাই ভগবতীদেবীও চরকায় সূতো কাটতেন এবং সেই সুতোয় কাপড় তৈরি হোত। বিদ্যাসাগর যখন কলকাতায় পড়তে এলেন, তখনও ভগবতীদেবী তাঁর কাটা সুতোয় কাপড় তৈরি করে পাঠিয়ে দিতেন ছেলেদের জন্য। পরে বিদ্যাসাগর উপার্জনক্ষম হলে সংসারের অবস্থার যখন উন্নতি হোল, তখন আর চরকায় কাটা সুতোয় তৈরি কাপড় পরার প্রয়োজন হোত না। কিন্তু তবু ভগবতীদেবী অবসর সময়ে চরকায় সূতো কেটেছেন। জীবনসংগ্রামের কঠিন দিনগুলিকে অবজ্ঞা করেননি, বিস্মৃতও হননি। চরকায় প্রতিদিন সূতো কেটে দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা এই দুই অবস্থার মধ্যে নিজের জীবনযাত্রার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অপরিবর্তিত রেখেছেন। আয়করের তদন্তে জাহানাবাদ অঞ্চলে এসে ভগবতীদেবীর আমন্ত্রণে বীরসিংহের বাড়ীতে আহার করতে এলেন বর্ধমানের তদানীন্তন জেলাশাসক হ্যারিসন সাহেব। সেটা ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস। বেশ বড় বাড়ী; বাড়ী দেখে মুগ্ধ হলেন সাহেব। মাটির দেওয়ালযুক্ত এইরূপ বাড়ীর সৌষ্ঠব দেখে অনেক প্রশংসা করলেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে চরকা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কী?" শম্ভুচন্দ্র হ্যারিসনের সঙ্গে ছিলেন। চরকা তাঁর কাছে বিগত দারিদ্র্যের ক্ষতচিহ্ন বিশেষ ; তিনি তা গোপন রাখতে পারলেই খুশী হন। উত্তর না দিয়ে শম্ভুচন্দ্র অন্য কথা পাড়লেন। সাহেব চলে যেতে ক্রুদ্ধ শম্ভুচন্দ্র চরকা দিলেন ভেঙ্গে। কিন্তু ভগবতীদেবীর কাছে দুর্বোধ্য এই আচরণ। তিনি মর্মাহত হয়ে অন্নজল ত্যাগ করলেন, যতক্ষণ না শম্ভুচন্দ্র আবার চরকা তৈরি করিয়ে দিলেন। নিজের বিশ্বাসমত জীবনচর্যায় অনড় ছিলেন ভগবতীদেবী।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে ভগবতীদেবী এক অসাধারণ রমণী ছিলেন।" তাঁর সেই অসাধারণত্বের প্রভায় বীরসিংহের গ্রাম্য সমাজ এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উদ্ভাসিত হয়েছিল; সেই অসাধারণত্বই পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে দেশকে গৌরবান্বিত

করেছিল। ভগবতীদেবীর সংস্কারমুক্ত করুণাধারা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সব মানুষের জন্য সদাপ্রবাহিত। বাড়ীতে অতিথি আসতে পারে এই সম্ভাবনায় নিজে দেরী করে খেতেন, কারণ যদি অতিথির জন্য যথেষ্ট খাবার অবশিষ্ট না থাকে। গ্রামে কোনও বাড়ীতে অসুখ হলে কিং বা শুশ্রূষার লোকের অভাব হলে ভগবতীদেবী অকাতরে তাদের জন্য পথ্য রাঁধতেন, ওষুধ খাওয়াতেন, ঘরের অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজকর্মও করে দিয়ে আসতেন, জাত-ধর্মের কোনও বিচার না করেই। চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বীরসিংহে অনেক লোকের কাছে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে ভগবতীদেবীর সেবার কথা শুনেছিলেন। গ্রামের চাষীদের তিনি মাঝে মাঝে টাকা ধার দিতেন—সময়মত টাকা ফেরত চাইতেন। বেশির ভাগ সময় গরীব চাষীরা টাকা ফেরত দিতে পারত না। দেরী হলে রাগ করতেন, বলতেন, "তোরা যদি টাকা ফেরত না দিবি, তবে আমি আবার টাকা ধার দেব কী করে?" টাকা অনেক সময় আদায় হোত না ঠিকই, তবে ফিরতেন হাসিমুখে—কোনও রাগদ্বেষ না নিয়ে। আঁচলে বাঁধা থাকত চাষী-বৌদের দেওয়া চাল-কলাই ভাজা। হাটের দিনে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতেন লোকযাত্রা। ক্ষুধার্ত কাউকে দেখলে না খাইয়ে ছাড়তেন না। রবীন্দ্রনাথ এই উদার মানবতার উল্লেখ করে বলেছেন, "দয়াবৃত্তি অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতীদেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল। তাহা কোনও সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে বদ্ধ ছিল না।"

সূত্রধরজাতের একটি বিধবা মেয়েকে অসঙ্কোচে জড়িয়ে ধরে কাছে বসিয়ে নিজের হাতে খাইয়েছেন ভগবতীদেবী। বিধবাবিবাহ চালু হলেও সমাজে বিবাহিতা বিধবাদের নীচু নজরেই দেখা হোত। ব্রাহ্মণের বিধবা বিয়ের পর স্বজাতেই ঘৃণার পাত্রী হয়ে যেত। এইরকম কয়েকটি মেয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে এলে বাড়ীর মেয়েরা "জাত খুইয়েছে" বলে কিছু মর্মান্তিক ঠাট্টা করেছিল। ভগবতীদেবী তাদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন। একপাতে খেলেন, নানা কথা বলে তাদের মনের ক্ষোভ দূর করলেন।

বিদ্যাসাগরের পাঠানো ছয়খানা লেপ অকাতরে বিলিয়ে দিলেন ভগবতীদেবী গ্রামের শীতক্লিষ্টদের মধ্যে। বিদ্যাসাগরকে লিখলেন বাড়ীর জন্য লেপ পাঠাতে , কারণ আগের পাঠানো লেপগুলি গ্রামের লোককে দিতে হয়েছে। মাকে ভালভাবেই চিনতেন বিদ্যাসাগর। তাই মোট কয়টি লেপ পাঠালে গ্রামের সব শীতক্লিষ্ট মানুষকে দেওয়ার পর বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয় লেপ অবশিষ্ট থাকবে তা জানতে চাইলেন। চিঠি পেয়ে ভগবতীদেবী মহাখুশী। তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় লেপের সংখ্যা জানিয়ে দিলেন। পীড়িত মানুষের সেবায় একজন যেন অন্যজনের পরিপূরক ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগরের যে করুণা অজস্র ও অনিবার্যধারায় সমস্ত মানুষের দিকে প্রবাহিত হোত, তার প্রেরণা ছিলেন প্রধানত ভগবতীদেবী। তাঁর সহানুভূতি জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে অভিষিক্ত করত। আত্মসুখের বা নিজের পরিবারের গন্ডীর মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না। মায়ের এই মানসিকতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

১৮৫৩ সালে 'বীরসিংহ স্কুল' স্থাপিত হওয়ার পর প্রায় ষাটজন ছাত্র বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে থেকে, ওখানেই খেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করত। তাদের খাওয়াদাওয়া তদারক করতেন ভগবতীদেবী নিজে। ১৮৬৯ সালে যখন আগুন লেগে বিদ্যাসাগরের বাড়ী পুড়ে গেল, তখন

তিনি মাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু যে ছেলেরা তাঁর বাড়ীতে খেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করে তাদের অসুবিধার কথা স্মরণ করে ভগবতীদেবী কলকাতায় যেতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি ছাত্রদের খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্য বীরসিংহেই থেকে গেলেন।

১৮৬৬ সালের 'উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের' সময় বীরসিংহে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য তিনিই প্রথম অন্নদানের ব্যবস্থা করেন। "হিন্দু পেট্রিয়টের" সংবাদদাতা ১৮৬৬ সালের ৩০শে জুলাই লিখছেন, "বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের মাতা প্রত্যহ ৪/৫ শত লোককে খাওয়াইয়া থাকেন।" বিদ্যাসাগর বীরসিংহ অঞ্চলে ব্যাপক অন্নাভাবের খবর পেয়ে এবং মায়ের অন্নদানের কাহিনী শুনে গ্রামে একটি অন্নসত্র খুলে আশেপাশের অনেক গ্রামের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এই অন্নসত্রের রান্নার তদারকিতে ছিলেন ভগবতীদেবী। এই শ্রমসাধ্য সেবা ছিল তাঁর গৌরবের বিষয়। বিদ্যাসাগরের বন্ধু হিন্দীকবি হরিশচন্দ্র যখন ভগবতীদেবীর হাতে সোনার বালা না দেখে আফসোস করলেন, তখন ভগবতীদেবী বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি নিজের হাতে হাজার হাজার লোককে রান্না করে খাইয়েছেন; সেই সেবাই তাঁর হাতের বড় শোভা। সোনার গহনার প্রয়োজন নাই। ভগবতীদেবীর মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব এবং নিরলস সেবাপরায়ণতার তুলনা পাওয়া কঠিন।

কোনও বালবিধবার করুণ কাহিনী বিদ্যাসাগরের নিকট বর্ণনা করে ভগবতীদেবী বিদ্যাসাগরকে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে উদ্যোগী করেছিলেন, এই কাহিনীর যথার্থতা সন্দেহাতীত নয়; কিন্তু একথা সত্য যে "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামক প্রথম পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তিনি মাতা ও পিতার মত নিতে গ্রামে গিয়েছিলেন। উভয়েই সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর স্বয়ং স্বীকার করেছেন, "পিতামাতার মত না থাকিলে অন্তত তাঁদের জীবদ্দশায় একার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।" বিহারীলাল সরকার বিধবা-বিবাহ বিরোধী। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে এই অকীর্তিকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। পিতামাতার অমত হইলেই বিদ্যাসাগর নিশ্চিতই বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রয়াসে বিরত হইতেন।" বিহারীলালের আফসোস, পিতামাতার অমত ছিল না।

বিদ্যাসাগরের শুভবুদ্ধিতে পিতামাতার বিশ্বাস ছিল গভীর, অবিচল। ভগবতীদেবীর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, কিন্তু তিনি একথা বিশ্বাস করিতেন যে তাঁর পুত্রের শাস্ত্রাধিকার অসামান্য এবং তাঁর সৎবুদ্ধিরও অভাব নেই। তাই নির্দ্বিধায় তিনি পুত্রের ইচ্ছা ও কর্মধারাকে সমর্থন জানিয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা গৃহীত না হলেও ক্ষুণ্ন হতেন না। প্রধানত পারস্পরিক কলহের জন্য বিদ্যাসাগর যখন ভাইদের সঙ্গে পৃথগন্ন হওয়া সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন ভাইদের সঙ্গে মা ভগবতীদেবীও নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর নিবৃত্ত হন নি। ভগবতীদেবীর তাতে কোনও চিত্তবিক্ষেপ ঘটেনি। বিদ্যাসাগর যদিও পিতামাতা দু'জনের প্রতিই সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তবুও মানসিক দিক থেকে মায়ের সঙ্গেই তাঁর মিল ছিল বেশী।

ভগবতীদেবী ঠাকুরদাসের মত প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসী বা ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবতী ছিলেন বলে মনে হয় না। বীরসিংহের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজা নিয়ে ঠাকুরদাস-ভগবতীর মতানৈক্য এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বিহারীলাল লিখছেন যে ঠাকুরদাস পূজা উপলক্ষে বাদ্য-বাজনা ধুমধাম

করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ভগবতীদেবী চেয়েছিলেন ধুমধাম করে ব্যয়বাহুল্য না করে গরীব কাঙ্গালীদের খাওয়াতে। চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "এই প্রবীণা গৃহিণী মূর্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের নিকট বলিয়াছেন, 'আমার মা বলিতেন, যে দেবতা আমি নিজহাতে গড়িলাম সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটিতে ঠাকুর গড়ে পূজা করে কী ধর্ম হয়।" শম্ভুচন্দ্র অবশ্য চণ্ডীচরণের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, "চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তা সম্পূর্ণ অলীক কথা। জননীদেবী মধ্যে মধ্যে গ্রাম্যদেবতার পূজা দিতে এবং বিদেশস্থ ছেলেদের উদ্দেশ্যে বচনীর পূজা মানসিক করিতেন এবং পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধও করিতেন। তাঁহারই আগ্রহাতিশয়ে বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজা হইত, তিনি ভক্তিপূর্বক পূজার আয়োজন করিতেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। এতদ্ভিন্ন কালীঘাট ইত্যাদি তীর্থপর্যটনেও যাইতেন।"

চণ্ডীচরণ দাবি করেছেন, তিনি ভগবতীদেবীর মূর্তিপূজা সম্পর্কে মতামত স্বয়ং বিদ্যাসাগরের নিকট শুনেছেন। চণ্ডীবাবুর বক্তব্যকে সুতরাং সম্পূর্ণ অলীক বলা সম্ভব নয়। আবার শম্ভুচন্দ্রও তাঁর মায়ের ধর্মাচরণ দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং তিনি যে চণ্ডীচরণের বক্তব্যের প্রতিবাদ কেবল প্রতিবাদের খাতিরে করেছেন তা মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে ভগবতীদেবী লৌকিক ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন নি বটে, কিন্তু ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। পাপ-পুণ্যবোধের ও শ্রেয়োবোধের যে ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, তা প্রচলিত ধারণার থেকে ভিন্ন। সেইজন্য তিনি তীর্থযাত্রা এবং তীর্থবাসে উদাসীন ছিলেন। ১৮৪১ সালে এবং ১৮৫৯-৬০ সালে ঠাকুরদাসের তীর্থযাত্রায় তিনি সঙ্গিনী ছিলেন না, এবং ১৮৬৫ সালে ঠাকুরদাস যখন কাশীবাসের সিদ্ধান্ত করেন, তখনও তিনি তাঁর সঙ্গে কাশীবাসিনী হননি। ঠাকুরদাসের কাশীবাসের ইচ্ছা জেগেছিল একটি দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর। যে স্বপ্ন ঠাকুরদাসের মনে একটি পলায়নী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, বিদ্যাসাগর সেই স্বপ্ন অলীক বলেই মনে করেছেন। স্বপ্ন সম্পর্কে ভগবতীদেবীর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা নিশ্চিত করে জানার উপায় নেই, তবে একথা নিশ্চিত যে তিনি ঠাকুরদাসের মতে মত দেননি। স্বপ্নে যদি তিনি বিশ্বাসও করতেন, তবুও স্বপ্নদৃষ্ট ভবিতব্য থেকে পালিয়ে মানসিক শান্তি খোঁজার ইচ্ছা তাঁর মনে একবারও জাগেনি। বস্তুতপক্ষে, ভগবতীদেবীর মনের যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে স্বপ্নে বিশ্বাস করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো মনের দুর্বলতা তাঁর ছিল না। পুণ্যের প্রতি কোনও আকর্ষণ ছিল বলেও মনে হয় না। ঠাকুরদাস একলা তীর্থযাত্রা করলে, ভগবতীদেবী বীরসিংহে দুঃস্থ মানুষের সাহায্য, চিকিৎসালয়ে রোগীর তত্ত্বাবধান, ছাত্রদের খাওয়াদাওয়ার তদারকি ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন। ১৮৬৫ সালে ঠাকুরদাস কাশীতে বসবাস করতে এলেন, কিন্তু ভগবতীদেবী কাশীতে প্রথম আসেন ১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে।

কিছু লোকাচার ভগবতীদেবী অবশ্যই মানতেন ; তবে সেটা অনেক সময় কোনও গভীর ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণায় নয়। গ্রাম্য সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন আবহাওয়ায়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে কিছু লোকাচার মেনে নিতেই হয়। এটি বিশ্বাসের থেকে অনেক সময় বাস্তবমুখিতাই প্রমাণ করে। ছেলেরা যখন কলকাতায় পড়াশুনা করতো, তখন সমসাময়িক জীবনের অনিশ্চয়তার জন্য উদ্বেগে-আশঙ্কায়, ছেলেদের মঙ্গল-কামনায় বার-ব্রত পালন করা অসম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় দুই ছেলের কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল। ধর্মাচরণের প্রতি ভগবতীদেবীর

প্রকৃত মনোভাবটি শম্ভুচন্দ্রের বর্ণিত একটি ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। শম্ভুচন্দ্র লিখছেন, ১৮৬৯ সালে কাশীতে গিয়ে, "জননীদেবী পিতৃদেবের নিকট কতিপয় দিবস অবস্থিতি করেন, তদনন্তর অন্যান্য তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া পুনরায় কাশীতে সমুপস্থিত হন। মাতৃদেবী পিতৃদেবকে বলেন, 'এখন হইতে এস্থলে অবস্থিতি করা অপেক্ষা আমরা দেশে অবস্থিতি করিলে, অনেক দরিদ্র অক্ষম লোককে ভোজন করাইতে পারিব, দেশে বাস করিয়া প্রতিবেশীবর্গের অনাথ শিশুগণের উপকার করিতে পারিলে আমার মনের সুখ হইবে। আমার মৃত্যুর বিলম্ব আছে। আমি আমার সময় বুঝিয়া আসিব।' তিনি ঠাকুরদাসকে সংসার ত্যাগ করে "তাড়াতাড়ি তীর্থস্থলে" আসার জন্য মৃদু তিরস্কারও করেন। এমনকি দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধও করেন। "আপনাকে এখনও অনেকদিন বাঁচিতে হইবে, কায়িক অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, এত তাড়াতাড়ি তীর্থস্থলে আগমন করা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।" ঠাকুরদাস দেশে ফিরতে রাজী হননি ; মৃত্যুর পূর্বে তিনি দশবছরের অধিককাল কাশীবাস করেছিলেন। বীরসিংহে ফিরে ভগবতীদেবী তাঁর দৈনন্দিন কাজে অর্থাৎ গ্রামের পীড়িত মানুষের সেবাশুশ্রূষা, দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য, বীরসিংহ স্কুলের ছেলেদের খাওয়াদাওয়ার তদারকি ইত্যাদিতে অনেক বেশী মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছিলেন। তাঁর আচরণে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে দেবতা নয়, ধর্ম নয়, পুণ্য নয়, মানুষ এবং মানুষের সেবাই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। তিনি মূর্তিপূজায় কতটা বিশ্বাস করতেন, এই অমীমাংসিত বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণের সেবা না হলে যে পূজার উৎসব সম্পূর্ণ হবে না, এই বক্তব্য ভগবতীদেবীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাঁর আচরণ ও বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি বলেছিলেন যে গ্রামের মানুষ যদি খেতে না পায়, তবে প্রত্যেকদিন পূজা করার প্রয়োজন নাই। তীর্থবাসের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নয়, সংসারের বৈচিত্র্যময় ঘটনাপ্রবাহের আবর্তে, সমাজে বিচিত্র মানব-সম্বন্ধের মধ্যেই যে তাঁর আত্মার তৃপ্তি ছিল, তা তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয় থেকে দৃষ্টিকে মানুষের জীবনযাত্রার পথে প্রসারিত করার মধ্যে ভগবতী ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষের দুঃখ-কষ্টে বিষাদ-বেদনায় দুজনেরই হৃদয় সহানুভূতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে, দুজনেই সমান আবেগে ব্যক্তিমানুষের দুঃখমোচনে নিজেদের নিয়োজিত করেন। মানবতাবোধের এই উত্তরাধিকার বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন ভগবতীদেবীর কাছ থেকে। বস্তুতপক্ষে মাতা-পুত্রের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির এই গভীর সাদৃশ্য থেকেই জনমানসে এমন কতকগুলি কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল, যেগুলি ঘটনার দিক থেকে সত্য না হলেও, দু'জনের মধ্যের গভীর আত্মিক যোগসূত্রটি নির্ভুলভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। মায়ের আহ্বানে বর্ষার দামোদর পার হওয়া কিংবা গহনার বদলে গ্রামে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরি করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাহিনীগুলি মাতাপুত্রের মনে এক গভীর সহমর্মিতার প্রতি ইঙ্গিত করছে।

সাংসারিক জীবনে স্বামী, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে বাস করার মধ্যেই ভগবতীদেবী আনন্দ পেতেন। পরিশ্রমে তিনি কখনও কাতর ছিলেন না। পবিবার-পরিজন ছাড়াও অতিথি-অভ্যাগত ইত্যাদি সকলের জন্য পরিশ্রম করেই তিনি আনন্দ পেতেন। এই পরিশ্রমের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকত তার গভীর মমত্ববোধ ও অকৃপণ স্নেহ।

শেষজীবনে যখন পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রীদের নিয়ে সংসার করেছেন, তখনও পরিশ্রম করতেন উদয়াস্ত। সংসারে আত্মজনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে বেশ সুষ্ঠুভাবে মেনে নিয়ে, কখনও কখনও বিরোধী মনোভাবের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে পারতেন তিনি। এর জন্য দরকার হোত সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের। ভগবতীদেবীর মধ্যে এই দুই গুণের অভাব ছিল না।

ঠাকুরদাসের সঙ্গে অবশ্য মাঝে মাঝে মনান্তর ঘটত। ঠাকুরদাসের রাগ কম ছিল না, ভগবতীদেবীর ছিল রাগ-মিশ্রিত অভিমান। তাই মাঝে মাঝে দু'জনের কথা-কাটাকাটি যখন কলহে পর্যবসিত হোত, তখন ভগবতীদেবী শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। সেই অভিমান ভাঙ্গানো দুষ্কর ছিল। কিন্তু ঠাকুরদাস জানতেন ভগবতীদেবীর একটি দুর্বলতার কথা। ভগবতীদেবী বড় মাছ নিজে কাটতে ভালবাসতেন এবং রান্না করতেও। ঠাকুরদাস অভিমান ভাঙ্গানোর জন্য একটি বড় রুই বা কাতলা যোগাড় করে এনে উঠানে ফেলে দিতেন। মাছের শব্দে ভগবতীদেবীর অভিমান আর থাকত না; তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে মাছ কাটতে বসতেন। বস্তুতপক্ষে, পারিবারিক জীবনে বিদ্যাসাগরের তুলনায় ভগবতীদেবী অনেক বেশী সহনশীলা। তাঁর ক্রোধও তাড়াতাড়ি প্রশমিত হোত, জিদও অনমনীয় ছিল না। অপরপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিটি তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে পারতেন। ফলে আত্মীয়স্বজনদের উপর ভগবতীদেবীর যে প্রভাব ছিল, বিদ্যাসাগরের তা ছিল না।

ভগবতীদেবী দ্বিতীয় ও শেষবার কাশী যান ঠাকুরদাসের অসুস্থতার খবর পেয়ে। তিনি তখন বীরসিংহে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র ভগবতী-দেবীকে নিয়ে সন ১২৭৭ সালের ২রা ফাগুন কাশীযাত্রা করেন। ভগবতী আর বীরসিংহে ফিরে আসেন নি। ঈশ্বরচন্দ্রও কলকাতা থেকে কাশী রওনা হন। উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষায় ঠাকুরদাস সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই সময়েই কাশীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাদানুবাদের সময় তিনি তাঁর পিতামাতাকে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা মনে করেন বলে বলেছিলেন। কিঞ্চিৎ উত্তেজনার মুহূর্তে এই কথাটি বললেও পিতা-মাতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার মনোভাবটি নির্ভুলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাশী চিরদিনই সম্বলহীন বিধবা পুণ্যলোভী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আশ্রয়স্থল। এখানে কয়েকজন বয়স্কা স্ত্রীলোককে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে শুনে ভগবতীদেবী বিদ্যাসাগরকে বলে তাদের মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তীর্থক্ষেত্রেও পুণ্যসঞ্চয়ের থেকে বিপন্ন কয়েকজন বৃদ্ধার অন্নকষ্ট নিবারণেই তাঁর মানসিক শান্তি ছিল বেশী। এই জায়গাতে মাতাপুত্রের মনের গভীর মিল।

ঠাকুরদাস সুস্থ হলে ভগবতীদেবী ও তিন ভাইকে বাবার কাছে রেখে কলকাতা রওনা হলেন বিদ্যাসাগর সন ১২৭৭ সালের ১৫ই ফাগুন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মায়ের সেই শেষ দেখা। চৈত্রমাসের শেষে ভগবতীদেবী নিজে কলেরায় আক্রান্ত হলেন। ১২৭৭ সালের চৈত্রসংক্রান্তির দিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৫/৬৬ বৎসর। বিদ্যাসাগর ছাড়া তাঁর অন্য পুত্র, পৌত্র এবং ঠাকুরদাস তাঁর মৃত্যুকালে শয্যাপার্শ্বে ছিলেন ; কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, যে পুত্রের সঙ্গে তাঁর মনের এত মিল, যে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ছিল সীমাহীন, সেই ঈশ্বরই তখন তাঁর কাছে ছিলেন না। ভগবতীদেবীর মৃত্যুসংবাদে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন বিদ্যাসাগর। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "তিনি দিবারাত্র রোদন করিয়া সময়াতিপাত

করিতেন।" কাশীপুরের গঙ্গার ঘাটে তিনি শ্রাদ্ধাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন—লোকাচার অনুযায়ী একবছর তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন। একবেলা নিরামিষ খেয়েছেন, মেঝেতে শুয়েছেন, খালিপায়ে রাস্তা হেঁটেছেন। শরীর অসুস্থ থাকলে দিনময়ীদেবী মাঝে মাঝে সাহায্য করেছেন বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তিনি নিজেই হবিষান্ন রান্না করে নিতেন।

ভগবতীদেবীর মৃত্যুর পর প্রায় তিন বছর পরে, সন ১২৮০ সালে, ঠাকুরদাস আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে বিদ্যাসাগর কাশী গিয়ে অনেক চেষ্টায় অসুস্থ ঠাকুরদাসকে সুস্থ করে তোলেন। এই সময় ভগবতীদেবী যাদের মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাদের কয়েকজনের মাসোহারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যাসাগর পুনারায় মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যাসাগরের রবীন্দ্রনাথ-কথিত "অক্ষয় মনুষ্যত্বের" ভিত্তি ছিল ভগবতীদেবীর সংস্কার-মুক্ত মন এবং দুঃস্থ মানুষের সেবা করার দুর্বার ইচ্ছা। এই ঋণ বিদ্যাসাগর স্বীকার করেছেন অনেকভাবে। পরবর্তী কালে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলতেন, "আমি যদি আমার মায়ের গুণাবলীর শতাংশের একাংশও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম।" এই ঋণ স্বীকারের মধ্যে অতিশয়োক্তির ভাগ বেশী নয়। বিদ্যাসাগরের কলকাতার ভাড়াবাড়ীর লাইব্রেরীঘরে পিতামাতার ছবি টাঙ্গানো থাকত। তিনি তাঁদের প্রণাম না করে জলগ্রহণ করতেন না। ১২৮৩ সালে বাদুড়বাগানে নিজের বাড়ীতে আসার পর দোতলার হলঘরে লাইব্রেরী করেন। সেই ঘরের একটি সর্বদা-দৃষ্টিগোচর জায়গাতেই পিতা-মাতার ছবি টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন। মায়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর শ্রদ্ধার উল্লেখ করে চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন। "জননীর লোকান্তরগমনের দীর্ঘকাল পরে প্রসঙ্গক্রমে যখন একবার তাঁহার পরমারাধ্যা গুণময়ী মাতার গুণের উল্লেখ করিতে হইয়াছিল, তখন তিনি নিতান্ত অসুস্থ। তাঁহাকে অসুস্থ শরীরে শিশুর ন্যায় কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হইতে দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "আপনাকে এত কষ্ট দিব জানিলে আমি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতাম না।" গুণবান পুত্র অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমায় কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি তো আমার বন্ধুর কার্য করিলে, তোমার প্রয়োজনসাধনেও তো এখন আমার মায়ের কথা মনে পড়িল, এও ভাল; এতই দুর্দশা যে সর্বদা সকল সময়ে পিতামাতাকে স্মরণ করিতে পারি না।"

চন্ডীচরণের কথায়, "কাশীতে জননীর মৃত্যু হওয়াতে দীর্ঘকাল আর কাশী যাইতে সম্মত হন নাই।" কাশীতে মায়ের মৃত্যু হয়েছিল বলেই কী কাশীর প্রতি তাঁর গভীর ক্ষোভ ও অনীহা জন্মেছিল? প্রায় তিন বৎসর পরে ঠাকুরদাসের অসুস্থতার সংবাদ শুনে কাশী গিয়েছিলেন সন ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। ১২৮১-এর বৈশাখে ঠাকুরদাস যেভাবে কাশীতে তাঁর মায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ করতেন, সেইভাবে জননীদেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলে, কৃতীকে স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবার প্রথা থাকায়, আমি ঐ কার্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দাদা ইহা দেখিয়া বলিলেন "তুমি একাই কি এ কার্য নিষ্পন্ন করিবে? আমি কি কেহ নই?" এই বলিয়া দাদা ঐসব ব্রাহ্মণের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুই-চারিজনের পায়ে ঘা থাকা-প্রযুক্ত তাহাতে পুঁজ নির্গত হইতেছিল। তাহা দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করেন নাই।" বস্তুতপক্ষে, এটি কেবল শাস্ত্রোক্ত নিয়মরক্ষার অনুষ্ঠান ছিল না ; বিদ্যাসাগরের

আচরণের মধ্যে মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আবেগ মিশে গিয়ে সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে মহিমময় করে তুলেছিল। পরবর্তী কালে মা নামে তাঁর আকর্ষণ এবং মাতৃসঙ্গীত শুনে বিহ্বল হয়ে যেতেন বলে লিখেছেন বিহারীলাল। "কেহ যদি ভিক্ষা করিতে গিয়া বলিত, 'আমার মা নাই,' তাহা হইলে চোখের জলে বিদ্যাসাগরের বুক ভাসিয়া যাইত। মা নাই শুনিলে বিদ্যাসাগর বাছবিচার করিতেন না। কেহ কখনও 'মা মা' বলিয়া গান গাহিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না।" এই মা কোনও অলৌকিক দেবীমূর্তি নয়; এই মা কোন ঐশ্বরিক শক্তির কাল্পনিক প্রকাশও নয়। এই 'মা' তাঁর মনে জাগিয়ে দিত রক্তমাংসে গঠিত ভগবতীদেবীর স্মৃতি। তাঁর স্মৃতিতেই বিদ্যাসাগর শোকে উদ্বেল হয়ে উঠতেন।

জীবনের প্রায় অন্তিমলগ্নে, মৃত্যুর দেড় বৎসর পূর্বে, বিদ্যাসাগর বীরসিংহে বন্ধ-হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়টি পুনরায় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টির নামকরণের সময় বিদ্যাসাগরের মনে পড়েছিল বীরসিংহের সঙ্গে, বীরসিংহের সকলশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে, প্রীতি ও ভালবাসায় জড়িত একটি নাম—সে নাম ভগবতীদেবীর। শম্ভুচন্দ্রের প্রস্তাব উপেক্ষা করে তাই তিনি বিদ্যালয়ের নাম রাখলেন "ভগবতী বিদ্যালয়"।

৫

ঠিক পরিবারের সীমার মধ্যে না হলেও বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গ্রামের বাল্যসঙ্গী গদাধর পাল ও কলকাতায় জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ীতে তাঁর বিধবা বোন রাইমণি দেবী, প্রায় পরিবারের মানুষ হিসেবেই বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও চিন্তাকে প্রভাবিত করেছেন। কালীকান্ত নিজের পরিবারের মধ্যে এক বিপর্যস্ত মানুষ। কুলীন ব্রাহ্মণ বলে বহুবিবাহের অধিকার অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করে বেশ কয়েকটি স্ত্রীর স্বামী; কিন্তু যেহেতু দুর্বল চরিত্রের মানুষ, তাই নিজের ন্যায্য অধিকার বা বিচার-বিবেচনাকে কার্যকরী করতে পারেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি স্নেহে উদ্বেল, প্রশংসায় প্রগল্‌ভ। ঈশ্বরকে কলকাতায় পড়ানোর জন্য ঠাকুরদাসের চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করেছেন তিনি। ঠাকুরদাসের সামর্থ্যে সম্ভব নয় বলে ঈশ্বরকে কালীকান্তের প্রস্তাবমতো ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া যায় নি। তিনি নিজে কলকাতায় এসেছেন ছাত্রের শুভ আকাঙ্ক্ষায়। বিদ্যাসাগর এঁর মধ্যে দেখেছেন এক নিষ্ঠাবান, স্নেহ-প্রবণ শিক্ষক, যাঁর প্রভাবে তিনি পরবর্তী জীবনে ছাত্রদের মারধর করা মোটেই সমর্থন করতেন না। বহুবিবাহের কুফলগুলিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কালীকান্তের জীবনে। এই দৃষ্টান্তও বিদ্যাসাগরের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।

গদাধর পাল বীরসিংহের এক অসমসাহসী ও অমিত বলশালী যুবক। বিদ্যাসাগরকে বাল্যকালে কাবাডি শিখিয়েছেন, পুকুরে সাঁতার শিখিয়েছেন, লাঠিখেলাও শিখিয়েছেন। শক্তি ও সারল্যের প্রতিমূর্তি এই ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের প্রতি স্নেহে ও আনুগত্যে তাঁর ভাইদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তখনও তিনি এই যুবকের সঙ্গে খেলাধুলা ও গল্পগুজবে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। গদাধরের আনুগত্য ছিল অসাধারণ। মুচিরাম-মনমোহিনীর বিয়ের সময় বিদ্যাসাগরের ভাইয়েরাও যখন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন, তখন গদাধরই বিদ্যাসাগরের কথামত কাজ করেছিলেন। গ্রামত্যাগের পর বিদ্যাসাগরের মনে কিছুদিনের জন্য নিভৃতবাসের ইচ্ছা জাগে এবং সেইজন্য তিনি সমস্ত আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠি দিয়ে বিদায় নেন। সেই সময় গদাধরকেও একটি মর্মস্পর্শী চিঠি

লিখে বিদায় নিয়েছিলেন। গদাধর, বস্তুতপক্ষে, তাঁর কাছে বীরসিংহের সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি।

গদাধরই বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্যচর্চার প্রেরণা। এই অকুতোভয় যুবক ভরা বর্ষায় গঙ্গানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে সবাইকে আশ্চর্য করে দেন। স্বাস্থ্য ও শক্তিচর্চার জন্য সংস্কৃত কলেজে মালীদের ঘরের সামনে বিদ্যাসাগর একটি কুস্তির আখড়া খুলে শুধু নিজেই স্বাস্থ্যচর্চা করতেন না, ছেলেদেরও কুস্তির আখড়ায়যোগ দিতে ও স্বাস্থ্যচর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক ও শারীরিক শক্তির অন্যতম প্রধান উৎসটি নিহিত ছিল পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবের মধ্যেই।

২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা

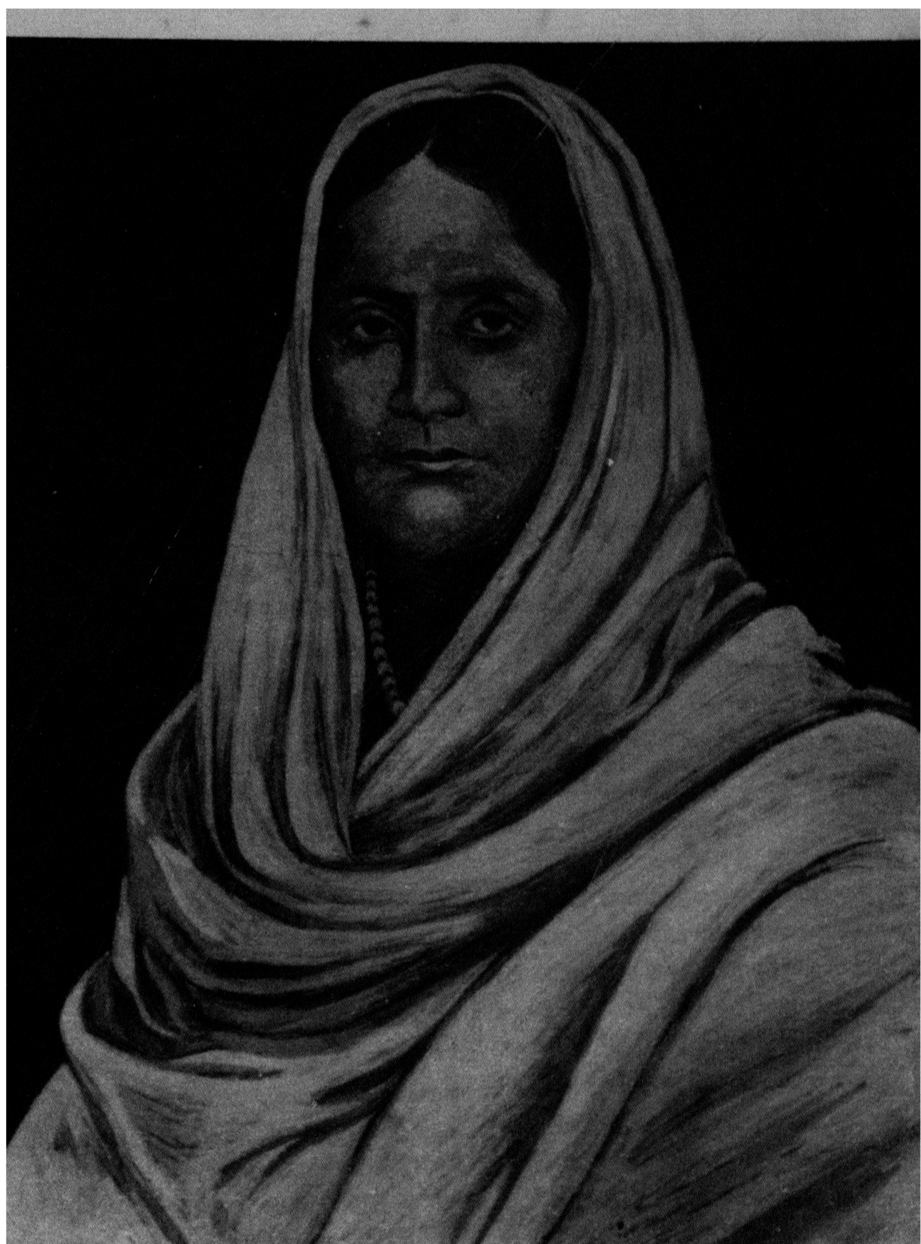
এদেশে শিক্ষার উন্নতি ও জনশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চিন্তা পরিণতি লাভ করেছিল ১৮৪২ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে। ভারতে ইংরেজ শাসন তখন ধীরে ধীরে দৃঢ় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল একটি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে ভারতবর্ষের পূর্বতন শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মুখে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেশে কয়েক শতাব্দীব্যাপী যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার বিস্তৃতি ছিল তৃণমূল পর্যন্ত। পাঠশালা-টোল-মক্তবের জনশিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গ্রামের স্বনির্ভর অর্থনীতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের (১৮০১-১৮০২) ডিস্ট্রিক্ট রির্পোট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও ঢাকা জেলার প্রত্যেকটি গ্রামে পাঠশালা অথবা মক্তব ছিল[১]। কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্রুত অবক্ষয় শুরু হোল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ খাজনা আদায়ের অধিকার লাভের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেল। ১৭৬৯-৭০ সালের ভয়াবহ মন্বন্তর, এবং শেষে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিকে দুর্বল করে তার স্থিতিশীলতা এবং স্বনির্ভরতা নষ্ট করে দিল। বিদেশী-বাণিজ্যের সংঘাতে এবং ক্রমবর্ধমান আধিপত্যে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পও ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে দাঁড়াল। ফলশ্রুতিস্বরূপ গ্রামের পাঠশালা-মক্তব-টোল-মাদ্রাসার শিক্ষা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হোল। এই শিক্ষা সরকারী কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামান্য পঠন-পাঠনের পক্ষে ছিল যথেষ্ট। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। অবশিষ্ট পাঠশালা-মক্তবগুলিতে বৃত্তিজীবী শ্রেণীর ও হিন্দুসমাজের অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল[২]। কালক্রমে এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল।

প্রধানত বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ইংরেজরা প্রথমদিকে ভারতীয় ধর্ম ও আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করা, এমনকি বিরূপ মন্তব্য করা থেকেও বিরত থাকত। ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও একটি সমদর্শিতার ভাব ছিল। বেনিয়ান-গোমস্তাদের দোল-দুর্গোৎসবে আমন্ত্রিত ইংরেজরা উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিতেন। ব্যবসা ও খাজনা আদায়ের জন্য এদেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল ; ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেও স্থানীয় ভাষা ও আদবকায়দা শিখতে কোম্পানির 'রাইটার'দের (writer) উৎসাহিত করতেন। তিনি নিজেও এদেশের একাধিক ভাষা শিখেছিলেন। ক্রমে ক্রমে কোম্পানির কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী এদেশের ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন—যেমন উইলিয়ম জোন্‌স্

(১৭৪০-১৭৯৪), এইচ. টি. কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮১৫), এইচ.এইচ. উইল্‌সন (১৭৮৬-১৮৪৫) ব্রায়ান হজসন (১৭৮৩-১৮৩৯) হেনরী শেক্‌স্‌পিয়ার (১৭৮২-১৮৪২), উইলিয়ম এইচ. ম্যাক্‌নটন (১৭৯৩-১৮৪১) চার্লস স্টিউয়ার্ট, এইট টি প্রিন্সেপ ইত্যাদি—প্রাচ্য ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ভারতের ভাষা-সংস্কৃতি না জানলে ভারত-শাসন করা সহজ হবে না[৩]। এই সময়ে প্রাচ্যবিদ্যার কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠল ; যেমন কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১), এসিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪), বেনারস সংস্কৃত কলেজ (১৭৯১), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)। কেবল প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ছিলেন বলেই নয়, ভারতের শাসনব্যবস্থায় ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রাচ্যভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষেও জোরদার সওয়াল করতেন বলে এঁরা Orientalist বলে পরিচিত হলেন।

হেস্টিংস-এর মতো, গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে প্রাচ্যবিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল কলেজটি কালক্রমে Oxford of the East রূপে পরিচিত হবে। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল সম্ভবত পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারেন নি। এটাও তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি যে জাতি হিসাবে ইংরেজ-ভারতীয় সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমী হওয়ার পর, এমন এক মোড় নিচ্ছে যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে শিক্ষিত করে এদেশের প্রশাসনিক কাজকর্মের উপযুক্ত করে তোলা। এই সীমিত লক্ষ্য ও শিক্ষাসূচী নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কোনও দিন প্রাচ্যবিদ্যাশিক্ষার মধ্যমণি হয়ে উঠবে—এইরূপ আশা যুক্তিযুক্ত ছিল না। ইংল্যাণ্ডে ওয়েলেস্‌লির উপরওয়ালারা অবশ্য শাসকজাতির দৃষ্টিভঙ্গি যাতে প্রশাসকদের আচারে-ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়, তার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮০৫ সালে ইংল্যান্ডের হার্টফোর্ডশায়ারে প্রতিষ্ঠিত হোল হেইলেবেরী কলেজ (Haileybury College)। ইতিমধ্যে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে দৃঢ় করেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যতই ইংরেজদের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে লাগল, ততই বাণিজ্যের জন্য ভারতীয়দের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে জাত্যভিমান ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ককে কলুষিত করল। ভারতীয়দের প্রতি এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটল হেইলেবেরীর প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে। একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র, যিনি অপেক্ষাকৃত উদারচেতা বলে পরিচিত ছিলেন, ১৮৬৪ সালে এক ভোজসভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "It was there (Haileybury College) that we first became cognizant of the fact that we were members of the civil service, a body whose mission is to rule and to civilise the empire which had been won by us by the sword ; it was there that we first became first impressed with a conviction that as members of such a body there were certain tradition to be kept up and a code of private and public honour to be rigidly maintained".

হেইলেবেরী কলেজ সচেতন ভাবে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে দূরত্বসৃষ্টিতে, জাত-



প্রাধান্যের চেতনাকে দৃঢ়মূল করতে সাহায্য করেছিল। শাসকশ্রেণী হিসেবে ইংরেজদেব সঙ্গে ভারতীয়দের সমদর্শী সামাজিক যোগাযোগের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হোল ১৮২৭ সালে 'বেঙ্গল ক্লাব' প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই ক্লাবে ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়দেরও প্রবেশাধিকার ছিল না।

খ্রীষ্টান পাদরিদের ধর্মান্তরকরণের ফলে এদেশের মানুষের সঙ্গে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদ্ভাব নষ্ট হবে, ফলে বাণিজ্যিক স্বার্থ ব্যাহত হবে—এই আশঙ্কায়, ১৮১৩ সালের আগে, কোম্পানি-শাসিত এলাকায় ধর্মযাজকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি উঠল। চার্লস গ্রান্ট্ (১৭৭৮-১৮৬৬) যখন ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন, তখন প্রাচ্যবিদ্যা-অনুরাগী বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পর তিনি খ্রীষ্টধর্মে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে ক্ল্যাপহ্যাম সেক্ট (Clapham Sect) নামে একটি উগ্র ধর্মীয় সংস্থায় যোগ দিয়ে ভারতবর্ষকে সভ্য করার চেষ্টায় এক আন্দোলন গড়ে তুললেন। কোম্পানির বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টার-এর সদস্য হিসাবে কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থায় তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। তিনি একটি পুস্তিকা* প্রকাশ করে মতপ্রকাশ করলেন যে, রোমান সম্রাটদের মতো ব্রিটিশ সম্রাটেরও উচিত ভারতবর্ষকে বর্বরতা থেকে সভ্যতার আলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। সম্রাটও খ্রীষ্টধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষকে অবনমনকারী ধর্ম ও বর্বর সভ্যতা থেকে রক্ষা করা দরকার। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারলে ভারতবর্ষে সভ্যতার আলো পৌঁছাবে। কিন্তু ধর্মান্তরকরণের জন্য শিক্ষার একটা নিম্নতম মানের প্রয়োজন ; কারণ বাইবেল অন্ততঃ পড়তে হবে। সুতরাং, চার্লস গ্রান্ট্ এবং তাঁর সমধর্মী Evangilical-দের ব্যবস্থামত ভারতবর্ষকে 'সভ্য' করার জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আবার ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে হিন্দুধর্মের প্রতি ঘৃণা কিংবা ঔদাসীন্য জন্মে এবং ধর্মান্তরিত হওয়ারপ্রেরণা পায়। এই Evangilical-দের চাপেই ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের এদেশে আসার নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

Evangilical-দের ন্যায় খ্রীষ্টান মিশনারীরাও প্রধানত ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যেই শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। ইংরেজীভাষা শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে মাতৃভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার উপর তাঁরা জোর দিয়েছিলেন ; কারণ মাতৃভাষাতেই মানুষের মনকে সহজে আকর্ষণ করা যায়। ১৭৯৩ সালে শ্রীরামপুরে আসার কয়েক বৎসর আগেই উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) এদেশে ধর্মান্তরকরণ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনার কথা একটি বইতে' প্রকাশ করেন। কেরীর মতে, "The proper means for converting them was not teaching one's own language to the heathen elite, but to reach the masses in their own language". কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ইত্যাদি মিশনারীরা শ্রীরামপুর অঞ্চলে কয়েকটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা অনেক যত্নে বাংলা ও সংস্কৃত শিখে শ্রীরামপুরে একটি বাংলা প্রেস স্থাপন করেন এবং ঐ অঞ্চলে বাংলা ভাষার কয়েকটি স্কুলও স্থাপিত হয়। ১৮০৩ সালে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার পর কয়েকটি বাংলা পাঠ্য-বই প্রকাশ করেন। যোসুয়া মার্শম্যান মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের' সমর্থনে জোরালো যুক্তি দিয়ে শিক্ষাকে

তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তার করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। শ্রীরামপুরের এই মিশনারীরা শিক্ষা ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন যে, ধর্মান্তরকরণ প্রত্যাশামত করতে পারেন নি। তবুও ১৮১৩ সালে মিশনারীদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আগেই শ্রীরামপুর অঞ্চলে (শ্রীরামপুর ছিল "ডেনিস উপনিবেশ", তাই সেখানে মিশনারীদের আসার বাধা ছিল না) কিছু লোক ধর্মান্তরিত হয়েছিল। "তারপর বৎসরের পর বৎসর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল"[৯]। এই কারণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রামাঞ্চলে মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে ইংরেজী স্কুলে পড়লে ছেলেরা খ্রীষ্টান হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ (১৮০৬-১৮৭৮) মিশনারী হিসেবে এদেশে প্রায় ৩৩ বৎসরের অবস্থানকালে (১৮৩০-১৮৬৩) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, সেই সঙ্গে শিক্ষার মধ্যে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার অসফল প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন।

কোম্পানির শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের সমস্তটাই কেবল ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত ; কারণ ইংরেজী শিক্ষার ফলেই ভারতবর্ষের মানুষের কাছে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা খুলে যাবে[১০],—এই বিশ্বাস ছিল Anglicist-দের। উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) টি.বি.মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) এবং চার্লস ট্রিভেলিয়ান (১৮০৭-১৮৮৬) Anglicist-দের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। বেন্টিঙ্কের গভর্নর-জেনারেল (১৮২৮-১৮৩৫) হিসাবে নিযুক্তির পর থেকেই তিনি ইংরেজীকে প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী ছিলেন। ম্যাক্নটনের নেতৃত্বে Orientalist-রা তীব্র প্রতিবাদ জানাল। শেষ পর্যন্ত জয় হোল Anglicist-দের। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ লর্ড বেন্টিঙ্ক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইংরেজী ভাষা, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া আরও কোনও বিষয়ে শিক্ষার জন্য সরকারের বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা যাবে না[১১]। কমিটি অফ পাব্লিক ইন্সট্রাক্সন সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা শিক্ষার জন্য যে বৃত্তি দেওয়া (stipend) হোত, তা বন্ধ করে দিল। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যান্ড (১৮৩৬-১৮৪২) ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আইন করে (Act XXIX of 1839) সরকারী কাজে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী চালু করলেন। ফলে ফার্সী দেশ থেকে অচিরেই তুষারের মতো গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল[১২]। নিম্ন-আদালত এবং রাজস্ববিভাগের নিম্নস্তরের কাজকর্ম ফার্সীর বদলে বাংলাতে চালানো হবে বলে অবশ্য ১৮৩৮ সালে এক সরকারী আদেশ জারি করা হয়।

ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা ভারতীয়দের নিকট খুলে দেওয়াই বেন্টিঙ্ক-মেকলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। কিছু ভারতীয়কে ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে পারলে তাঁরা ইংরেজ শাসক ও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের মধ্যে একটি যোগসূত্র রূপে কাজ করবে। এইভাবে ধীরে ধীরে এমন একশ্রেণীর ভারতীয় তৈরী হবে যারা সাংস্কৃতিক বিচারে ও মানসিকতার দিক থেকে পুরোপুরি ভারতীয় হবে না, আবার ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মীয়তাও সম্ভব হবে না। এইভাবে ভারতবর্ষে কালক্রমে একটি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির জন্ম হবে যা ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়িত্ব দিতে সাহায্য করবে।

বেন্টিঙ্ক-মেকলে সংস্কৃত-আরবী-ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে জ্ঞানচর্চা ও প্রশাসনের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও, একথা তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেন নি যে, ইংরেজী কখনও

ভারতের ভাষা হতে পারে না[১২], কিংবা চিরকালের জন্য ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। ভারতীয় ভাষাগুলি একদিন-না-একদিন সমৃদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবেই। তবে যতদিন পর্যন্ত ভারতীয় ভাষা সমৃদ্ধ না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ইংরেজীর প্রাধান্য থাকবে এবং ইংরেজীশিক্ষা ব্যয়সাধ্য বলে কেবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর মানুষ শিক্ষিত হলে সেই শিক্ষার ধারা জলের মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে সমাজের নিচের তলার মানুষদেরও অল্পবিস্তর শিক্ষিত করে তুলবে। অর্থাৎ সরকারী বরাদ্দের সব টাকাই উচ্চশ্রেণীর ইংরেজীশিক্ষার জন্য ব্যয় করলে, সেই শিক্ষার ছিটেফোঁটা থেকে জনসাধারণ বঞ্চিত হবে না এবং এইভাবেই ইংরেজীশিক্ষা সমাজের তৃণমূলে পৌঁছে যাবে। এই "downward filtration" তত্ত্ব ছিল দেশ ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন। ব্যয়সাধ্য ইংরেজী শিক্ষা এমনিতেই নিচুতলার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। যে উচ্চশ্রেণীর মানুষ ইংরেজী শিক্ষার ফলে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন এবং শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছেন, তাঁরা সচেতন ভাবে তাঁদের সেই ঈর্ষণীয় অবস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে আগ্রহী হবেন না। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচুতলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে,—এ ধারণা ছিল অবাস্তব। ১৮৬৮ সালে লালবিহারী দে এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, উচ্চবিত্তশ্রেণী আসলে ফিল্টার নয়, এটি একটি "jar hermitically sealed".[১৩] লর্ড অকল্যান্ড (১৮৩৬-১৮৪২) এই filtration তত্ত্বের প্রভাবে বেশী সংখ্যায় স্কুল স্থাপনের থেকে কয়েকটি নির্বাচিত উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দিয়ে উন্নতমানের পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করাতেই বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন।

Anglicist এবং পাশ্চাত্যশিক্ষার ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য ছিল। ভারতীয় সমর্থকরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানচেতনাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন দেশের মানুষকে কুসংস্কার ও কুপ্রথা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য। ডিরোজিও-র অনুগামীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগে এবং প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেছেন, ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধাও অনুচ্চারিত রাখেন নি। কিন্তু তাদের গরিষ্ঠ অংশ পরবর্তী কালে স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি নাম এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতবর্গও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট-এর বাড়ীতে যে সভা হয়, সেখানে অন্তত ৫০ জন বিত্তবান হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শহরের প্রধান পন্ডিতরাও ছিলেন[১৪]। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের মানবতাবাদী প্রভাবের ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক বিদগ্ধ পন্ডিতই ছিলেন উদারমতাবলম্বী ও সংস্কারপন্থী। মানব-কেন্দ্রিকতা ও মানবতাবোধ রেনেসাঁসের ও আধুনিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক মনীষীর এই আধুনিক মানসিকতা বিকাশলাভ করেছিল সংস্কৃত ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের প্রভাবে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-বিদ্যাসাগর তাঁদের বিদ্যা ও ব্যক্তিত্বের জন্য বিভিন্ন সংস্কার-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় সারিতে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত তাঁদের বিভিন্ন সময়ে অকুণ্ঠ

সহযোগিতা দিয়েছিলেন, যার ফলে আন্দোলন গতি লাভ করেছিল। মৃত্যুঞ্জয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ইত্যাদি অনেকের নাম করা যায় এই প্রসঙ্গে।

পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার ভারতীয় সমর্থকদের প্রধান অংশ মাতৃভাষার উন্নতি ও মাতৃভাষায় জনশিক্ষাবিস্তারকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করতেন। পূর্বতন জনশিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে বেন্টিঙ্ক রেভারেন্ড উইলিয়ম অ্যাডামকে জনশিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিতে বলেন[১৫]। অ্যাডামের রিপোর্ট পূর্বতন শিক্ষাব্যবস্থার সমকালীন অবক্ষয়, সেই ব্যবস্থার আরও সফলতা, এবং অতীত কতকগুলি ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃভাষায় শিক্ষার জোরালো সুপারিশ করেছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথাও বলেন অ্যাডাম। এই রিপোর্ট কমিটি অফ্ পাব্লিক ইন্সট্রাক্শন এবং ১৮৪২ সালের পর কমিটির পরিবর্তিত রূপ, কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনকে বিচলিত করেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরানো পাঠশালা-মক্তবকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব ছিল না। তখন ইংরেজীর প্রতি আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪২-১৮৪৬) ইংরেজী ভাষায় দক্ষতাকে সরকারী চাকুরির অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত বলে ঘোষণা করলেন। ফলে H. R. James-এর কথায় "It has given English education its value in terms of livelihood". সুতরাং ভারতীয় ভাষার প্রতি আকর্ষণ আরও কমে গেল।

এই পটভূমিতে হার্ডিঞ্জের ১০১টি বঙ্গ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনশিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা সফল হওয়া দুরূহ ছিল। হার্ডিঞ্জ এই বঙ্গ-বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার আগে শিক্ষক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে যখন মার্শালের সঙ্গে আলোচনা করেন, তখন বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত। তিনিও আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন।

এই অবস্থাটি ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিত। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অনিবার্য ভাবে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু আর্থ-সামাজিক কারণে এই শিক্ষা সমাজের উচ্চস্তর ছাড়িয়ে নিচের দিকে আর যেতে পারে নি। সেই সময় ইংরেজী শিক্ষা যে একটি শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে এই ধারণা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সেই একই কারণে মাতৃভাষায় জনশিক্ষার প্রসারও ব্যাহত হয়েছিল। শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তা ও মতের সংঘাত বিদ্যাসাগরের মনেও প্রভাব ফেলেছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে সংশ্লেষণ করে বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে একটি সুনির্দিষ্ট ও সংহত রূপ দিয়েছিলেন।

২

আট বৎসর বয়স পর্যন্ত বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পড়ার পর ১৮২৮ সালে কলকাতায় এসে ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। কালীকান্তের ইচ্ছা ছিল ঈশ্বর ইংরেজী পড়ুক ; ঠাকুরদাসেরও অনিচ্ছা ছিল না। অতীব মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে অচিরে বিত্তশালী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে এ সম্ভাবনা আকর্ষণীয় ছিল। সেই সঙ্গে 'সংস্কৃত ব্যবসায়ী' পরিবারের সংস্কৃত শিক্ষার ধারাটিকে বজায় রেখে ঈশ্বর

টোল-চতুষ্পাঠী খুলে বিদ্যাদান করবে এই সম্ভাবনাও তাঁকে পুলকিত করত। ঠাকুরদাসের পিতা রামজয় তর্কভূষণ, পিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শ্বশুর রামকান্ত তর্কবাগীশ, মাতামহ উমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ; ঠাকুরদাসই কেবল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাংসারিক অবস্থার জন্য টোল-চতুষ্পাঠীর কোনও উপাধি তিনি নিতে পারেন নি। এ অবস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বর তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এটি ছিল স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। ইংরাজী শিক্ষার সম্ভাবনা অনেক, কিন্তু তার খরচও বেশী। মাত্র দশটাকা মাসমাইনাতে ইংরাজী স্কুলের ব্যয় বহন করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত আত্মীয় মধুসূদন বাচস্পতির পরামর্শে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয়।

এই কলেজে বিদ্যাসাগরের ১১½ বৎসরের ছাত্রজীবনকাল (১লা জুন ১৮২৮ থেকে নভেম্বর ১৮৪১) আমাদের দেশের সমাজ ও শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। কলকাতার মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী তখন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নতুন নতুন চিন্তা ও মতামতের সংঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। হিন্দু কলেজ ছিল এইরূপ নতুন চিন্তা ও চেতনার সূতিকাগৃহ। হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ অবস্থানগত তফাত ছিল মাত্র একটি দেওয়ালের ; কিন্তু মানসিক দিক থেকে দূরত্ব ছিল প্রায় এক যুগের। সংস্কৃত কলেজে স্নাতকরা সাধারণভাবে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন ; কিন্তু তাঁরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার বা নতুন নতুন চিন্তার প্রয়োগ-চেষ্টাকে প্রতিরোধ করেছেন,—এ অভিযোগ করা যায় না। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয় ; তবে সাধারণভাবে সংস্কৃত পন্ডিতরা রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে ছিল অনন্য-সাধারণ ভূমিকা। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) স্বল্প সাড়ে চার বছরের (১৮২৬-১৮৩১) অধ্যাপনাকালে তাঁর সংস্কারমুক্ত ধর্মীয় প্রভাবশূন্য চিন্তার দ্বারা ছাত্রসমাজের একটি বিশিষ্ট অংশকে প্রভাবিত করে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তাতে চমক ছিল কিন্তু, তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল না। এই আন্দোলনের ঢেউ দৃশ্যত সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক মন্ডলীকে বিচলিত করতে পারেনি ; কিন্তু ডিরোজিয়ানদের দুঃসাহসিক কাজকর্ম সম্পর্কে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, একথাও বলা যায় না। এর পরবর্তী ঘটনাবলী—Anglicist ও Orientalistদের সংঘাত, মেকলের মিনিট (minute), বেন্টিঙ্কের সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজীর প্রবর্তন, সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার চেষ্টা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ক্রমাবনতি—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংবেদনশীল মনেও অনিবার্য ছায়া ফেলেছিল। তা ছাড়া, সংস্কৃত কলেজে পঠন-পাঠনের ত্রুটি এবং বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে সংস্কৃত শিক্ষার ক্রমবর্ধমান সীমাবদ্ধতা অন্তত বিদ্যাসাগরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাই সময় ও সুযোগ পাওয়ার পর তিনি প্রথমে সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজসাধ্য করতে মনোযোগ দিলেন। বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনেই তাঁর পরিকল্পনাটি দ্রুত কার্যকরী করতে হোল। একদিনের মধ্যে একটি নতুন সংস্কৃত ব্যাকরণের খসড়া তৈরি করে, সেই অনুসারে অতি অল্পসময়ের মধ্যে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত শিখিয়ে দেন। ১৮৫১ সালে সেই ব্যাকরণই বাংলা হরফে "উপক্রমণিকা" নামে প্রকাশিত হয়। দু'তিন বছর পরে তিন খন্ডে "ব্যাকরণ কৌমুদী" নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন (১৮৫৩-৫৪)। আজও তা সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা ছিল না বলে, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনাকালে ইংরেজী শিখতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীও, কারণ সিভিলিয়ান ছাত্রদের হিন্দী শেখাতে হোত। বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রথমে কিছুদুর শেখার পর রামগোপাল ঘোষ ও রাজনারায়ণ বসুর কাছে ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। হিন্দী শেখার জন্য মাসিক দশটাকা বেতনে একজন শিক্ষক রেখেছিলেন[১৬]। ফলে হিন্দী ও ইংরেজী—এই দুই ভাষাতেই তিনি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেওয়ার আগেই এটি হয়ে গিয়েছিল "Phantom College"। অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শালের চেষ্টাতে কলেজের কিছু উন্নতি হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে হেইলেবেরী প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ফোর্ট উইলিয়মের গুরুত্ব স্বাভাবিক ভাবেই কমে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সময়ে কলেজটিতে আর ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের তরুণ 'রাইটার'দের[১৭] আগমন ঘটত না। হেইলেবেরী থেকে পাস করে যেসব সিভিলায়নরা ফোর্ট উইলিয়মে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার শিখতে আসত, তারা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ছিল বয়সও তাদের বেশী। এইজন্য অনেক সময় অমিতব্যয়িতা ও অমিতাচারের ফলে শৃঙ্খলার অভাব ঘটত। এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্তে বিরক্ত হয়ে ১৮৪১ সালে Court of Directors কলেজের আইনকানুন আরও কঠোর করার নির্দেশ দেন। উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়াও পরীক্ষায় একাধিকবার ফেল করলে তাঁদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। এই নতুন নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ সিভিলিয়ানদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা স্মরণ করে বিদ্যাসাগরকে পরীক্ষায় পাস করানোর ব্যাপারে কিছুটা নরম হওয়ার অনুরোধ করেন মার্শাল। বিদ্যাসাগর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন ; স্থির করলেন চাকুরি থেকে পদত্যাগ করবেন, কিন্তু অযোগ্য ছাত্রকে পাস করিয়ে দিতে পারবেন না। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই দৃঢ়তার জন্য মার্শাল তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর অটুট বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে গিয়েছিল।

কিন্তু শুধু মার্শাল নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনাকালে (১৮৪১-১৮৪৬) বিদ্যাসাগর অনেক সিভিলিয়ান ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল ও উদারচেতা। কয়েকজন সিভিলিয়ানের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বহুদিনব্যাপী ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে তাঁর প্রারম্ভিক পরিচয় হয়, ফলে এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞানলিপ্সা বেড়ে গিয়েছিল। এই যুবকদের সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী মন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এই সিভিলিয়ানদের মধ্যে সিটন-কার চ্যাপম্যান, গ্রান্ট, বিডন, ইডেন ইত্যাদি প্রশাসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন; রবার্ট কস্ট নামে পাঞ্জাব অঞ্চলে নিযুক্ত একজন সিভিলিয়ান সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "তাঁহার সহিত আলাপ হইলে তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজে আসিয়া আমার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সুশীল ও সদ্ভাবপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি সাতিশয় সুখী হইতাম"[১৮]।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঁচ বৎসরের কর্মকালেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তা একটি সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই চিন্তাকে কাজে পরিণত করার জন্য নিজেকেও প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। ব্যক্তিগত প্রয়াসে ইংরেজী ও হিন্দী শিখেছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা তাঁকে পাশ্চাত্ত্যের দর্শন ও সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে সমসাময়িক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত করেছিল। এইরূপে বিরুদ্ধ মতামতের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন ; ফলে বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডন করার সাহস এবং নিজের বুদ্ধি ও চিন্তার উপর তাঁর আস্থা বেড়ে গেল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভবিষ্যৎ যে সংশয়াচ্ছন্ন, সে বিষয়ে মার্শালের কোনও সন্দেহ ছিল না বলে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য সংস্কৃত কলেজের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। ১৮৪৬ সালের আগে একবার বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে মনোনীত করা হয়েছিল। ঐ পদের বেতন ছিল ৯০ টাকা এবং বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বেতন পেতেন ৫০ টাকা। বিদ্যাসাগর কিন্তু ঐ পদ নিতে রাজী হননি। মার্শাল ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্কের প্রভাব যেমন ছিল, তেমনি তারানাথ তর্কবাচস্পতির ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি উপেক্ষিত থেকে যেতে পারেন, এ সম্ভাবনাও তাকে বিচলিত করেছিল। তাই তিনি তারানাথের নিয়োগের সুপারিশ করলেন। শুধু তাই নয়, চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ে কলকাতা থেকে কালনা হেঁটে গিয়ে তারানাথের আবেদনপত্র স্বয়ং নিয়ে এসে শিক্ষাবিভাগে জমা দিলেন[১৯]। এই স্বার্থলেশহীন শ্রমসাধ্য পরহিতব্রত মার্শাল এবং এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারী মোয়াটের নিকট অপ্রত্যাশিত। তিনিও বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী হয়ে উঠলেন। আবার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক-পদ খালি হলে বিদ্যাসাগরের পরিচিত সমযোগ্যতার একাধিক প্রার্থী ছিল বলে পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনের সুপারিশ করেন। সেই ভাবেই প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। এর পর বিদ্যাসাগরের সুবিবেচনার উপর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

শেষপর্যন্ত ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী হিসাবে যোগ দিলেন, তবে কোনও কারণে মতবিরোধ হলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ফিরে আসবেন বলে মার্শালকে জানিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কলকাতা ছোট আদালতের (Small Causes Court) জজ রসময় দত্ত তাঁর জজিয়তির কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, কলেজের সেক্রেটারীর দায়িত্বপালনে যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিতে পারতেন না। ফলে কলেজের প্রশাসন ছিল একেবারে ঢিলেঢালা। কোনও শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা ছিল না। অধ্যাপকরা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সুবিধামত কলেজে আসতেন। ১৮৪৫ সালে জুনিয়র বৃত্তি-পীরক্ষার ফলাফল ছিল খুবই খারাপ। কলেজে যোগ দেওয়ার পর বিদ্যাসাগর নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন ; অনায়াস দৃঢ়তায় নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনলেন। ১৮৪৬ সালের জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার ফলাফল খুব ভাল হোল। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী সংস্কারের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করলেন [২০]। এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীর কর্মকুশলতা সুনজরে দেখার মতো চারিত্রিক ঔদার্য রসময় দত্তের ছিল না। তাই পাঠ্যসূচী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পরই সেক্রেটারী হিসাবে তাঁর অসহিষ্ণু ও অবিবেচক কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করার জন্য সেক্রেটারীর সুপারিশ এবং কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। সুপারিশ করার সময়েই রসময় দত্ত তাঁর অজ্ঞতার ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। পরিকল্পনাটির একাংশ মাত্র পাঠ

করে তিনি মন্তব্য করলেন, "No use sending up so many subjects for consideration—they would not be attended to, not even read." পরিকল্পনাটির পাশে পাশে তিনি যেসব মন্তব্য লিখেছিলেন, তাতেও তাঁর পাঠ্যসূচী বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীকে অকারণে আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। একজায়গায় লিখেছেন, "considered by the Secretary unnecessary," আবার একজায়গায়, "altogether a wrong opinion." কোনও কোনও জায়গায় তাঁর নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে মিল আছে বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে মার্শাল যে মন্তব্য করেছিলেন, তা রসময় দত্তের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, উল্লেখযোগ্য। মার্শাল লিখছেন, " The Assistant Secretary consulted me sometime ago on a plan of study which he had proposed at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appealed to me to be highly gudicious. I would strongly recommend to the Council to give it a trial." স্বাভাবিক ভাবে রসময় দত্তের মন্তব্যগুলিকে অমর্যাদাকর ও অবমাননাকর মনে করে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করলেন। কলেজের তেরজন বিশিষ্ট শিক্ষক বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না-করার জন্য আবেদন করলেন। রসময় দত্ত সম্পর্কে এডুকেশন কাউন্সিলেরও খুব উচ্চ ধারণা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মোয়াট নিজেই লিখেছেন, "Baboo Rassomoy Dutt ... seldom or never had been present in the institution during the working hours, or been able to rectify the abuses likely in such circumstances to occur." কিন্তু তবুও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, সেক্রেটারী পদত্যাগ গ্রহণ করার সুপারিশ করার পর, সেটি গৃহীত হোল।

পদত্যাগ করার পর তাঁর কিঞ্চিৎ আর্থিক অসুবিধা হলেও তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্তের জন্য কখনও কোনও অনুশোচনা প্রকাশ করেন নি কিংবা তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ ও চিত্তের দৃঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি[১১]। অর্থকষ্টের মধ্যেও মোয়াটের এক বন্ধুকে সংস্কৃত শেখাবার পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করেন, কারণ বন্ধুর কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিলে বন্ধুত্বের অমর্যাদা করা হয়[১১]। এই অভিজ্ঞতা অবশ্য তাকে শিক্ষা দিয়েছিল যে আর্থিক স্বাধীনতা না থাকলে, সরকারী চাকুরির উপর সম্পূর্ণ নির্ভয়শীল হলে, আত্মমর্যাদা বজায় রেখে চাকুরি করা দুরূহ হয়ে উঠবে। সংস্কৃত কলেজে এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী থাকার সময়েই বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সমান অংশীদারিতে একটি প্রেস স্থাপন করেন বিদ্যাসাগর। এর সঙ্গে ছিল একটি 'ডিপজিটরী' বা অল্পভাড়ায় অন্যান্য প্রকাশকদের প্রকাশিত বইগুলি রাখার জন্য বেশ কিছু জায়গার ব্যবস্থা। বই ছাপাবার পর বই রাখার জায়গা পাওয়া যায় না বলে অনেক প্রকাশক বই ছাপতে রাজী হতেন না। সুতরাং এই ডিপজিটরীর সুবিধা নিতে প্রকাশকরা সানন্দে সম্মত হলেন। আর্থিক স্বাধীনতার জন্য নিজের চিন্তা ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে যে ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তার ফলে ধনী ব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু পুস্তক-প্রকাশনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে, তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। মার্শালের পরামর্শে শুদ্ধ-পাঠের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করে তিনি যে টাকা পেলেন, তাতে প্রেসের ঋণ মিটিয়ে দিতে সমর্থ হলেন। বই-প্রকাশের মান উন্নত করলেন। বানান-ভুল এবং অন্যান্য ভুল তাঁর প্রকাশিত বইয়ে থাকত না ; তিনি নিজে

এবিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন। এছাড়াও কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের[১৩] বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে তাঁর নিজের সমাজসংস্কার সম্পর্কে মতামত ও আদর্শপ্রচারে সহায়ক হয়েছিল এই প্রেস। বস্তুতপক্ষে, ১৮৪৭ সালে "বেতালপঞ্চবিংশতি" প্রকাশিত হওয়ার পরই বিদ্যাসাগরের প্রেস ও প্রকাশনার ব্যবসা স্থিতিশীল হওয়াতে তিনি অনেকটা আর্থিক স্বাধীনতা পেলেন। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে, যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের, "হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ" নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর মাসমাইনে হোল ৮০ টাকা। এই অর্থ উপেক্ষণীয় না হলেও, প্রয়োজনে এই অর্থ অগ্রাহ্য করতে হলেও, আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হোত না। ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে, জজ-পন্ডিতের চাকুরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে যান। অধ্যাপনা অপেক্ষা সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন সংস্কার করা এবং তার মধ্য দিয়ে নিজের শিক্ষাচিন্তাকে বাস্তব রূপ দেওয়াই ছিল বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য। সংস্কার করতে হলে কলেজের প্রশাসনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যের অধ্যাপকের সেই কর্তৃত্ব নেই, সুতরাং বিদ্যাসাগরের নিকট ৯০ টাকা মাসমাহিনার ঐ পদের কোনও আকর্ষণ ছিল না। মোয়াটের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ঐ পদ নিতে রাজী হলেন না। তবে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এডুকেশন কাউন্সিল যদি তাঁকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ দিতে রাজী থাকে, তবে তিনি তা নিতে সম্মত আছেন ; কারণ তা হলে তাঁর সংস্কার-পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার সুযোগ পাবেন। মোয়াট সেইরূপ মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই তিনি ১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে যোগ দেন। এর পরের আট বৎসর (৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫০থেকে ১লা নভেম্বর, ১৮৫৮) শুধু সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে নয়, আমাদের দেশের শিক্ষা ও সমাজচিন্তার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রূপে ভাস্বর হয়ে আছে।

৩

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের পুনর্নিযুক্তি যে রসময় দত্তের প্রতি অনাস্থা অনায়াসে তা অনুধাবন করে রসময় দত্ত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী-পদে ইস্তফা দিলেন। ১৮৫১ সালের ৫ই জানুয়ারি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারী এবং এই পদটির বিলুপ্তি ঘটার পর, ২২শে জানুয়ারি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রূপে কার্যভার নিলেন। বিদ্যাসাগরের উপদেশ ও মোয়াটের প্রস্তাব অনুমোদন করে এডুকেশন কাউন্সিল সেক্রেটারী ও এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারীর পদ বিলোপ করলেন ; পরিবর্তে প্রিন্সিপ্যালের পদ সৃষ্টি করা হোল।

শিক্ষাবিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত, জনশিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য ও প্রস্তাব যে কয়েকটি দলিলে বিধৃত আছে, তার মধ্যে নিচে উল্লিখিত দলিলগুলিই প্রধান। তাঁর মূল বক্তব্য এই কয়টি চিঠি ও রিপোর্টেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রথম দলিলটি হচ্ছে ১৮৫০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট পাঠানো একটি 'নোট' যেটি পরে 'Notes on Sanskrit College' রূপে বিখ্যাত হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী ইত্যাদি সংস্কার সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বিশদভাবে এই পরিকল্পনা করেছিলেন[১৪]। এটিই অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে 'Notes on

the Sanskrit College' নামে এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট পেশ করেছিলেন সদস্য এফ. জে. হ্যালিডে,[১৫] ১৮৫২ সালের ৩০শে জুন। কাউন্সিল বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করলে, বিদ্যাসাগর সেই অনুসারে কলেজ-পাঠ্যসূচী ইত্যাদি সংস্কারের কাজে হাত দেন। সেইমতো কিছুদিন কাজ চলার পর কাউন্সিল বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জে. আর. ব্যালেন্টাইনকে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতে বলেন। ব্যালেন্টাইন যে রিপোর্টটি দেন তার উপর বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান এডুকেশন কাউন্সিলের সম্পাদক মোয়াট। বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে ১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ও ৫ই অক্টোবর দুটি চিঠি লেখেন মোয়াটকে[১৬]। এই দু'টি চিঠিতেও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত পাওয়া যায়। এ দু'টি চিঠিও তাই গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দ্বিতীয়ত, জনশিক্ষা বা মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি যে Notes on Vernacular Education তৈরি করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য এফ. জে. হ্যালিডে মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর একটি দীর্ঘ মিনিট (minute) তৈরি করেন। হ্যালিডে এবিষয়ে মাঝেমাঝে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও করতেন। এই 'Notes on Vernacular Education-এ, বস্তুতপক্ষে, জনশিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর যে কর্মসূচী অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর সম্পূর্ণ ছকটি পাওয়া যায়। হ্যালিডের মিনিটের সঙ্গে এই Notes on Vernacular Education ভারতসরকারের কাছে পাঠানো হয়। এই 'Notes'-এর প্রস্তাবমতো প্রায় ২০টি মডেল স্থাপন করা হয়। তৃতীয়ত, বিদ্যাসাগরের আরও দুটি রিপোর্টে জনশিক্ষা বিষয়ে তাঁর মতামত পরিণতি লাভ করেছে। মডেল স্কুলগুলির সহকারী পরিদর্শক হিসাবে ১৮৫৫ সালের ৮ই অক্টোবর ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্সট্রাকশনকে যে রিপোর্ট[১৮] পাঠান সেটিতেও জনশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বাস্তবানুগ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। জনশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ মতামত প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, বাংলা সরকারের একজন জুনিয়র সেক্রেটারীকে লেখা চিঠিতে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্পর্কে মতামতের সম্পূর্ণ রূপটি উপরে উল্লিখিত Notes, রিপোর্ট ও চিঠিগুলিতেই পাওয়া যাবে (পরিশিষ্ট—গ দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যাসাগর বাল্যকাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দুই শিক্ষাধারা সম্পর্কে সচেতন এবং পরিণত বয়সে এই দুই বিপরীত ধারাকে মিলিয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা এবং তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের সাহায্যে শিক্ষাচিন্তার বৈপরীত্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে এমন একটি সমাধানসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন যার প্রাসঙ্গিকতা আজও নষ্ট হয় নি। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপন্থী ছিলেন না ; ভারতীয় পরম্পরা ও কৃষ্টিকে অবহেলা করার কথা চিন্তাও করতেন না। তাঁর মেধা ও চিন্তাশক্তি এত সবল ও সতেজ ছিল যে, দুই প্রায়-ভিন্নমুখী প্রবাহকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে দ্বন্দ্বদীর্ণ মানসিকতার বা চিত্তের দোদুল্যমানতার শিকার হতে হয়নি ; এক মুহূর্তের জন্যও দিক্‌ভ্রান্ত বা লক্ষ্যচ্যুত হননি। অনায়াসে অতি সহজভাবে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয় ও শুভকর বিষয়গুলি গ্রহণ করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের ভ্রান্তচিন্তা ও সংস্কারগুলি বর্জন করেছেন।

অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার-কাজে আর বিলম্ব করেন নি বিদ্যাসাগর। এডুকেশন কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে কলেজটিকে তিনি একটি আধুনিক

শিক্ষায়তনের রূপ দিতে শুরু করেন। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা তাঁর পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হোল না। মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে ক্লাস নেওয়ার পরিবর্তে তিনি চেয়ার ও বেঞ্চের ব্যবস্থা করেন। কলেজ ছিল অবৈতনিক, তাই ছাত্রদের মধ্যে ক্লাসে আসার বা দ্রুত পাস করার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এমনকি ভর্তি-ফি পর্যন্ত ছিল না। ফলে ছাত্রদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির ঘটনা ছিল অনেক। ১৮৫২ সালের আগস্ট মাস থেকে দু'টাকা ভর্তি-ফি নির্ধারিত করলেন, এবং অনুপস্থিতি বা অন্য কারণে নাম-কাটা গেলে পুনরায় ভর্তি-ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে। ভর্তি-ফি চালু করে বিদ্যাসাগর কাউন্সিলকে জানিয়েছিলেন, "This measure, it may be hoped, will pave the way for the introduction of the pay system." ১৮৫৪ সালের জুন মাসে বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্র প্রতি মাসিক এক টাকা হারে বেতন-প্রথা চালু করলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পক্ষে এটি বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করে নি। কিন্তু এইভাবে বেতন-প্রথা চালু হওয়াতে কলেজের ও শিক্ষার গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল।

নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে যেমন তিনি সজাগ ছিলেন, তেমনি ছিলেন ছাত্রদের শারীরিক শাস্তিবিধানের ব্যাপারেও। কোনও কারণেই তিনি শারীরিক শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কলেজের অনেক শিক্ষাই বিদ্যাসাগরের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং কয়েকজন তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তবুও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিকতার জোরে তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগর অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথিতে কলেজ বন্ধের সাবেকী প্রথা তুলে দিয়ে প্রতি রবিবার ছুটির দিন ধার্য করেন। ১৮৫১ সালের জুলাই মাস থেকে এই ব্যবস্থা চালু হোল। তা ছাড়া, ইংরেজী শিক্ষার স্কুল-কলেজের মতো সংস্কৃত কলেজেও গ্রীষ্মের ছুটির প্রবর্তন করলেন বিদ্যাসাগর। এইভাবে বহিরঙ্গের দিক থেকে সংস্কৃত কলেজকে টোল-চতুষ্পাঠীর সঙ্গে সমপর্যায়ের অবস্থান থেকে একটি আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে কলেজের দরজা ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশের নিকট খুলে দিতেও সক্ষম হলেন।

সংস্কৃতপাঠে কেবল ব্রাহ্মণদের অধিকার আছে—এই শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যের ফলে প্রথমদিকে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য জাতের ছাত্ররা সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারত না। সরকারের সংস্কারপন্থী কর্মচারীদের চোখে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের জাতিভেদ অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হোত। বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনায় এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে কেউ সাহস করেন নি। দু'একবার যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি, তা নয়। ১৮২৮-২৯ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অমৃতলাল মিত্র নামে একজন কায়স্থ ছাত্রকে সংস্কৃত কলেজে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মোয়াট অবহিত ছিলেন ; তাই তিনি ভেবেছিলেন যে অন্যান্য অধ্যাপকদের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করে সংস্কৃত কলেজকে সব জাতের হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারবেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু কলেজের অন্ততঃ তিনজন বিশিষ্ট অধ্যাপক (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র শিরোমণি ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ) কায়স্থদের ভর্তিতেও তীব্র আপত্তি জানালেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের আপত্তি উপেক্ষা করে এডুকেশন কাউন্সিলকে জানালেন, "I see no objection to the admission of other castes than Brahmians and Vaidyas.

.. .. But as a measure of expediency I would suggest that at present only the Kayasthas be admitted." ১৮৫৪ সালে কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন আবার প্রস্তাব দিলেন যে, জাতিভেদ না মেনে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে পড়ার সুযোগ থাকা উচিত। এবারে বিদ্যাসাগর কায়স্থ ছাড়া 'নবশাখ' শ্রেণীভুক্ত সমস্ত জাতির ছাত্রদের কলেজে পড়ার অধিকার স্বীকার করে নিলেন ; কিন্তু নবশাখের বাইরে আর কোনও জাতের বিশেষতঃ 'সুবর্ণবণিক' জাতের কোনও ছাত্রকে ভর্তি করতে অস্বীকার করলেন। সম্ভবত অধ্যাপক ও ছাত্রদের কিছু চাপ ছিল বিদ্যাসাগরের উপর। ১৮৫৫ সালের ২১শে নভেম্বর বিদ্যাসাগর ডিরেক্টর অফ্ পাব্লিক ইনস্ট্রাক্‌নকে[৩১] যে চিঠি লিখলেন তাতে স্পষ্ট করে জানালেন যে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ছাত্রদের কলেজে ভর্তি করা হলে কলেজের গোঁড়া পণ্ডিতদের এবং বাইরের সমাজের সম্ভ্রান্ত মানুষের সংস্কারে আঘাত লাগবে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই বাধা তুলে দিতে পারলে খুশী হতেন। সুবর্ণবণিক ছাত্রদের ভর্তি সম্পর্কে এই তীব্র আপত্তি যে অধ্যাপকমন্ডলীর মতামতের প্রতিফলন, এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই। সরকার তখনকার মত বিদ্যাসাগরের বক্তব্য মেনে নিলেও, ১৮৬০ সালের মার্চ মাস থেকে সংস্কৃত কলেজের দরজা সুবর্ণবণিকসহ সমস্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছাত্রের জন্য খুলে দিলেন। তখন অবশ্য কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ই. বি. কাওয়েল। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অধ্যাপকমন্ডলীর বিশেষ কোনও প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল বলে জানা যায় না এবং কলেজের সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কৌশলগতভাবে রক্ষণশীলতাকে প্রভাবিত করে এবং স্বমতে এনে সংস্কারের পথ সুগম করাই ছিল বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য।

৪

সংস্কৃত কলেজকে বাহিরের চেহারায় একটি আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপ দিলেন বিদ্যাসাগর। সেই আধুনিকতা কলেজের ছাত্রদের মনে ও কর্মে সঞ্চারণ করার প্রয়াসে তিনি পাঠ্যসূচীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটালেন। এই পরিবর্তনের মধ্যেই দেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে।

সহজে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে যে "উপক্রমণিকা" ও "ব্যাকরণ কৌমুদী" রচনা করেছিলেন, বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ'-এর পরিবর্তে সেই ব্যাকরণগুলিই ক্রমে ক্রমে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করলেন। 'মুগ্ধবোধ' বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতায়, "ব্যাকরণ হিসাবে অসম্পূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বাক্যবিস্তারে ভারাক্রান্ত"। 'নৈষধচরিত', তাঁর মতে, "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণ"। সুতরাং এই বইগুলি পাঠ্য হিসাবে পরিত্যাজ্য। 'সাহিত্যদর্পণ'। "অসংবদ্ধ ভাষায়, অনেক বিস্তারিত ভাবে যা প্রকাশ করেছে তার মূল কথা কাব্যপ্রকাশের মধ্যেই আছে।" সুতরাং, ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়কে অযথা ভারাক্রান্ত না করে 'সাহিত্যদর্পণ' বাদ দিয়েছেন। রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশ তত্ত্ব" কেবল পুরোহিতদের প্রয়োজনে লাগে। সংস্কৃত কলেজ পুরোহিতদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নয়,—সুতরাং এটিও পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিলেন বিদ্যাসাগর। "অনুমান চিন্তামণি" নামক গ্রন্থটিকে বেকনের ভাষা ধার করে বললেন, "বিদ্যার ঊর্ণজাল"। সুতরাং এই বই পড়ে চিন্তার ও চিত্তের বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়, তাই এটিও পরিত্যাজ্য।

বিদ্যাসাগরের মতে হিন্দুদর্শনতত্ত্বের অনেকটাই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। কিন্তু তবুও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতের হিন্দুদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। হিন্দুদর্শনের দুর্বলতা ও অসারতা ছাত্ররা তখনই বুঝতে পারবে যখন তাঁদের পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্পর্কেও সম্যক ধারণা গড়ে উঠবে। ইংরেজী ভাষায় কিছু জ্ঞান থাকলেই পাশ্চাত্ত্য দর্শন পাঠ সম্ভব। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য—এই দুই দর্শনে জ্ঞান থাকলে ছাত্ররা সহজেই ভারতীয় হিন্দুদর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা নিজেরাই বুঝতে পারবে, এবং ছাত্রদের নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠতে পারবে।

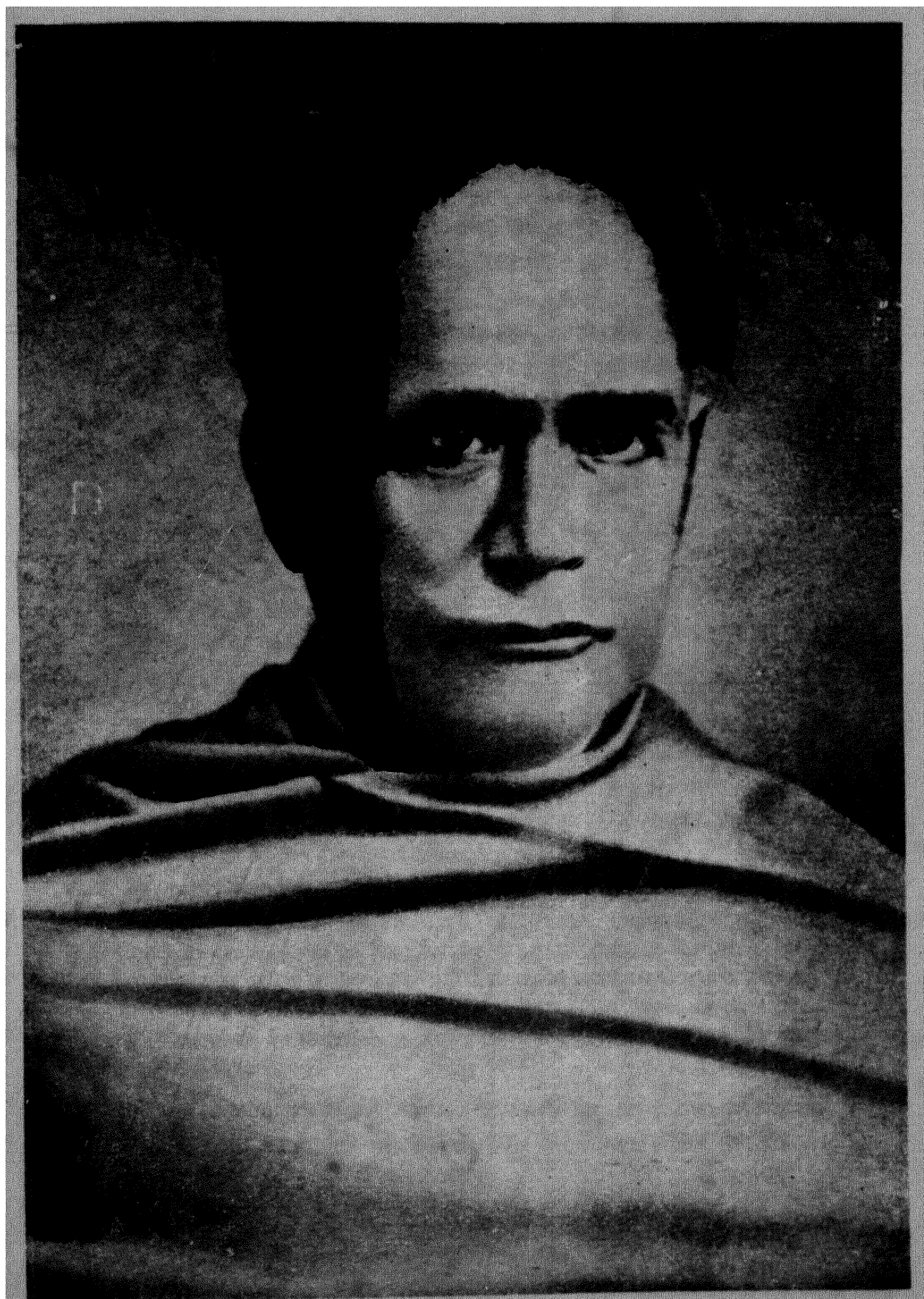
কলেজে ইংরেজী পাঠের[৩৩] উপর বিদ্যাসাগর জোর দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। তাঁর পরিকল্পনামতো ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণীতে পড়ার সময় ছাত্ররা তিনভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজীর জন্য ব্যয় করবে। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শন শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনভাগের দুইভাগ সময় ইংরেজীর জন্য এবং বাকী সময় অন্যবিষয়ে ব্যয় করবে। চারজন ইংরেজী শিক্ষক নিয়োগ করার প্রস্তাব দিয়ে ইংরেজী বিভাগটিকে শক্তিশালী করলেন বিদ্যাসাগর। গণিতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বিদ্যাসাগর ; কিন্তু লীলাবতী বা সংস্কৃতে গণিত-শিক্ষার উপর তাঁর আস্থা ছিল না। বিদ্যাসাগর ইংরেজীতে পাশ্চাত্ত্য গণিত-শিক্ষার প্রবর্তন করলেন সংস্কৃত কলেজে।

এই সংস্কারের ফলে স্পষ্টত সংস্কৃত কলেজ কেবল সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে উত্তীর্ণ হবে। এডুকেশন কাউন্সিল বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়াতে বিদ্যাসাগর সংস্কারগুলি দ্রুত কার্যকর করতে শুরু করলেন। এই সংস্কারে যে সরকারের বিশেষ অর্থব্যয় হবে না,—সেটিও বিদ্যাসাগর হিসেব করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন[৩৪]। ১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ৪ জন শিক্ষক নিয়ে ইংরেজী বিভাগ পুনর্গঠিত হোল। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইংরেজীর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ইংরেজী বিভাগের জন্য একটি বিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাসূচী গৃহীত হোল। এছাড়া ইংরেজীতে গণিত-শিক্ষা দেওয়ার জন্যও একজন শিক্ষক নিযুক্ত হোল। পাঠ্যসূচীর প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলিকে কার্যকরী করা হোল। এই পরিবর্তনের প্রায় তিন বৎসর পরে তৎকালীন ডিরেক্টার অফ্ পাব্লিক ইন্সট্রাক্শন, গর্ডন ইয়ং, বাংলা সরকারের সেক্রেটারীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী সংস্কারের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন আছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মোটেই প্রীতিপূর্ণ ছিল না। ইয়ং ১৮৫৬ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লিখছেন "The course of instruction of the Sanskrit College adopted, as it has of late been, to modern ideas and to purposes of practical utility, is being successfully carried on and administered by its able Principal Pundit Eshwar Chander Sarma and is producing results, the effect of which upon the education of the lowest classes cannot be overrated."[৩৫]

শুধু শিক্ষার জন্যেই ছাত্র-অভিভাবকরা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে, স্বাভাবিক ভাবেই, এই জাতীয় ভাববাদী ধারণাতে বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস ছিল না। মানসিক উন্নতির সঙ্গে শিক্ষা জীবনযাত্রার মানকেও উন্নত করবে, তবেই শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হবে। সংস্কৃত কলেজের

স্নাতকরা যেন, কলকাতা মাদ্রাসা বা হিন্দু কলেজের স্নাতকদের ন্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন, সেইজন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালের ১৩ই জানুয়ারি এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট একটি প্রস্তাব দেন। সরকার সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

এডুকেশন কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জে. আর. ব্যালেন্টাইন ১৮৫৩ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কার নতুন ও পাঠ্যসূচীর ফলাফল সম্পর্কে একটি রির্পোট দেন। ব্যালেন্টাইন বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী বা সংস্কারের উপর কোনও পান্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করেন নি। বরং তিনি কিছু কিছু সংস্কারের প্রশংসাও করেছেন। কয়েকটি বই, যেমন বার্কলের 'Inquiry', কিংবা মিলের লজিকের সংক্ষিপ্তসার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তার জন্য বিদ্যাসাগরের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের লক্ষ্যস্থল হয়েছেন। মোটকথা, কয়েকটি বই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ ছাড়া ব্যালেন্টাইনের, বস্তুতপক্ষে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যই ছিল না। বিদ্যাসাগরের নিকট ব্যালেন্টাইনের কোনও বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি ; বরং ব্যালেন্টাইনকে তাঁর কলেজ পরিদর্শন করে রির্পোট দিতে বলায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন [৩৫]। ব্যালেন্টাইন তাঁরই সমমর্যদার একটি সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, তাঁকে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সম্পর্কে অভিমত দিতে বলায় বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ প্রত্যাশিত ভাবেই আহত হয়েছিল। সেকথা বিদ্যাসাগর স্পষ্ট জানালেন এবং পাঠসূচী বিষয়ে তাঁর অবস্থান থেকে একটুও সরলেন না। ব্যালেন্টাইনের যে সামান্য দু'একটি প্রস্তাব ছিল, সেগুলি তিনি খন্ডন করলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট পড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিদ্যাসাগরের সংস্কারের উদ্দেশ্য তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি। সংস্কৃত ও ইংরেজী প্রায় সমান জোর দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্য যে কী ছিল, সে বিষয়ে তিনি অনবহিত ছিলেন। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন একসঙ্গে পড়লে ছাত্রদের মনে ধারণা জন্মাবে যে 'সত্য দুই প্রকারের' [৩৭] (Truth is double), ইত্যাকার প্রায় হাস্যকর বক্তব্য পেশ করেছেন তাঁর রিপোর্টে। বিদ্যাসাগরের মতে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় যথাক্রমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনপাঠের ফলে যদি কোনও ছাত্রের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, দুই দর্শনই সত্য, সুতরাং সত্য দুই প্রকারের, তাহলে বুঝতে হবে যে তার ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত হয়নি বলে বিষয়বস্তুও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়নি। ব্যালেন্টাইন আরও বললেন যে, ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ছাত্ররা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও দর্শনের মধ্যে যে মিলগুলি আছে, সেগুলিকে তুলে ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আদানপ্রদানের ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করবে ; ইউরোপীয় চিন্তা ও মননকে ভারতের নিকট সঠিকভাবে প্রকাশ করবে[৩৭]। বিদ্যাসাগরের এইরূপ ভাববাদী ও আবেগপ্রবণ কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। তাঁর যুক্তি তীক্ষ্ণ, বিশ্লেষণাত্মক ও একান্ত বাস্তববাদী ; তাঁর লক্ষ্য দেশ ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট করে বললেন যে প্রাচ্য দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া, ভারতীয় শাস্ত্রবিশ্বাসী পন্ডিতরা কী সহজে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ করবেন ? এইসব ভাববাদী সম্ভাবনার জগৎ থেকে বিদ্যাসাগর নেমে এলেন তাঁর দেশের তৎকালীন অবস্থায়। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁদের জ্ঞান যদি মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হবে ; এবং সংস্কৃত শিক্ষা



৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর ও জনশিক্ষা

১

১৮৩৫ সালের সরকারী ঘোষণায় সংস্কৃত-আরবীর পরিবর্তে ইংরেজীকে শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষারূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও মাতৃভাষার অবস্থান সম্পর্কে কোনও সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য ভারতবর্ষের মাতৃভাষাগুলি তখন এমন অবস্থায় ছিল যে, সেই ভাষাতে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা সম্ভব ছিল না। ১৮৩৫ সালে কমিটি অফ্ পাব্লিক ইন্সট্রাক্সনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে সংস্কৃত-আরবী-ফার্সী অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক বলে ইংরেজীকে গ্রহণ করা হয়েছে ; কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে মাতৃভাষার গুরুত্বকে ক্ষুণ্ণ করা বা অস্বীকার করা হয়নি।

এই সরকারী স্বীকৃতি এবং অ্যাডাম-রিপোর্টের মন্তব্য ও সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার কিছু চেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেঃ গভর্নর টোমাসন, ১৮৪৩ সালে রেভিনিউ বিভাগের অধীনে কতকগুলি 'মডেল স্কুল' স্থাপন করেন। ১৮৪৪ সালে গভর্নর-জেনারেল হেনরী হার্ডিঞ্জ বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ১০১টি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন।[১] দুইস্থানেই এগুলিরও তত্ত্বাবধায়ক ছিল সরকারের রেভেনিউ বিভাগ। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল দেখা গেল, টোমাসনের স্কুলগুলি কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও হার্ডিঞ্জের স্কুলগুলির মধ্যে অনেকগুলিই কয়েক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি মাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এডুকেশন কাউন্সিল, ১৮৫১-৫২ সালের রিপোর্টে হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে তিনটি দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছে ; উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং সর্বোপরি উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব। উপযুক্ত শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব দ্রুত পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু তত্ত্বাবধানের মান উন্নত করা সম্ভব ছিল। ভারতসরকার ১৮৫২ সালে হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলিকে রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধান থেকে শিক্ষাবিভাগের অধীনে নিয়ে এলেন। সরকারের মতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রাজস্ববিভাগ অনেক বেশী সুসংগঠিত এবং বিভাগের নিম্নবর্গের কর্মচারীদের দক্ষতা ও উদ্যোগের ফলে স্কুলগুলি ছিল সুপরিচালিত। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে (বাংলা ও বিহার) রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধান মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এডুকেশন কাউন্সিলের সম্পাদক মোয়াট রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে লিখেছেন, "The revenue system of Bengal does not afford particularly in its subordinate native agency, the great bond between the people and the ruling authority, that exists in the Tehashildari system in the North Western

province." চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারশ্রেণী ও তাদের কর্মচারীদের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক খুব ভাল না হওয়ারই কথা। তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবও যথেষ্ট ছিল। তুলনায় রায়তওয়ারি ভূমিব্যবস্থার তহসিলদারশ্রেণী অনেক শতাব্দী ধরে গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের বিশ্বাস-যোগ্যতার অভাব ছিল না। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যত দ্রুত গ্রামের স্বনির্ভর আর্থনীতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে নষ্ট করে দিতে পেরেছিল, রায়তওয়ারি ভূমি-ব্যবস্থায় তা সম্ভব হয়নি বলে গ্রামের অর্থনীতি মাতৃভাষার স্কুলগুলিকে কিছুদিন পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এডুকেশন কাউন্সিল শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাবকে বাংলা প্রেসিডেন্সীতে হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[২] কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলেও যোগ্য শিক্ষক ও উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য ছিল বলে মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে এই দুই বিষয়ে পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থা পূর্বাঞ্চলের থেকে ভাল তো ছিলই না, বরং অনেক খারাপ ছিল। তা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলে মাতৃভাষার স্কুলগুলি যদি সীমিত সাফল্য লাভ করে থাকে, তবে তার প্রধান কারণ ছিল ইংরাজী শিক্ষা তখনও ঐ অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তা ছাড়া, সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারী চাকুরির মোহও বিশেষ ছিল না। তাই মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ আগ্রহ তখনও অবশিষ্ট ছিল।

সুপরিচালনা বা ভাল শিক্ষক থাকলেই যে মাতৃভাষায় স্কুল চলতে পারে, এ ধারণা যথার্থ হলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের " তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" কিংবা হিন্দু কলেজের পাঠশালা বন্ধ হয়ে যেত না। ১৮৪১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে " তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের মত লেখক বাংলা পুস্তক নির্বাচন করতেন। উপযুক্ত শিক্ষকের, সুপরিচালনার অভাব ছিল না। তবুও কিন্তু পাঠশালাটি চলল না। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রভাবে কিছু ছাত্র পাঠশালাতে ভর্তি হলেও তারা, সকাল ছ'টা থেকে নয়'টা পর্যন্ত পাঠশালায় থেকে, দশটা থেকে অন্য ইংরেজী স্কুলে পড়াশুনা করতে যেত। আসল লক্ষ্যটা ছিল ইংরেজী শেখার দিকেই। ধীরে ধীরে অভিভাবকরা, ছাত্রদের উপর চাপ বাড়ছে, এই অজুহাতে পাঠশালায় যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে দেবেন্দ্রনাথ পাঠশালায় ইংরেজী পড়া শুরু করলেন। কিন্তু তাতেও হোল না। ইংরেজী স্কুলে ইংরেজী পড়া, আর পাঠশালায় একটি বিষয় হিসেবে ইংরেজী পড়ার মধ্যে তফাত ছিল অনেক। এই অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ, ইংরেজী স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে পাঠশালাটি স্থানান্তরিত করে দিলেন। কিন্তু সেখানেও অবস্থার উন্নতি হোল না। সর্বত্রই ভদ্রলোকশ্রেণী বাংলার থেকে ইংরেজী শিখতে আগ্রহী ছিল বেশী। শেষ পর্যন্ত পাঠশালাটি উঠে যায়।

হিন্দু কলেজের পাঠশালাটিরও একই অবস্থা হয়েছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ইংরেজীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ লক্ষ্য করে, মাতৃভাষার প্রতি কিছু আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৪০ সালে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য সফল হোল না। ছাত্ররা তখনই পাঠশালায় ভর্তি হোত যখন অন্য ইংরেজী শিক্ষার কলেজে জায়গা পেত না কিংবা জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনায় অপেক্ষা করতে হোত। এই পাঠশালাতেও পরিচালন-দক্ষতা, যোগ্য শিক্ষক, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদির কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু তবুও পাঠশালা চলে নি। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হওয়ার কারণগুলি,

বস্তুতপক্ষে, ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে। এডুকেশন কাউন্সিলের পক্ষে সে কারণ নির্দেশ করা সম্ভব ছিল না।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য ১৮১৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। তাদের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৮২২ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে ইংরেজী ভাষার পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩১ হাজার ইংরেজী পাঠ্য-বই বিক্রি করেছিল স্কুল বুক সোসাইটি।[৫] ইংরেজী পাঠ্যবইয়ের ক্রমবর্ধমান বিক্রি ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের প্রতি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে। কিন্তু বাংলা পাঠ্য-বইও যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যেত। সে সমস্ত পাঠ্যবইয়ের মান অবশ্য খুব উন্নত ছিল না। ভাষা ছিল দুরূহ, সংস্কৃতবহুল এবং বেশির ভাগ সময়েই ছাত্রদের উপযুক্ত নয়। বিদ্যাসাগর পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূরণ করলেন সহজ সাবলীল বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ছাত্র-পাঠ্যপুস্তক রচনা করে। ১৮৪৭ সালে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ করেন বাংলা শিক্ষার্থীদের কথা স্মরণ করে। ১৮৪৮ সালে মার্শম্যানের History of Bengal-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এটিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা শিক্ষার্থীদের কথা স্মরণ করেই লেখা। চেম্বার্সের ইংরেজী বইয়ের উপর ভিত্তি করে ১৮৪৯ সালে 'জীবনচরিত' এবং ১৮৫১ সালে 'বোধোদয়' প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় এই ছাত্রপাঠ্য বইগুলিতে এমন একটি সাবলীল রূপ লাভ করল, যে রূপ বস্তুতপক্ষে অজ্ঞাত ছিল। এত সহজবোধ্য, গতিশীল বাংলাভাষা কদাচিৎ লেখা হোত। এই বইগুলি শুধু বাংলা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনই মেটাল না, বাংলা গদ্যের অজস্র সম্ভাবনার সূচনা করল! শিক্ষার্থীদের বই বলে এগুলি সেই সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। ১৮৫১-৫২ সালে তিন খণ্ডে 'ঋজুপাঠ' প্রকাশিত হয়। তার পর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর অনুবাদ " শকুন্তলা" নামে প্রকাশ করেন ১৮৫৪ সালে। ১৮৫৫ সালে "বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ" প্রকাশিত হলে বাংলা বর্ণমালা ও ভাষাশিক্ষার একটি নতুন পথের সূচনা হয়। এই বই দুটি শিক্ষার্থীদের পক্ষে আজও সমান প্রয়োজনীয়। এরপর Æsop's Fables অবলম্বনে "কথামালা" (১৮৫৬), এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশীদের জীবনী অবলম্বনে "চরিতাবলী" (১৮৫৬) প্রকাশিত হয়, যখন বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজে ব্যস্ত। তার মধ্যেও উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যও পরিশ্রম করেছেন। "আখ্যানমঞ্জরী" (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালে। প্রায় দুই দশক ধরে নানা ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বাংলা শিক্ষার উপযোগী যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, সেগুলি বাংলা যথার্থরূপে আয়ত্ত করার পক্ষে অপরিহার্য। বাংলা শিক্ষার জন্য সরকারী-বেসরকারী সমস্ত স্কুলেই এই বইগুলির চাহিদা ছিল খুব বেশী।

হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির শিক্ষক নির্বাচনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মার্শাল। বিদ্যাসাগর স্কুলগুলির জন্য শিক্ষক নির্বাচন করতে গিয়েই সম্ভবত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সম্পর্কে সচেতন হন। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজকেই মাতৃভাষায় উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য প্রস্তুত করলেন। এই প্রস্তুতির লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে দেশে মাতৃভাষায় জনশিক্ষাবিস্তার।

এফ. জে. হ্যালিডে এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বা জনশিক্ষার উপর যে 'মিনিট' (minute) তৈরি করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল বিদ্যাসাগরের

"Notes on Vernacular Education". এটি বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তৈরি করে হ্যালিডের নিকট পাঠিয়েছিলেন। হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনার পর তাঁর 'মিনিট' তৈরি করেন। পরে ১৮৫৪ সালে ১লা মে হ্যালিডে বাংলার প্রথম লেঃ গভর্নর নিযুক্ত হলে তিনি বিদ্যাসাগরের Notesটি সহ নিজের 'মিনিট'টি ভারতসরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন ১৮৫৪ সালের ১৬ই নভেম্বর। হ্যালিডের 'মিনিট' ও বিদ্যাসাগরের Notes-এর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অনেক মিল অবশ্যই দেখা যায়; তবুও দুইটি দলিলের মধ্যে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির তফাত সহজে দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

বিদ্যাসাগরের কথায়, "Vernacular education on an extensive scale and at an efficient footing is highly desirable for it by this means alone that the condition of the mass of the people can be ameliorated"[৪] জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেই শিক্ষার সার্থকতা। প্রাথমিক শিক্ষাও জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে পারে এবং সেইজন্যই সাধারণ মানুষকে মাতৃভাষার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা দরকার। শিক্ষার ভাববাদী প্রয়োজনকে বিদ্যাসাগর নস্যাৎ করেছেন। ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা মানুষকে আদৌ আকর্ষণ করবে না। ঐ Notes-এ তিনি লিখেছেন, "With Natives general, the acquisition of knowledge for the sake of knowledge itself has not yet become a motive. It is, therefore, necessary that Lord Hardinge's resolution, which has so long been kept in abayance, should be strictly enforced."[৫] বিদ্যাসাগরের মতে, ভারতবাসীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা প্রয়োজনভিত্তিক। জ্ঞান যদি পার্থিব প্রয়োজনে কাজে না লাগে, তবে সেই জ্ঞানের জন্য আকাঙক্ষা কমে যাবে। তাই মাতৃভাষায় পড়াশুনা যদি জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হয় ; তবে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। সেইজন্য বিদ্যাসাগর হার্ডিঞ্জের একটি পুরাতন নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হার্ডিঞ্জের স্কুলগুলি থেকে পাস-করা ছাত্রদের রাজস্ববিভাগের নিম্নপদে চাকুরি দেওয়া হবে বলে একটি সরকারী নির্দেশনামা জারি হয়েছিল হার্ডিঞ্জস্কুল প্রতিষ্ঠার সময়। বাংলাস্কুল থেকে পাস-করা ছাত্রদের ক্ষেত্রে ঐ প্রতিশ্রুতিটি কার্যকর করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলা বা যে-কোনও ভারতীয় ভাষাই পিছু হঠতে বাধ্য হবে এই সত্যটি বিদ্যাসাগর তাঁর প্রখর বাস্তববোধের দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বাংলাস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এমন জনপদ বেছে নিয়েছিলেন, যেখানে ইংরেজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর সুপারিশ ছিল, "These [schools] should be established in towns and villages, not in the vicinity of English colleges and schools. In the neighbourhood of English colleges and schools, the vernacular education is not property appreciated."[৬] প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীই মাতৃভাষায় শিক্ষায় আগ্রহ দেখাবে; সুতরাং সেইরূপ জনপদই মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে আদর্শ স্থল। সমাজের উচ্চবিত্ত জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী। সুতরাং উচ্চবিত্ত-অধ্যুষিত শহরে বা গ্রামে বাংলা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নেই।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা অনুযায়ী মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং সরকার শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। বিদ্যাসাগর গ্রামের অর্থনীতিতে নাবালক

শ্রমজীবীর প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই অবৈতনিক শিক্ষা না হলে ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই কমের দিকে যাবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষা পেতে হলে অন্তত শিক্ষকদের মাসিক বেতন ২০ টাকা হওয়া উচিত বলে বিদ্যাসাগর মনে করতেন।

হ্যালিডের দীর্ঘ মিনিটের অনেকটাই বিদ্যাসাগরের Note-টির বিস্তারিত ব্যাখ্যামাত্র। প্রকৃতপক্ষে হ্যালিডের বিদ্যাসাগরের ন্যায় গভীর বাস্তববোধ ও প্রখর দূরদৃষ্টি ছিল না বলে বিদ্যাসাগর জনশিক্ষা সম্পর্কে যে বাধাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সে সম্পর্কে হ্যালিডে ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব। তা ছাড়া স্কুলগুলিকে অবৈতনিক করার প্রস্তাব কিংবা শিক্ষকদের সংখ্যা ও বেতনহার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য হ্যালিডে মেনে নেননি। তাঁর মতে প্রথম ছয়মাস স্কুলগুলি অবৈতনিক থাকতে পারে, কিন্তু তার পর থেকে স্বনির্ভর হতে হবে। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব ছিল, শিক্ষকদের বেতন হবে ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে এবং স্কুলে ৪টি ক্লাস থাকলে স্কুলে একজন হেড্‌পণ্ডিত থাকবেন ও হেডপণ্ডিতের বেতন হবে মাসিক ৫০ টাকা। শিক্ষকরা যেন স্কুলেই নিয়মিত বেতন পান সে ব্যবস্থা করলে শিক্ষকদের উৎসাহ ও সরকারের শিক্ষাপ্রসারে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। স্পষ্টত, বিদ্যাসাগর যে প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন, তা কেবল পড়তে এবং লিখতে শেখার থেকে কিছু বেশী। তিনি যে পাঠ্যসূচী তৈরী করে দিয়েছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার। এই পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস, ভুগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত ছাড়াও ছিল প্রাথমিক শরীরবিদ্যা এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের জীবনী। এই সূচী অনুসারে পাঠ সমাপ্ত করতে তিন থেকে চার বৎসর লাগার কথা। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুযায়ী স্কুলগুলিতে তিন থেকে পাঁচটি ক্লাস থাকবে। তত্ত্বাবধানের জন্য একজন হেড সুপারিন্টেডেন্টের অধীনে দু'জন সুপারিন্টেডেন্টের পদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। আর সমস্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্য নিজেই হেড সুপারিন্টেডেন্টের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ এত বেশী ছিল যে এটি অনুমোদিত হওয়ার আগে, হ্যালিডের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে, তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির সময় হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিদর্শন করে এলেন। ১৮৫৪ সালের ২১শে মে থেকে ১১ই জুনের মধ্যে তিনি অনেকগুলি গ্রামে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ১০/১২টি গ্রামের আধিবাসীরা স্কুলবাড়ী তৈরির ব্যয় বহন করতেও রাজী হন।[৭] এ ছাড়াও বর্ধমান এবং নদীয়া জেলাতেও স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। ইতিমধ্যে চার্লস উডের ডেসপ্যাচে (জুলাই, ১৮৫৪) কাউন্সিল অফ্ এডুকেসন তুলে দিয়ে ডিরেক্টরেট অফ্ পাব্‌লিক ইন্সট্রাক্‌শন-এর উপর স্কুলশিক্ষার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুসারে ডিরেক্টর অফ্ পাব্‌লিক ইন্সট্রাক্সনের অধীনে কয়েকটি ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হয়। বিদ্যাসাগরকে মডেল স্কুলগুলির পরিদর্শক নিযুক্ত করার জন্য হ্যালিডেকে ইউরোপীয় আমলাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত হ্যালিডে আমলাদের বিরুদ্ধমতকে অগ্রাহ্য করে বিদ্যাসাগরকে সহকারী পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যা মাইনে পেতেন তা ছাড়া ১৮৫৫ সালের ১লা মে থেকে সহকারী স্কুল পরিদর্শক হিসাবে, মাসে দু'শ টাকা করে মাইনে পাবেন।[৮] ১৮৫৬ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে তিনি স্পেশাল ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন।

নতুন বাংলা স্কুলগুলির নাম, টোমাসনের স্কুলের নাম অনুসারে, রাখা হয় "মডেল স্কুল"। বিদ্যাসাগর বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় মোট ২০টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন।[৯] স্কুলগুলি ৪/৫ মাসের মধ্যেই চালু করা হয় এবং প্রথমদিকে ছাত্রসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সন্দেহ নেই, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে এই স্কুলগুলি গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে এই ২০টি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৭৩৮ । শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল; কারণ মডেল স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষকরা বিদ্যাসাগরের প্রত্যাশামত ছিলেন না। তাই ডি. পি. আইয়ের অনুমতি নিয়ে ১৮৫৫ সালের জুলাই মাস থেকে সংস্কৃত কলেজের মধ্যে নর্মাল স্কুলের ক্লাস শুরু করেন। নর্মাল স্কুলের পাঠ্যসূচী বিদ্যাসাগর তৈরি করেছিলেন, এবং স্কুল-পরিচালনব্যবস্থা হাতেকলমে শেখার জন্য হিন্দু কলেজের পাঠশালাটিকে ব্যবহার করেছিলেন। নর্মাল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৭০ থেকে ৯০ -এর মধ্যেই থাকত, এই স্কুল থেকে পাস-করা ছাত্ররা মডেল স্কুল ছাড়াও অন্যান্য বাংলা স্কুল বা Anglo-Sanskrit স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারত। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসের একটি রিপোর্টে বিদ্যাসাগর ডি.পি.আই-কে জানিয়েছেন যে, নর্মাল স্কুল থেকে পাস-করা ৫৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৬ জনই মডেল স্কুল বা অন্য স্কুলে চাকুরি পেয়েছে।[১০]

মডেল স্কুলগুলি যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল কেবল বিদ্যাসাগরের প্রভাবে ও চেষ্টায়। তিনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য যে ৪ জন সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন যা অন্য ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১১] স্কুলগুলির অগ্রগতিও কিছু দিন পর্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ প্রতিষ্ঠার তিন/চার বৎসর পরে, ছাত্ররা পাস করে যাওয়ার পরই, বৃহত্তর জীবনে তাদের অর্জিত শিক্ষার মূল্যায়ন হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষার মূল্য যদি জীবিকা অর্জনের জন্য সহায়ক না হয়, তবে মাতৃভাষায় শিক্ষার আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবেই কমে যাবে। এই কথা স্মরণ করে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ডি.পি.আই-কে পাঠানো রিপোর্টে লিখলেন,[১২] "The success of the Vernacular Education will depend materially upon the encouragement given in the way of providing the alumni of those institutions with offices under the Government. People are eager to give their children an English education because they believe that such education would ensure for them public employment and that education in another language would be of no avail". বিদ্যাসাগরের মতে মডেল স্কুল থেকে পাস-করা ছাত্রদের রেভিনিউ ও বিচারবিভাগের নিম্নবর্গের চাকুরিতে নিয়োগ করলে সরকার একদল বিশ্বস্ত কর্মচারী পাবে; সেই সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষার যে মূল্য আছে, সে কথাও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে।

সরকার এ বিষয়ে নীরব ছিলেন। ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষার কোনও আকর্ষণ বাড়ল না, তাছাড়া বিদ্যাসাগরের আশানুযায়ী মডেল স্কুলগুলি অবৈতনিক করা হয়নি। প্রথম ছয় মাসের পর ছাত্রদের বেতন ধার্য করা হয়। শিক্ষকের সংখ্যাও, বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবমত, দুই-তিন বা

ততোধিক ছিল না। ক্লাসের সংখ্যাও ছিল কম। তার উপর ছাত্রদের বই খাতা পেন্সিল ইত্যাদি কিনতে হোত। বিদ্যাসাগর সুপারিশ করেছিলেন, শিক্ষকদের বেতন ২০ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষকদের বেতন ছিল আরও কম। এই অবস্থায় মডেল স্কুলগুলি মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারল না।

বিদ্যাসাগর মডেল স্কুলগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন উন্নতশ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়-রূপে। সেখানে কেবলমাত্র পড়া ও লেখা শেখানো এবং কিছু সাধারণ অঙ্ক কষার জ্ঞান দেওয়া হবে না— তার থেকেও বেশী কিছু শিক্ষা দেওয়া হবে। বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য, বস্তুতপক্ষে, সাক্ষরতার থেকে কিছু বেশী ছিল। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য ছিল সাক্ষরতার থেকে বেশী কিছু নয়। সেইজন্যই মডেল স্কুলগুলির জন্য অন্যান্য মাতৃভাষার স্কুলের থেকে একটু বেশী খরচ হোত। মডেল স্কুলের ছাত্র প্রতি যখন সরকারের খরচ হোত ১৩ আনা ৮ পাই, তখন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলা স্কুলের ছাত্রপ্রতি খরচ ছিল ৪ আনা ৪ পাইয়ের মত।[১৩] একজন স্কুল-পরিদর্শকের মতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মডেল স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য পাওয়া বাংলা স্কুলের থেকে এত ভাল নয় যে সেগুলিতে ছাত্রপ্রতি প্রায় ২ $\frac{১}{২}$ গুণ বেশী খরচ করা হবে।[১৪] এই বেশী খরচের কারণ মডেল স্কুলগুলি অন্যান্য মাতৃভাষার স্কুলগুলির মতো নিম্নমানের ছিল না। সরকারী চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার পর, বাংলা সরকার জনশিক্ষার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত চাইলে, বিদ্যাসাগর একই কথা বলেছিলেন, "in my humble opinion, it seems almost impracticable, in the present circumstances in the country to introduce any system of education with such limited expenditure as is contemplated by the Government viz. Rs. 5 to 7 a month for each school.[১৫] মানে পাঁচ থেকে সাত টাকা খরচ করে সরকার যে জনশিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সাক্ষরতা প্রসারের থেকে কিছু বেশী হতে পারে না। তা কোন মতেই প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না। এইরূপ সীমিত সরকারী লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের মডেল স্কুলগুলি সরকারী আর্থিক অনুদান বেশী দিন ভোগ করতে পারে নি।

২

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল বীরসিংহ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৫৩ সালে সমস্ত ব্যয়বহনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি বীরসিংহে একটি Anglo-Sanskrit স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলে সংস্কৃত, ইংরেজী এবং বাংলা পড়ানো হোত। বাংলার জন্য স্কুলের সঙ্গেই ছিল Vernacular স্কুল। এই স্কুল ছাড়াও ছিল একটি নৈশ বিদ্যালয়। স্থানীয় মানুষের কাছে এটি 'রাখাল স্কুল' নামে পরিচিত ছিল, এই কারণে যে, রাখালরাই ছাত্রদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রায় একই সঙ্গে। স্কুলের অন্তত তিনশত ছাত্রকে বইখাতা শ্লেট-পেন্সিল ইত্যাদি পড়াশুনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিতে হোত। কাউকে কাউকে পরনের কাপড়জামা দেওয়ারও প্রয়োজন হোত। তাছাড়া, অন্তত ৬০ জন ছাত্র বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া করে স্কুলে পড়াশুনা করত। বিদ্যাসাগরের বীরসিংহ স্কুলে ও বালিকা

বিদ্যালয়ের জন্য Grants-in-aid-এর করুণাধারা পেয়েছিলেন, তার ফলে স্কুলের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয় বিশেষ কমেনি। শম্ভুচন্দ্রের একটি হিসেব অনুসারে, বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ স্কুলের জন্য গড়ে মাসিক ৩০০ টাকা দিতে হোত। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০ টাকা, রাখাল স্কুলের জন্য মাসিক ১৫ টাকা এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য মাসিক ১০০ টাকা খরচ হোত। ১৮৬৪-৬৫ সালে এইচ. এল. হ্যারিসন্ বীরসিংহ স্কুল পরিদর্শন করে লিখেছিলেন যে, স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। Grants in aid-এর কৃপণ করুণা ছাড়া বাকী সমস্ত খরচ বিদ্যাসাগরকে যোগাতে হয়। প্রায় ৬০ জন ছাত্র বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে খেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করত। হ্যারিসন যে ছাত্রসংখ্যা উল্লেখ করেছেন, তা লক্ষণীয়। বীরসিংহ Anglo-Sanskrit স্কুলের ছাত্রসংখ্যা *ছিল ১১৭, Vernacular department -এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭২। ইংরেজী বিভাগে বেশী ছাত্র* স্বাভাবিক; কিন্তু বাংলা বিভাগে ৭২ জন ছাত্রও কম নয়। স্কুলে মোট ছাত্র ১৮৯ জন। নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৪৭; ছাত্ররা ছিল দিনমজুর অথবা রাখাল বালক। বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২৫ জন। এই বিদ্যালয় সম্পর্কে হ্যারিসনের মন্তব্য, "The best aided girls school in my division is at Beersingh, the home of Baboo Eshwar chandra Vidyasagar, whose daughter is the most forward girl, I have met within any of the aided schools." [১৬] ১৮৭০-৭১ সালে আর. এল. মার্টিন নামে আর একজন স্কুল-পরিদর্শকও লিখেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর স্কুলটির খরচপত্র সব বহন করেন। স্কুলটি সুপরিচালিত। অনেক ছাত্র এই স্কুলে উত্তম এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করে থাকে।[১৭] বিদ্যাসাগরকে কি পরিমাণ অর্থ সংস্থান করতে হোত তার মোটামুটি হিসাব শম্ভুচন্দ্র দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর এই খরচ বহনের দায়িত্ব না নিলে শুধু grants in aid-এর দাক্ষিণ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি চালানো সম্ভব ছিল না। ১৮৭৫ সালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগর যখন দক্ষিণবঙ্গের ৪টি জেলার মডেল স্কুলগুলির স্পেশাল ইন্সপেক্টর, তখন দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলার সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত Anglo-Vernaunlar এবং Vernacular school গুলির পরিদর্শক ছিলেন হজসন প্রাট (Hodgson Pratt) নামে এক ব্যক্তি, যাঁকে রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন "বঙ্গদেশহিতৈষী ও পরম বিদ্যোৎসাহী।"[১৮] দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলায় মোট ৮৭টি সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলা স্কুল এবং ৩৬টি সাহায্যপ্রাপ্ত Anglo-Vernacular স্কুলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ডি. পি. আই.-কে পাঠানো একটি রিপোর্টে[১৯] মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রসারের বর্তমান অবস্থাটি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। Grants-in-aid-এর দাক্ষিণ্য যে শিক্ষায় স্থানীয় উদ্যোগকে বিশেষ উৎসাহিত করতে পারেনি তার প্রমাণ আছে প্রাটের রিপোর্টে। তিনি এবং তাঁর অফিসাররা ৬০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ৫টি জেলার প্রায় সবকটি শহর ও বড় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপন আপন এলাকায় স্কুলস্থাপনের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু ৯৩০টি গ্রাম ও শহরের মধ্যে মাত্র ২৪টি থেকে কিছু সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। বাকী জায়গায় grants-in-aid নেওয়ার মতো না ছিল আর্থিক সঙ্গতি, না ছিল শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ।

কিন্তু শিক্ষার প্রতি এই প্রায়-সার্বিক অনীহা কেন? প্রাট এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন গ্রামের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে। তাঁর ভাষায়, " The immense majority of the

population regard them (measures to improve education) with supreme indifference, because the majority viz. the ryots are too poor to pay the gooroomahasaya his quarter of a seer of rice per month or to deprive themselves of the labour of their children in tending cattle etc., in tillage or rope making, while in their present condition they are quite unable to see any possible benefit from teaching them to read and write.[২০]

রায়ত বা দিনমজুর ও ছোট চাষীদের উপরের স্তরে ছিল ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ী। তাদের সামান্য পড়া ও লেখার জ্ঞান এবং যোগ-বিয়োগের অঙ্ক জানলেই চলত, তার বেশী শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। উপরের স্তরে ছিল ছোট-বড় জমিদার, মহাজন, শহরের উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি। তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজী শেখার, কারণ ইংরেজী শিখলে সম্ভব হবে জীবনে উন্নতি করা, প্রাটের ভাষায় "in obtaining, what is the high pinacle of Bengali ambition, employment under the Government."[২১] প্রাটের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী-বিভাজন ছিল একান্ত বাস্তব। সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র কৃষিজীবী শ্রেণী ছিল প্রধানত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। এঁদের নিকট অবৈতনিক শিক্ষাও আকর্ষণীয় ছিল না, কারণ শিক্ষার জন্য একটি দিন নষ্ট হলে পরিবারের একদিনের মজুরি নষ্ট হয়।

বিদ্যাসাগর তাঁর ১৮৫৬-৫৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ছাত্রদের প্রায় অনুরূপ শ্রেণীবিভাজন করে লিখেছেন[২২] যে মডেল স্কুলে নিম্নতম শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি থেকে আগত ছাত্রসংখ্যা (বিদ্যাসাগরের ভাষায় 'children from the working classes from the minority in the model schools') ছিল কম। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক না করলে, তাদের আকর্ষণ করা যাবে না। ১৮৫৯ সালে সরকারকে লেখা আর একটি চিঠিতেও[২৩] ঐ কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন, যে শ্রমজীবী শ্রেণীর (labouring classes) পক্ষে শিক্ষার খরচ, তা সে যত কমই হোক্ না কেন, বহন করা অসম্ভব। এদের বালকরা কিছু কাজ করার উপযুক্ত হলেই, এমনকি বিনা বেতনে শিক্ষার জন্যও স্কুলে আসবে না। তাছাড়া তাদের কী লাভ হবে সামান্য পড়া, লেখা এবং দু-একটা অঙ্ক শিখে? এতে তো তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তবুও সরকার যদি তাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাই দিতে চান, যা সাক্ষরতার নামান্তর, তবে তার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে। কিন্তু সে ব্যয়ভার বহনে সরকার ছিল নারাজ।

কারণ সরকার জনশিক্ষার পরিবর্তে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষায় উৎসাহী ছিল বেশী। ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রভাবশালী প্রতিনিধিরাও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ কমাতে দিতেন না। ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সীতে প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত হয়েই রহিল। বাংলার তুলনায় বোম্বাই কিংবা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশী খরচ করা হোত।[২৪] ১৮৭০ সালের জুন মাসে কলকাতা টাউন হলে শিক্ষাসংক্রান্ত এক সভায় কলকাতার বিশিষ্ট বাঙ্গালীরা, যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, মহেন্দ্রলাল সরকার, ইংরেজী শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানান।[২৫] কিন্তু ইংরেজী শিক্ষাও যে খুব বিস্তার লাভ করেছিল তা নয়। চাকুরিসংস্থানের সুবিধা ছিল ইংরেজী শিক্ষায়, কিন্তু ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি শিল্পায়ন, দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ইত্যাদিকে

খর্ব করে রেখেছিল, তাই চাকুরি সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। ফলে ইংরেজী শিক্ষাও মুষ্টিমেয় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল। অপরদিকে সরকারের আশঙ্কা হোল যে, গ্রামের মানুষ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ্রামে চাষের কাজ, ছোট কুটীরশিল্প ও বৃত্তিজীবীর কাজ বন্ধ করে চাকুরির প্রত্যাশা করলে সরকারের পক্ষে যেমন বিপদ হবে, তেমনি গ্রামের কৃষি-উৎপাদনেও তার প্রভাব পড়বে।

শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হোল না। সরকারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল অবৈতনিক এবং মাতৃভাষায় সুসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা, যা অন্তত কিছু নিম্নবর্গের চাকুরিতে নিয়োগের যোগ্য করে জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনবে। অপরদিকে সরকার চেয়েছিল রাজকোষ থেকে স্বল্পতম ব্যয়ে সবেতন শিক্ষা, যার মান হবে সাক্ষরতার থেকে সামান্য বেশী। আর্থ-সামাজিক অবস্থাটিও বিদ্যাসাগরের লক্ষ্যপূরণের অনুকূল ছিল না। এই প্রতিকূলতার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং কর্মোদ্যম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা ও অসংগতিকে চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে জনশিক্ষাপ্রসারের পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

৩

সে সময় স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল 'ভদ্রলোক' সমাজের প্রতিরোধ বেশ শক্তিশালী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্ত্রীশিক্ষার সুফল ও কুফল সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে শুরু হয়। স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশিক্ষা না দিয়ে তাদের বুদ্ধিহীন বলা যে যুক্তিসঙ্গত নয়, এই কথা বলে রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু প্রথম বালিকা বিদ্যালয় খুলে স্ত্রীশিক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন কলকাতার ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি।[২৬] ১৮১৯ সালে ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারীরা কলকাতায় মেয়েদের জন্য স্কুল খোলার উদ্দেশ্যে এই সোসাইটির পত্তন করেন। ঐ বছরই কলকাতায় "জুভেনাইল স্কুল" নামে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; কিন্তু স্কুলের জন্য দেশীয় শিক্ষিকা পাওয়া মুশকিল হোল। এই সোসাইটি মোট কুড়িটি স্কুল স্থাপন করেছিল ১৮২৯ সালের মধ্যে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করায় ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে দিতে থাকেন। এছাড়া চার্চ মিশনারী সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় লেডিস্ সোসাইটি [২৭] ও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠায় বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয়তা হারায় এবং সরকারও সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হয়।[২৮] জুভেনাইল সোসাইটি ও লেডিস সোসাইটি পরিচালিত স্কুলগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে প্রথম কার্যকরী উদ্যোগ নেন জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১)। ১৮৪৮ সালে তিনি গভর্নর-জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য হয়ে এদেশে আসেন; পরে তিনি কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি হয়ে ছিলেন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে বেথুন ১১টি বালিকা নিয়ে "Calcutta Female School" বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উদ্বোধনীভাষণে বেথুন শিক্ষাসূচী সম্পর্কে বলেন, "এই বিদ্যালয়ে বালিকাদের প্রথমে ভালো করে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হবে; তারপর কিছু কিছু ইংরেজীও শেখানো হবে। এছাড়া সেলাই, হাতের কাজ, আঁকা ইত্যাদি মেয়েদের যেসব বিশেষ

শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেগুলিও শেখানো হবে।" স্কুল-প্রতিষ্ঠার দিন বেথুন যেমন খ্রীষ্টান মিশনারীদের আমন্ত্রণ করেন নি, তেমনি ভারতীয় সমাজে রক্ষণশীল বলে পরিচিত রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দেব, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ইত্যাদিকেও তিনি অনুষ্ঠানের বাইরে রেখেছিলেন। বেথুন তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে চেয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে ডালহৌসিকে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছেন,[২৯] "স্থানীয় হিন্দুসমাজের নেতাদের কাউকেই আমি আমন্ত্রণ জানাই নি। তাঁরা প্রচণ্ডভাবে আমার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।"

বেথুনের কাজে সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছেন দু'জন ডিরোজিয়ান — রামগোপাল ঘোষ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত — মদনমোহন তর্কালঙ্কার। রামগোপাল ছিলেন বেথুন-শুভানুধ্যায়ী এবং পরামর্শদাতাদের একজন। দক্ষিণারঞ্জন প্রায় ৫ $\frac{১}{২}$ বিঘার মত জমি দান করেন। মধ্য কলিকাতায় ঐ জমির বিনিময়ে হেদুয়ার নিকট সরকারের একখন্ড জমি বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই মেয়েকে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে। এডুকেশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে বেথুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছিল। অন্যান্য সিভিলিয়ানদের ন্যায় বেথুনের ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্পর্কে কোনও উন্নাসিক মনোভাব ছিল না। তা ছাড়া, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বেথুনের আন্তরিকতা বিদ্যাসাগরকে মুগ্ধ করেছিল। বেথুনও বিদ্যাসাগরের জ্ঞান-গরিমায় এবং সততায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই বেথুনের অনুরোধে তিনি ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাস থেকে বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে সম্মত হলেন। স্কুলের ছাত্রীদের জন্য একটি ঢাকা ঘোড়ারগাড়ীতে বিদ্যাসাগরের নির্দেশে লেখা হল, "কন্যাপবেৎ পালনীয়াঃ শিক্ষানীয়াতিযত্নতঃ।" স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে এই শাস্ত্রবচন শাস্ত্রের ধ্বজাধারী রক্ষণশীলদের লক্ষ্য করেই উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

বেথুন এরপর স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে সরকারকে অধিকতর উদ্যোগী হওয়ার জন্যে আবেদন জানালেন। ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চের চিঠিতে তিনি ডালহৌসিকে লিখলেন যে, স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে সরকারের উদাসীন থাকা উচিত হবে না। ভারতসরকারের কাছ থেকে নির্দেশ পেলে এডুকেশন কাউন্সিল স্ত্রীশিক্ষা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিতে পারে এবং বিভিন্ন স্থানে উৎসাহী ব্যক্তিদের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারে।[৩০] ডালহৌসি বেথুনের সঙ্গে একমত হয়ে বাংলা সরকারকে নির্দেশ দিলেন যে, 'এখন থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তনও তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন এবং এদেশীয় লোকের চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেই বিদ্যালয়কে সবরকমের যথাসাধ্য সাহায্য করতে কুণ্ঠিত না হন।' বেথুন যখন এই চিঠি লিখে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ডালহৌসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন এফ. জে. হ্যালিডে ছিলেন ভারতসরকারের একজন সেক্রেটারী। ডালহৌসীর নির্দেশে তিনিই বাংলা সরকারকে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে উদ্যোগী হওয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। পরে হ্যালিডে যখন বাংলা প্রেসিডেন্সির লেঃ গভর্নর হলেন, তখন ভারতসরকারের এই নির্দেশ স্মরণ করেই তিনি বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের চেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

চার্লস উডের ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার জন্য সরকারী গ্রান্ট্‌স-ইন-এইড্ (Grants-in-Aid) দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ১৮৫৫-৫৭ সালে বালকদের জন্য মডেল স্কুলের বিদ্যাসাগর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহী হয়ে, বালিকাদের জন্য মডেল স্কুল স্থাপনেও

আগ্রহী হলেন। এই সময়েই বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। মডেল স্কুল ধরনের এই বালিকা বিদ্যালয়টির প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষককে। আট থেকে এগার বৎসরের আঠাশটি মেয়ে দিয়ে এই বিদ্যালয় শুরু হয়। বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা ছিল এই বিদ্যালয় চলবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি জনপ্রিয় হয়েছে দেখে তিনি সরকারের কাছে অনুদানের জন্য সুপারিশ করেন। বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক খরচ ছিল ৪৭ টাকা। সরকার কোন প্রশ্ন না তুলে মাসিক ৩২ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন। সরকারী অনুদানের (Grants-in-Aid) এই বদান্যতায় বিদ্যাসাগর উৎসাহিত হলেন। কিন্তু তবুও তিনি লেঃ গভর্নর হ্যালিডের সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করে নিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল যে গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়ের বাড়ী তৈরি করে দেবে, এবং সরকার পরিচালনা-ব্যয় বহন করবে। লেঃ গভর্নর এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন।[৩২] এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করে বিদ্যাসাগর তাঁর অধীনস্থ হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাতে ১৮৫৭ সালের নভেম্বর এবং ১৮৫৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ৪০টি বালিকা বিদ্যালয়[৩৩] স্থাপন করলেন। ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩৪৮।

কিন্তু সরকার শেষপর্যন্ত এই বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য কোনও ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করতে অসম্মত হওয়ায় এগুলি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হোল। বিদ্যাসাগর অবশ্য বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে না দিয়ে শিক্ষকদের মাহিনা ইত্যাদি ব্যয়ভার নিজে বহন করে চললেন। ইতিমধ্যে গর্ডন ইয়ং এবং হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে এই ব্যয় অনুমোদন করার জন্য ভারতসরকারের নিকট সুপারিশ করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বিদ্যাসাগরের কাজেরও সমর্থন করলেন। গর্ডন ইয়ং ছিলেন ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্সট্রাক্সন; এবং তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনেক বিষয়েই মতের মিল হোত না। কিন্তু তিনিও এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যমকে অনুমোদন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও সরকার বিদ্যালয়গুলির জন্য ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করলেন না। অজুহাত দেখানো হোল যে, বিদ্যাসাগর সরকারী সাহায্য (Grants-in-Aid)পাওয়ার সমস্ত শর্ত মেনে চলেন নি। কিন্তু সরকারী সাহায্য না পেলে বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাবে। সেটা হবে গর্ডন ইয়ং-এর ভাষায়, "a heavy blow and great discouragement to the cause of femal education, from the effect of which I fear nothing, that is likely to be now done, will enable it speedily to recover."[৩৪] ইয়ং-এর এই-বক্তব্যের উপর হ্যালিডের প্রভাব ছিল। হ্যালিডে তাঁর ১৯ নভেম্বর (১৮৫৮) তারিখের মিনিটে ইয়ংয়ের কথাকেই ব্যাখ্যা করলেন অনেকখানি আবেগের সঙ্গে। তাঁর বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "The instance given by Mr. Young of the 1370 girls recently sent to school the simple will and pleasure of the rural population of about forty villages in Burdwan and Hooghly, strong as it is and unanswerable as to the fact averred, is but one of several cases that could be produced to prove the change of feeling which has taken place and is diffusing itself among the people. No regret is too great for the necessity underwhich the Government of India conceived itself to lie of discouraging and in fact abolishing these forty schools on account of financial considerations. For the impulse had begun to seize the people, and having been communicated by one of the venerated

Brahmins, would assuredly have spread with rapidity if it would have been thought possible to take advantage of the golden opportunity, now, I fear lost for many a coming day".[৩৫]

হ্যালিডের মন্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতপক্ষে বালকদের জন্য মাতৃভাষার মডেল স্কুলগুলির থেকে বালিকাদের জন্য মডেল স্কুলগুলি বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। ভদ্রলোকশ্রেণীর বালকরা ইংরেজী শিক্ষায় আগ্রহী ছিল বলে মাতৃভাষার স্কুলের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু ঐ শ্রেণীর বাড়ীর বালিকাদেরও কিঞ্চিৎ শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিল বলেই গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়গুলি তাঁদের নিকট আকর্ষণীয় ছিল। হেনরী উড্রো নামে পূর্ব-বাংলার একজন ইন্সপেক্টর অফ্ স্কুল্স, গর্ডন ইয়ংকে লেখা একটি চিঠিতে (১৮ সেপ্টেম্বর,১৮৫৮) উল্লেখ করেছেন যে, বিদ্যাসাগরের ৪০টি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ১৩০০ উচ্চবর্ণের (good caste) বালিকারা শিক্ষা পেত।[৩৬] এই শ্রেণীর বালিকাদের অর্থকরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল না, তাই কিছু বাংলা শিক্ষাই যথেষ্ট ছিল।

শেষ পর্যন্ত ভারতসরকার বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য ৩৪৩৯ -৩ -৩ (তিনহাজার চারশত উনচল্লিশ টাকা, তিন আনা, তিন পাই) মঞ্জুর করলেন বটে, কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী অনুদানের (Grants-in-Aid) শর্তাবলী শিথিল করতে রাজী হলেন না। সরকারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল ১৮৫৮ সালের ২২ ডিসেম্বর; তার আগে, ৫ই নভেম্বর বিদ্যাসাগর চাকুরি থেকে পদত্যাগ করেছেন।

এই বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি "নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার" নামে একটি তহবিল স্থাপন করে ছিলেন। অনেক শিক্ষানুরাগী এবং বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ কিছু সিভিলিয়ান এই তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিতেন। এই তহবিলের টাকা ছাড়াও সরকারী অনুদানের সীমিত দাক্ষিণ্যও মাঝে মাঝে মিলত। বিদ্যাসাগর প্রায়ই তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের সাহায্যে বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য অনুদান আদায় করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও গ্রামের ভদ্রলোকশ্রেণীর উৎসাহের ফলে বালকদের মডেল স্কুলগুলির থেকে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৬২ সালের ১লা মে স্যার বার্টল ফ্রিয়ারকে লেখা একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন, "যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। নিকটবর্তী জেলাগুলির মানুষও স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করা আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নতুন বিদ্যালয়ও খোলা হইতেছে"। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কয়েকটি বেশ কিছুদিন বর্তমান ছিল ঠিকই কিন্তু এ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া দুষ্কর।

সরকারী চাকুরি থেকে পদত্যাগ করার পর তিনি বেথুনের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির পরিচর্যায় মনঃসংযোগ করলেন। বেথুনের মৃত্যুর পর ১৮৬২-৬৩ সালে, বেথুনের নামেই বিদ্যালয়টির নাম রাখা হয় বেথুন স্কুল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়েই, ১৮৫৬ সালে আগস্ট মাসে তিনি বেথুন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। বেথুন স্কুলের উদাহরণ তাঁকে গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে উৎসাহিত করেছিল তাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বেথুন স্কুলের যে আর্থিক সংস্থান ছিল, গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা

চিন্তাও করা যায় না। প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো মাইনে নেওয়া হোত না।[৩৮] বইপত্র ইত্যাদির জন্য বেথুন সাহেব মাসে আটশত টাকা করে খরচ করতেন। এইরূপ আর্থিক সচ্ছলতা মফঃস্বলের বিদ্যালয়গুলির পক্ষে কল্পনার অতীত। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর যখন বেথুন স্কুলের সম্পাদক হলেন, তখন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন সেসিল বিডন। নানা ব্যস্ততার মধ্যে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের জন্য সময় দিতেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এর সমস্যাগুলিও গুরুতর আকার ধারণ করত না। কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত বিদ্যাসাগরের মডেল বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য ভারতসরকারের সুপারিশমত মাসিক এক হাজার টাকার অনুদানও সেক্রেটারী অফ্ স্টেট মঞ্জুর করেন নি। অজুহাত হিসাবে স্পষ্ট করে উল্লেখ না করলেও সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ব্যয়সঙ্কোচের নির্দেশই এই কার্পণ্যের কারণ। কিন্তু সরকারের অন্যান্য বিভাগে বিশেষ করে সামরিক বিভাগে তখন ব্যয়সঙ্কোচের কোনও চেষ্টাই ছিল না। বালিকা বিদ্যালয়গুলি নিয়ে বিতর্ক চলার সময় এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্যালয়গুলির স্বনির্ভর হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগের যুগের মতোই স্বনির্ভর হয়ে উঠবে, এটিই ছিল সরকারের আশা। প্রাথমিক অবস্থায় আর্থিক অনটন কাটিয়ে ওঠার জন্য তাঁরা সরকারী অনুদান বা Grants-in-Aid-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপরে গ্রামীণ অর্থনীতি এই বিদ্যালয়গুলিকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে, এইরূপ আশা করা হয়েছিল। সরকার কেবল উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার জন্য কিছু খরচ করবে। অ্যাডামের রিপোর্টে পূর্ববর্তী যুগে গ্রাম্য আর্থনীতি-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার যে জয়গান করা হয়েছিল, সেটিও সরকারী চিন্তাকেও প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে গ্রামের অর্থনীতিক বনিয়াদ যে ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে, এ সম্পর্কে ভারতের প্রশাসকমন্ডলী সম্যক অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তাহলে তাঁরা মাতৃভাষার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বনির্ভর হবে এ দুরাশা করতেন না।

বিদ্যাসাগরও প্রথমদিকে সরকারের উচ্চপদস্থ আমলাদের চিন্তায় কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁরও ধারণা ছিল যে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী উদারচেতা বিত্তশালী ব্যক্তির অভাব ঘটবে না। কিন্তু কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে বদান্যতার অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। প্রাথমিক উৎসাহ বেশী জায়গাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তবে বিদ্যাসাগর এই আশা পোষণ করতেন না যে, বিদ্যালয়গুলি স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। বরং তাঁর আশা ছিল যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ পরিলক্ষিত হলে সরকারী অনুদানের হার বেড়ে যাবে। কারণ, তাঁর প্রাথমিক ধারণায়, শিক্ষাপ্রসারে সরকারের আগ্রহ ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর আশাভঙ্গ হোল। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার নামে সরকার যে শিক্ষা দিতে চান, তা বস্তুতপক্ষে সাক্ষরতা, কিংবা তার থেকে অল্প একটু বেশী। আর সরকারী কোষাগার থেকে কত কম খরচে এটি করা যায়, তার দিকেই লক্ষ্য ছিল। সরকারী উদ্দশ্যের এই পরস্পর-বিরোধিতা বিদ্যাসাগরের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয় না। একটু দেরীতে হলেও, তিনি বুঝেছিলেন সরকার যে খরচে জনশিক্ষার প্রসার ঘটাতে চান, সে খরচে কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালানো অসম্ভব।[৩৯] তা ছাড়া কেবল সাক্ষরতা অর্জন, সাধারণ মানুষের কাছে খুব উৎসাহব্যঞ্জক সম্ভাবনা বলে মনে হতো না।





ঈশ্বরচন্দ্র ও পত্নী দিনময়ী দেবী

বেথুন স্কুলের সম্পাদক[৪০] হিসাবে বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন যে, এই স্কুলের ৪০ থেকে ৫০টি ছাত্রীর জন্য সরকারের বার্ষিক খরচ ছিল ৭ থেকে ৮ হাজার টাকার মত।[৪১] বিদ্যাসাগরের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাসূচীতে ছিল পঠন-লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ এবং সূচীকার্য। বাংলাভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হোত। সুতরাং বিদ্যাসাগরের মডেল বালিকা বিদ্যালয়ের থেকে পাঠ্যসূচীর মান খুব বেশী উন্নত ছিল না, যদিও পাঠ্যসূচীতে কিছুটা বৈচিত্র্য ছিল। স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে পাঁচজন শিক্ষিকা ছিলেন। সুতরাং আয়োজনের অপ্রতুলতা ছিল না। বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করেছিলেন যে, "যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে।" এই শ্রেণী কলকাতার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণী। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব উচ্চবিত্ত, এবং স্বভাবতই রক্ষণশীল শ্রেণীর উপরও পড়েছিল। উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে খুবই অল্পসংখ্যক ছাত্রী বিদ্যালয়ে আসত বটে, কিন্তু "অনেক বিত্তশালী বাড়ীতেই মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে", বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন।[৪২]

বেথুন স্কুলেও উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব সরকার ও পরিচালকমন্ডলীকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। সেই সময় মিস্ মেরী কার্পেন্টার ভারতবর্ষে আসেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী এবং ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল মহিলা হিসাবে পরিচিতা ছিলেন। ১৮৬৬ সালের শেষদিকে এদেশে এসে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার সংক্রান্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই প্রস্তাব দিলেন যে বেথুন স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব দূর করতে শিক্ষিকা-শিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল খোলা দরকার। বস্তুতপক্ষে এই প্রস্তাবটি নতুন নয়। প্রথমে সরকারের তরফে এই প্রস্তাবটি করা হয়েছিল, এবং তারই জবাবে ১৮৬৩ সালের ১৩ই জুন, বিদ্যাসাগর, স্কুল কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবে সরকারকে লিখেছিলেন যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা মহিলারা নর্মাল স্কুলের ছাত্রী হিসাবে, শিক্ষাদান বিষয়ে ট্রেনিং নিতে রাজী হবেন না। "It is presumed that the females must be grown up when they become candidates for admission, but according to the custom of the country, it can hardly be expected that a respectable woman who has passed the age of twelve can be prevailed upon to attend a school for instruction."[৪২] লক্ষণীয়, দেশাচারকে বিদ্যাসাগর প্রধান বাধারূপে চিহ্নিত করেছেন।

বিদ্যাসাগরের এই জবাবের পর বিষয়টি তখনকার মত চাপা পড়ে যায়। মেরী কার্পেন্টার এদেশে আসার পর এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন করা হয় (১লা ডিসেম্বর, ১৮৬৬)।[৪৩] বিদ্যাসাগরও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর ছাড়াও ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন ঘোষ এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক। নর্মাল স্কুলের প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু নর্মাল স্কুল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতের কোনও পরিবর্তন হয়নি। দু'দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। কারণ তিনি মনে করেন "স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে যাহারা অনুরাগী, সমাজের সেইসব মান্যগণ্য ব্যক্তির মতামত জানা উচিত ছিল।" যাই হোক, বিদ্যাসাগর 'ফিমেল নর্মাল স্কুলের' ব্যাপারে তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি।

১৮৬৭ সালে ১লা অক্টোবর, লেঃ গভর্নর গ্রের চিঠির জবাবে বিদ্যাসাগর লিখলেন, "সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা দশ-এগার বছরের বিবাহিতা বালিকাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না ; তখন তাহারা বয়স্থা আত্মীয়াদের শিক্ষয়িত্রীর কার্য গ্রহণ করিতে কিরূপে সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল অসহায়া অনাথা বিধবাদেরই এ কার্যে পাওয়া যাইতে পারে। ...... আর দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি অলঙ্ঘনীয় বাধারূপে না দাঁড়াত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কার্যকর করিবার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।[৪৪] বিদ্যাসাগরের আপত্তি সরকার গ্রাহ্য করলেন না ; 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। সেই সঙ্গে ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে বেথুন স্কুল সরকারের অধীনে আনা হোল। মিসেস ব্রিট্‌সে নামক এক মহিলাকে বেথুন স্কুল ও নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেডেন্ট-পদে নিয়োগ করে ডাইরেক্টর অফ্ পাব্‌লিক ইন্সট্রাক্‌সনকে পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হোল। বিদ্যাসাগর সম্পাদক-পদ থেকে অব্যাহতি পেলেন বটে, কিন্তু বেথুন স্কুলের বিষয়ে সাহায্য করার জন্য সব সময়েই আগ্রহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়-পরিদর্শক উড্রো একটি চিঠিতে লিখছেন, "তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া আমার সহিত বিদ্যালয়গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা হিন্দু মহিলাদিগের থাকার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দরকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। ......নর্মাল স্কুলটি যে বিশেষ ফল লাভ করিবে এমন আশা তিনি করেন না। কিন্তু তবুও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"

'দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কারের' যুক্তিটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং 'ফিমেল নর্মাল স্কুলের' প্রস্তাবটি সমর্থন করেননি বলে বিদ্যাসাগর সমালোচিত হয়েছেন। বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল বলেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগর একটি বাস্তব অবস্থাকে যথার্থরূপে অনুধাবন করে ফলাফল সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের সমর্থন বা অসমর্থনের কথা বড় করে তুলে ধরেন নি। সেইজন্যই তিনি যখন সম্পাদক ছিলেন না, তখনও নর্মাল স্কুল স্থাপনে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষয়িত্রী মহিলারা কোথায় থাকবেন ইত্যাদি বিষয়েও তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। এগুলি তাঁর চিন্তার বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সূচিত করে না।

বিদ্যাসাগর যে কথা চিন্তা করে নর্মাল স্কুল সম্পর্কে বিশেষ আশাবাদী ছিলেন না, সেই "দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কারই" প্রবল হয়ে নর্মাল স্কুলের উপর আঘাত হানল। সরকার শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল যে "তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও ফিমেল নর্মাল স্কুলটিকে সফল করিতে পারা যায় নাই।"[৪৭] অবশেষে ১৮৭২ সালের ৩১শে জানুয়ারি স্কুলটি বন্ধ করে দিতে হয়। দেশাচারের শক্তি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনে কোনও সংশয় ছিল না। আর একবার এই বাস্তববাদী পণ্ডিতের অনুমানের যথার্থতা প্রমাণিত হোল।

৪

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছেড়ে শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করাতেই বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ছিল বেশী। হ্যালিডের সঙ্গে আলোচনার সময় দক্ষিণবাংলায় স্কুল-

ইন্সপেক্টারের পদে নিয়োগের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছিল এবং বিদ্যাসাগর যেভাবে মডেল স্কুলগুলি স্থাপন ও পরিচালনা করেছিলেন তাতে তাঁরও ঐ পদে নিযুক্তির সম্ভাবনা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের প্রত্যাশা ছিল ঐ পদে নিয়োগ। তাঁর নিম্নোক্ত চিঠি থেকে স্পষ্ট যে হ্যালিডে তাঁকে সেই আভাস দিয়েছিলেন।

"গত শনিবার আপনার সহিত দেখা করিয়া দক্ষিণ-বাংলার ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পর্কে দু-একটা কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া লিখিত পত্র দাখিল করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।' তদনুসারে আমি বিনীতভাবে প্রস্তাব করিতেছি যে, যদি আপনি আমাকে ঐ পদে বহাল করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজে আমার পদে যাহাকে নিয়োগ করা হইবে, তাহার নিয়োগ সম্পর্কে যেন আমার সহিত পরামর্শ করা হয়।"

"বিদ্যাসাগর এই চিঠি পাঠালেন মে মাসে (১৮৫৭), কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই চিঠি হ্যালিডের কাছে পৌঁছাবার আগেই লজ নামক এক ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। বিদ্যাসাগর যথার্থভাবেই মনে করেছিলেন যে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় নি। বস্তুতপক্ষে, হ্যালিডে হজসন প্রাটের জায়গায় বিদ্যাসাগরের নিয়োগের ইঙ্গিত না দিলে তিনি চিঠিতে, "যদি আপনি আমাকে ঐ চাকুরিতে বহাল করেন," (if you feel inclined to transfer me to the post) এই কথা কখনই লিখতেন না। আর বিদ্যাসাগর যে যোগ্য ব্যক্তি সে সম্পর্কে হ্যালিডের অন্তত কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধে দারুন আঘাত লাগল।

গর্ডন ইয়ং, ডাইরেক্টর অফ্ পাব্লিক ইন্স্ট্রাক্সন হিসাবে বিদ্যাসাগরের সরকারী ওপরওয়ালা। তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ভাল ছিল না। অন্তত দুটি বিষয় নিয়ে ইয়ংয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তিক্ততার সৃষ্টি হয়; যদিও দুটি বিষয়েই বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

মডেল স্কুল এবং অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলা স্কুলের অনেকগুলি পাঠ্য-পুস্তকের রচয়িতা এবং প্রকাশক ছিলেন বিদ্যাসাগর। পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে এদের উৎকর্ষতার জন্যই এগুলি অপরিহার্য ছিল। বইগুলির দাম অপেক্ষাকৃত বেশী বলে শিক্ষাবিভাগকে অনেকেই রিপোর্ট দিলেন। দক্ষিণবঙ্গের পরিদর্শক হিসাবে হজসন প্রাট একটি রিপোর্টে[৪৯] (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬) গর্ডন ইয়ংকে জানালেন যে, বিদ্যাসাগরের বইয়ের দাম খুব বেশী বলে জনসাধারণ অভিযোগ করে থাকেন। [Another obstacle is the price of school books which the public complain bitterly. At present not only Pundit Iswarchandra Sharma allowed to charge much too high a price for his publication, but to alter it without notice or permission] এইরূপ অভিযোগ ইয়ং নিশ্চয়ই আরো পেয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের উদ্দেশ্যে (improvement of different classes of schools established in Bengal) একটি কমিটি (জুলাই,১৮৫৬) গঠন করেছিলেন।[৫০] এই কমিটিই বিদ্যাসাগরকে প্রায় শাসানির ভাষায় চিঠি লিখলেন যে, বাংলাভাষায় তাঁর রচিত বইয়ের দাম না কমালে তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন করবেন যেন অন্য গ্রন্থকারের পাঠ্য-পুস্তক সস্তায় প্রকাশ করার বন্দোবস্ত করা হয়। [They (the committee) therefore think it right to inform you that unless you can make arrangements for reducing the prices of your vernacular books, they will consider it necessary to recommend the

Government to publish other and cheaper works in their place for the use of all Aided and Model Vernacular Schools.][৫১] বিদ্যাসাগর, বইয়ের দাম যে অযৌক্তিক বা অধিক, একথা মানতে রাজী নন। তিনি সেইমত জানিয়ে দিলেন এবং বললেন, যে কমিটি তাদের প্রস্তাবমত অন্য গ্রন্থকারের পাঠ্য-পুস্তক সস্তায় প্রকাশ করতে পারে। সেই সঙ্গে শাসানিরও প্রতিবাদ জানালেন। ["it is with feeling of regret I have perused your letter, the tenor of which appears to me to be so very objectionable.] উল্লেখযোগ্য যে, যেসব বইয়ের দাম কমানোর কথা হচ্ছিল, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ বইয়ের রচয়িতা বিদ্যাসাগর হলেও, কয়েকটির রচয়িতা ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইত্যাদি। বইগুলির উৎকর্ষতা সম্পর্কে অবশ্য শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীরা একমত ছিলেন [His series of school books are unexceptionable except in point of price][৫২]। সাময়িক ভাবে এই বিবাদের অবসান ঘটল যখন সরকার বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব মেনে নিলেন। প্রস্তাবটি ছিল যে সরকার বইগুলির উল্লেখিত দামের তিন-চতুর্থাংশ দিয়ে দু'বছরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বই কিনে নিয়ে ছাত্রদের কাছে বিক্রি করবেন। তার ফলে ছাত্ররা তিন-চতুর্থাংশ দামে পাঠ্য-বই পাবে। সেই ব্যবস্থাই চালু হোল (ডিসেম্বর,১৮৫৬)।

গর্ডন ইয়ং কিন্তু এই ব্যবস্থাকেও বদলে দিয়ে সরকারের 'স্কুল বুক সোসাইটির' হাতে পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশের প্রস্তাব দিয়েছিলেন (এপ্রিল ১৩, ১৮৫৭)।[৫৩] বিদ্যাসাগর তা-ও মানতে রাজী হননি। 'স্কুল বুক সোসাইটি' বাংলা বই প্রকাশে কতটা উৎকর্ষতা দেখাতে পারত, সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তবে প্রস্তাবটি যে সৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়নি, এরূপ মনে করার কারণ আছে। ইয়ং-নিযুক্ত কমিটি বিদ্যাসাগরকে দিয়ে পাঠ্য-পুস্তকের দাম কমাতে অকৃতকার্য হওয়ার পরেই স্বয়ং ইয়ং-এর কাছ থেকে এই প্রস্তাব আসে। বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হননি। এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্যাসাগরের বৈষয়িক স্বার্থের জন্য এই প্রস্তাবে আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু এই মন্তব্য বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যথাযোগ্য নয়। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে (১১ই জুলাই, ১৮৭৩), বিদ্যাসাগরের বইয়ের আয় যখন অনেক কমে গিয়েছিল, সেই সময় তৎকালীন ডি. পি. আই, এ্যাট্‌কিন্‌সন (W.S Atkinson) বাংলা ও ইংরেজী পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনের জন্য স্কুল বুক কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে আমন্ত্রণ জানান। বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর স্বার্থ কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত। তা ছাড়া, কমিটির মিটিংয়ে তাঁর উপস্থিতি পাঠ্য-পুস্তকের গুণাগুণ সম্পর্কিত আলোচনাকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং, বিদ্যাসাগর বিষয়জনিত স্বার্থকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতেন না। প্রকৃতপক্ষে, ইয়ংয়ের বিদ্যাসাগরকে অসুবিধার মধ্যে ফেলার সতত চেষ্টার থেকেই ঐ প্রস্তাবের উদ্ভব বলে মনে করা হলে ভুল হবে না।

সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক-নিয়োগের ক্ষেত্রেও ইয়ংয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধ দেখা দিল। বিদ্যাসাগরের নিযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মজুমদার ও বাবু গুরুদয়াল সিং-এর নিয়োগ অনুমোদন করলেন না ইয়ং। বিদ্যাসাগর পুনরায় লিখলেন যে, এই নিয়োগ অনুমোদন না করলে অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁকে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হবে (place me in a very disagreeable position)।[৫৪] গর্ডন ইয়ং তখন (মে, ১৮৫৭) এই নিয়োগ অনুমোদন করলেন। বিনয় ঘোষ এই ঘটনাটি সম্পর্কে বলেছেন, "বিদ্যাসাগরের এই আচরণ খুব সঙ্গত বলে মনে

হয় না।"[৫৬] বিদ্যাসাগর যা করেছিলেন তা তখনকার প্রচলিত পদ্ধতিতে বে-কানুনী ছিল না। বস্তুতপক্ষে, অধ্যক্ষই নিয়োগ করে সরকারের অনুমোদন নিয়ে নিতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড্‌রাইটার থাকার সময় বিদ্যাসাগর, প্রার্থী বেশী হলে পরীক্ষা নিয়ে প্রার্থী নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গর্ডন ইয়ং যে বিদ্যাসাগরের উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তার প্রমাণ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দেওয়া তাঁর রিপোর্ট। সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারীকে (C. T. Buckland) দেওয়া একটি চিঠিতে (২৯ জানুয়ারি, ১৮৫৭) ইয়ং লিখেছেন যে, বিদ্যাসাগরকে স্কুল-ইন্সপেক্টরের দায়িত্বের ন্যায় কিছু সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং তিনি এই কাজে খুব কম সময় দিতে পারেন [Pundit Iswarchander Sharma, who, though he occasionally performs duties of a special and temporary purpose, and can devote but a small portion of his time to that purpose]।[৫৭] ইয়ংয়ের এই বক্তব্য সত্যের আলাপ।

বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সরকারী চাকুরির উচ্চপদে নিয়োগ, অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। হ্যালিডের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে তাঁকে সহকারী পরিদর্শকের পদ দেওয়া হয়েছিল; পরে বিশেষ পরিদর্শক (Special Inspector) করা হয়। কিন্তু এরপর ইন্সপেক্টর করার প্রস্তাবের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে আমলাতন্ত্র সচেষ্ট হয়েছিল। হ্যালিডের তাই ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না। বিদ্যাসাগরের নিকট সমস্ত বিষয়টি দুর্বোধ্য ছিল বলে মনে হয় না।

বালিকা বিদ্যালয়গুলি সরকারের লিখিত অনুমতি নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি বলে সরকার বিদ্যাসাগরের উপর রুষ্ট হয়ে বিদ্যালয়গুলির ব্যয়বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করে,— বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের এইটিই প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করে থাকেন।[৫৮] কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর পদত্যাগের ইচ্ছা প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৫৭ সালের ২৯আগস্ট, ইয়ংকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখছেন, "আপনি তিন মাসের জন্য শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিয়া আমি মনে করিলাম সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা আপনাকে জ্ঞাত করাইবার ইহাই প্রকৃত সুযোগ।"[৫৯] বিদ্যাসাগর বর্ধমানের জৌগ্রামের বালিকা বিদ্যালয়টি ৩০ মে ১৮৫৭ তারিখে খুলেছিলেন, কিন্তু বাকী বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে। আর আগস্ট মাস্রেই তিনি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন ডি. পি. আই-কে। সুতরাং, বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত মতবিরোধই তাঁর পদত্যাগের কারণ নয়।

হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কী কথা হয়েছিল তা জানার উপায় নেই ; কারণ তার উল্লেখ কোনও নথিপত্রে নেই। ইয়ংকে লেখা চিঠির ভিত্তিতেই তিনি বিদ্যাসাগরকে ডেকে কথাবার্তা বলেছিলেন। এরপর প্রায় একবছর বিদ্যাসাগর পদত্যাগের বিষয়ে কিছু বলেন নি। ১৮৫৮ সালের ৫ই আগস্ট তিনি ইয়ং-এর নিকট পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। স্বাস্থ্য ছাড়া আরও দু'টি কারণ উল্লেখ করলেন। ইয়ংকে লেখা চিঠিটি রীতিসিদ্ধ (formal) বলে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে; কিন্তু হ্যালিডেকে আধা-সরকারী চিঠিতে যা লিখেছেন, তাতে বিদ্যাসাগরের মনোভাবটি পরিষ্কার। "শারীরিক অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু

বিবেকধর্মানুসারে বলিতে গেলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। তাহাই যদি হইত, তা হইলে দীর্ঘ ছুটি লইয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিতাম। বর্তমান অবস্থায় সরকারী চাকুরি করা যে আমার পক্ষে অনেক সময় অপ্রীতিকর এবং অসুবিধাজনক বোধ হইয়াছে, এবং যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, তাহাতে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে মাত্র,— এসব কথা আপনাকে বহুবার বলিয়াছি। এ ছাড়া দেখিয়াছি পদোন্নতির আর কোনও আশা নাই, কারণ আমার ন্যায্য দাবি একাধিকবার উপেক্ষিত হইয়াছে (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮)।[৬০]

গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে মতবিরোধের বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন বিদ্যাসাগর। ইয়ংয়ের সঙ্গে মতবিরোধ শিক্ষক-নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তকের দাম ইত্যাদি বিষয়ে হয়েছে, কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে মতবিরোধের ইঙ্গিত কোনও সরকারী নথিতে পাওয়া যায় না। জনশিক্ষা-ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি বিদ্যাসাগর তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। তিনি এই বিষয়ে তাঁর মতামত হ্যালিডেকেও যে জানিয়েছেন, এবং এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন তা জানা গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হয়নি। সরকারী অর্থের একান্ত স্বল্পতা ও অসম্পূর্ণ পাঠ্যসূচীর দ্বারা কিছু লোককে সাক্ষর করা যায়; কিন্তু সেই সাক্ষরতাকে শিক্ষা বলা যায় না। জনশিক্ষা সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য বিদ্যাসাগরকে হতাশ করেছিল। পদোন্নতির ব্যাপারে আশাভঙ্গ অন্যতম প্রধান কারণ বলেই মনে হয়। যাই হোক, বিদ্যাসাগরের চিঠির প্রতিক্রিয়ায়[৬১] হ্যালিডের সহৃদয় বন্ধুত্বের ও নিরপেক্ষতার মুখোশটি খুলে গিয়ে তার ঔপনিবেশিক আমলার চরিত্রটি বেরিয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্যের কারণটি ছাড়া আর সমস্ত কিছুই তিনি অগ্রাহ্য করলেন। জনশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অভিযোগ সম্পর্কে বললেন, এটা তাঁর (বিদ্যাসাগরের) ব্যক্তিগত মতামত। একথাও স্বীকার করলেন না যে পদোন্নতির জন্য বিদ্যাসাগরের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরকে আরও অপমানিত হতে হোল যখন বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য খরচের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি সরকারী চাকুরিতে থাকতে চাইলেন,[৬২] কিন্তু সরকার তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধ নাকচ করার পিছনে হ্যালিডের ইঙ্গিত অনুমান করা কঠিন নয়। বিদ্যাসাগর তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর। আর্থিক দিক থেকে কিছু ইতরবিশেষ হোল না ; কারণ প্রেস ও বই থেকে তখন তাঁর মাসিক আয় তিন থেকে চার হাজার টাকা।[৬৩]

৫

সরকারী চাকুরি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর সরকারকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কোনও সরকারী দাক্ষিণ্য গ্রহণ করেননি। সরকার বা সরকারী কর্মচারীদের তাঁর সম্পর্কে ধারণার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেছিল বলে মনে হয় না। তবে জনশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণায় একটি পরিবর্তন হয়েছিল। সরকারের জনশিক্ষাবিস্তারে যে প্রয়াসের সঙ্গে বিদ্যাসাগর পরিচিত হয়েছিলেন, তার দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার সম্ভব নয়। Grants-in-Aid কৃপণতা জনশিক্ষা-প্রসারে বিশেষ সাহায্য করতে পারে না। তাই "বাংলাদেশে সরকার উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখা দরকার।

দেশের সমস্ত জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া খুবই আকাঙ্ক্ষিত, কিন্তু কোনও সরকার সেই দায়িত্ব নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।" [In Bengal the Government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale. ...... To educate a whole people is certainly very desirable, but this is a task which it is doubtful whether any Government can undertake or fulfill.][৬১]

অতঃপর তিনি সরকারী চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন শুনে কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করতে আহ্বান জানান। বিদ্যাসাগর সেই দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম ভারতীয় পরিচালিত বি. এ পড়ার কলেজে পরিণত করেন (১৮৭২)। জনশিক্ষার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে "উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারে" মনোযোগ দিয়ে তিনি যে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন, সে কাহিনীও এক পথিকৃতের কাহিনী। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা ঃ বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য

১

আঠারো শতকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার জন্য এদেশীয় লোকেদের সাহায্য নিতে হোত। কাজের দায়িত্ব অনুসারে তাদের বলা হোত গোমস্তা, বানিয়ান ও দস্তক। গোমস্তারা লাভের একটা অংশ অথবা মাইনে পেতেন ; বানিয়ানরা প্রায় অংশীদারের মতো লাভের একটা ভাল অংশ পেতেন। দস্তকরা কোম্পানির কর্মচারীকে কিছু কমিশন দিয়ে তাঁদের নাম ও পরিচয় নিয়ে নিজেরাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেন।[১] দস্তকদের সংখ্যা খুবই কম ছিল।

কিছু সংখ্যক বানিয়ান ও গোমস্তা বাণিজ্যের কল্যাণে বেশ ধনবান হয়ে সামাজিক মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে জমিদারি কিনলেন। বেশির ভাগ বানিয়ান-গোমস্তা অবশ্য বাণিজ্যের আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেন নি। ১৮৩০ সালে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায়িক সংস্থা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা বানিয়ান-গোমস্তাকে, এমনকি কিছু বিদেশী ব্যবসায়ীকে, জমিদারি কিনতে আগ্রহী করে তুলেছিল।

তবে সব বানিয়ান বা গোমস্তা জমিদারি কিনে জমিদার হয়ে বসেননি। বেশ কিছু গ্রাম্য জমিদারও নগর-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে বাস কবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা, সেই সঙ্গে নগর-জীবনের সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করা। এর সঙ্গে জমির উপস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণী, ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই ছিলেন উনিশ শতকের কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়। এই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণত উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন। তাঁরা "ভদ্রলোক" বলেই অভিহিত হতেন। এই ভদ্রলোকশ্রেণী ছাড়া কলকাতার বেশির ভাগ মানুষই ছিলেন কামার, কুমোর ইত্যাদি বৃত্তিজীবী, দিনমজুর, শ্রমিক, গৃহভৃত্য, নিম্নবেতনের কর্মচারী ইত্যাদি। এরা বেশির ভাগই ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ এবং এসেছিলেন পাশাপাশি জেলাগুলি থেকে। উড়িষ্যা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে জীবিকার সন্ধানে এসেছিলেন অনেকে।

শহরের ভদ্রলোকসম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রভাব ছিল বেশী। কলকাতা নতুন যুগের বিকাশশীল-নগর ছিল বটে, কিন্তু কলকাতার বিকাশের পটভূমিতে কোনও শিল্পবিপ্লব বা নতুন যুগের শিল্পায়ন-প্রচেষ্টা ও বিজ্ঞান-চেতনা সক্রিয় ছিল না। বস্তুতপক্ষে কলকাতা ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে উঠেছিল বলে এই শহরের সামাজিক কাঠামোতেও রক্ষণশীলতার প্রভাব ছিল বেশী। তাই জাতিভেদ প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। ভদ্রলোকশ্রেণীতে ছিল উচ্চবর্ণের প্রাধান্য, অর্থাৎ বিত্ত, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কখনও কখনও দু'একজন নিম্নবর্ণের ব্যক্তি আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে সামাজিক

মর্যাদা লাভ করতেন বটে, কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা কিছু ঔদার্যের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এই প্রথাগুলির রক্ষণশীল প্রভাব বিনষ্ট হয়, কলকাতায় সেইরূপ অবস্থা গড়ে ওঠেনি।

কলকাতার প্রধান সংস্কার-আন্দোলনগুলি ভদ্রলোকসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; কারণ সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল ভদ্রলোকসমাজই। কলকাতায় ভারতীয়দের বসতি-এলাকা, যাকে ইউরোপীয়রা বলত 'ব্ল্যাক টাউন' (Black Town), সেখানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ছিল ভদ্রলোকশ্রেণীর বাইরে। তাদের মধ্যে 'সতী-প্রথা' বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বহুবিবাহ ছিল কুলীন-সম্প্রদায়ের 'অধিকার' ; সুতরাং বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনে এই 'অ-কুলীন' মানুষগুলি কোনও আকর্ষণ অনুভব করে নি। তাছাড়া, নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সম্প্রদায়গত কারণে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল না। বিধবাবিবাহ অনেক নিম্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত প্রথা ছিল। বেশির ভাগ নারী-পুরুষ শ্রমজীবী ছিল বলে নিম্নবর্ণের সমাজে নারী-স্বাধীনতা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। যেহেতু বিধবা মেয়েরা তাদের জীবিকার সংস্থান সাধারণত নিজেরাই করত, সেই জীবনযাত্রায় তাদের অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। তারা ইচ্ছা করলে বিয়ে করত কিংবা অন্যভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। তাই সমাজসংস্কারগুলির উত্তাপ কলকাতার বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজকে বিশেষ স্পর্শ করতে পারে নি।

১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভারতে ধর্মপ্রচারের অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ; সেই সঙ্গে ভারতবর্ষে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটাল। ফলে ভারতীয় বণিক-গোমস্তা-বেনিয়ানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ল। জমিদারি কিনে আর্থিক অবস্থাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলো অনেকে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ফলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হলো। আগ্রাসী ইউরোপীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, এই সংঘাত কখনও যথার্থ সংঘাতের রূপ নেয় নি। ইংরেজের হাতে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা ; তাছাড়া ভদ্রলোকশ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি এত দুর্বল এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার উপর এতখানি নির্ভরশীল ছিল যে, সেই অবস্থান থেকে আগ্রাসী সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই স্বাভাবিক ভাবে হিন্দুধর্মের ও সমাজের সংস্কার-আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি আপসমূলক ও আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া কাজ করছিল। একটি বৃহৎ ও প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের উপর অকস্মাৎ আঘাত আসাতে তাকে কিছুটা আপস করতে হোল এবং আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে হোল নিজেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে।

এই সংস্কার-প্রয়াসের উদ্যোক্তা ছিলেন 'ভদ্রলোক'-সম্প্রদায় এবং লক্ষ্যও ছিলেন তাঁরাই। সেই সময় কলকাতা শহরের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছিল 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ের বাইরে। এরা শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্যও ছিল না। আন্দোলন-জনিত সংঘাতের ঘটনায় ও গল্পকাহিনীতে এরা আনন্দ ও উত্তেজনা উপভোগ করত। কখনও কখনও এই বিষয়গুলি নিয়ে গান রচনা করে তরজা কিংবা কবির আসরে গাইত। কখনও বা 'সঙ'-এর শোভাযাত্রা বের করত। গ্রামাঞ্চল থেকে এই মানুষগুলি কলকাতায় এসেছিল কখনও জমিদারের

প্রয়োজনে ; কখনও বা জমি ও ভিটেমাটি থেকে উন্মূল হয়ে। তাছাড়া জাতিগত পেশার দিক থেকে কলকাতাতে সুযোগসুবিধা অনেক বেশী বলে কুমারটুলি, মেছুয়াবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক বসবাস শুরু করে। এরা বাস করত মাটির দেওয়ালযুক্ত কাঁচা-বাড়ীতে। চাল ছিল খড়ের বা টালির। ভদ্রলোকেরা সাধারণত থাকত ইট-চুন-সুরকির তৈরী পাকাবাড়ীতে। এদের ধর্ম ছিল বিভিন্ন প্রকারের ; ভক্তি-আন্দোলনের বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিল, ছিল আউল-বাউল-কর্তাভজা ইত্যাদি বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে গিয়ে যে 'নিরাকার ব্রহ্মের' সাধনার সূচনা হোল, তার কোনও আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই এদের কাছে ছিল না। কেউ সে ধর্মকে এদের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বিশেষ ভাবে চিন্তাও করেননি। শিক্ষা-সংস্কারের ফলাফল এদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। বিদ্যাসাগর যে অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন, সে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি। সমাজসংস্কার এদের পক্ষে জরুরী বা প্রয়োজনীয় ছিল না ; কারণ যে বিষয়গুলিতে সংস্কারের চেষ্টা, সে সমস্ত বিষয়ে এদের সমাজ তখনই ভদ্রলোক সমাজের থেকে অনেক বেশী উদার ছিল। তাই, একথা বলা যায় যে, উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলন, প্রকৃতপ্রস্তাবে ভদ্রলোকশ্রেণীর আন্দোলন। এই আন্দোলনের তীব্রতা ভদ্রলোকশ্রেণীতেই আবদ্ধ। কেবলমাত্র বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর ভদ্রলোকশ্রেণীকে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষকেও সামিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২

বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কিনা এ নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা ও আলোচনা সংহত ও সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে সমাজে কোনও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বৈশিষ্ট্য এইখানেই। প্রথমত, তাঁর চিন্তা ও যুক্তিগুলিকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে প্রয়োগ করেছেন। এগুলি কেবল শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা বা পণ্ডিতের বিধান নয়। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের মতামত যুক্তির শৃঙ্খলের মধ্যে গ্রথিত করে, বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তিভিত্তিক দলিল রচনা করেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বক্তব্য ছিল সেগুলি তিনি একান্ত ধৈর্যের সঙ্গে অনুধাবন করে প্রবলতর যুক্তির সাহায্যে খন্ডন করেছেন। আবার যেখানে বক্তব্য যুক্তিনির্ভর নয়, কেবলমাত্র বিদ্বেষ-প্রসূত, সেখানে তীব্র বিদ্রূপের দ্বারা সেই কুৎসাকে নস্যাৎ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল বিধবা-বিবাহকে কেবল যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করা নয় ; আইনত এই ব্যবস্থাকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া। তৃতীয়ত, তিনি কেবল জনমত সৃষ্টি করে ও আইন পাস করিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি ; তিনি এই ব্যবস্থাকে সমাজে কার্যকরী করার জন্য একাকী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার জন্য অর্থব্যয় হয়েছিল প্রচুর ; ঋণও করতে হয়েছিল অনেক। বিদ্যাসাগর সে সমস্ত ঋণের ব্যক্তিগত দায় স্বীকার করে নিয়ে, নিজের আয় থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত ঋণই শোধ করে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দেশে আর একটি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কথা আমাদের জানা নেই যেখানে মাত্র একজন ব্যক্তি আন্দোলনের যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি গঠন করেছেন, রক্ষণশীল প্রতিবাদীদের যুক্তিকে নস্যাৎ করে জনমত তৈরি করেছেন, আইন-প্রণয়নে সাহায্য করেছেন এবং সেই আইনকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য একক ভাবে চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত তিনি

করেছেন নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কোনও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নয়। সন্দেহ নেই, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের সাফল্য ছিল সীমিত ; কিন্তু সেই কারণে বিদ্যাসাগরের সাহসী প্রচেষ্টার মূল্য কোনও অংশেই কম হয় না।

বিদ্যাসাগরের অনেক আগে থেকেই বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা এবং এই প্রথা প্রচলনের জন্য কিছু চেষ্টা হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের আগে, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভ আট বৎসর বয়সের বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানের শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের বিধান আনিয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণের ফলে তিনি নবদ্বীপের পন্ডিতদের স্বাক্ষরিত বিধান সংগ্রহ করতে পারেন নি। ফলে তিনি বিধবা-বিবাহ দেওয়াতে সফল হননি। এর পর পন্ডিতরা বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ কিনা এ সম্পর্কে বিশেষ ক্ষেত্রে বিধান দিয়েছেন ; কিন্তু সাধারণ ভাবে এই বিবাহ সিদ্ধ কিনা এইরূপ বিধান কেউই দেননি। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার কিছু পূর্বে কলকাতার পটলডাঙ্গা-নিবাসী শ্যামাচরণ দাস তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য বিধান সংগ্রহ করেছিলেন। যাঁরা বিধান দিয়েছিলেন, তাঁরা তখনকার নামকরা পন্ডিত। সেই ব্যবস্থাপত্রটি ছিল এইরূপ ঃ "সুতরাং যে শূদ্রজাতীয়া অক্ষতযোনি বিধবা ব্রহ্মচর্য ও সহমরণরূপ দুই প্রধান কল্প অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক, অন্য পাত্রের সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ; এবং যথাবিধানে বিবাহসংস্কার হইলে, সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হওয়াও সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে"।[৩] কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে বলে সামাজিক দিক থেকে এই বিধানগুলির মূল্য খুব বেশী ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে পরিচিত পন্ডিতেরা বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে শাস্ত্রের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খুশী রাখতে দ্বিধা করতেন না। এই সঙ্গে প্রচলিত শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার কথাও উল্লেখযোগ্য। মনু, পরাশর ইত্যাদি বিখ্যাত শাস্ত্রকারদের গ্রন্থাবলী উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল হস্তলিখিত। পুরাতন, ভঙ্গুর তুলটকাগজে কিংবা তালপাতায় লেখা পুঁথিগুলি অনেক সময়েই ছিল পড়ার অযোগ্য। এগুলির কাল-পরম্পরা নির্ধারণ করারও বিশেষ কোনও উপায় ছিল না। তাছাড়া অনেক সময়েই সম্পূর্ণ রচনা একটি পুঁথিতে পাওয়া যেত না। কখনও কখনও অন্য শাস্ত্রকারের রচনাও অন্য একজনের রচিত শাস্ত্রের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়ে যেত ; ফলে কোন্‌টি কার রচনা, নির্ধারণ করা মুশকিল হয়ে উঠত। এই শাস্ত্রগুলিকে রচয়িতা অনুসারে কিংবা কালানুক্রমে সাজানো এবং তাদের সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন শাস্ত্রীয় বিধানের দ্বারা অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত হত, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে শাস্ত্রগুলি ছিল দুরধিগম্য। সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্যতার সুযোগে পন্ডিতরা নানারূপ ভুল ও প্রয়োজনানুগ ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাতেন। শ্যামাচরণ দাসের কন্যার বিবাহ সমর্থন করে মত দিয়েছিলেন ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। কিন্তু কয়েকমাস পরেই, শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেবের পারিতোষিকে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁরা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগর এই ধরনের মনোভাবকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করে লিখেছিলেন,এইরূপ আচরণ "যথার্থ ভদ্রের কর্ম হইতেছে না।"

বিধবাদের জীবনব্যাপী বৈধব্য এবং শাস্ত্রবিধান ও দেশাচার-অনুমোদিত দুঃখযন্ত্রণা একটি সংস্কার-যোগ্য সামাজিক কুপ্রথা হিসাবে প্রথম আলোচিত হয় রামমোহন রায়ের "আত্মীয়

সভার" (স্থাপিত ১৮১৫) অধিবেশনে। পরবর্তী কালে ডিরোজিয়ানরা এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা শুরু করেন। ১৮৪২ সালের জুলাই মাসে ডিরোজিয়ানদের মুখপত্র 'The Bengal Spectator' লিখলেন যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিম্নসম্প্রদায়ের হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই বিবাহ প্রচলনে শাস্ত্রের কোন বাধা নেই ; কারণ রাজা রাজবল্লভের জিজ্ঞাসার জবাবে কাশী ও মিথিলা ও দক্ষিণ ভারতের পন্ডিতরা শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করেই বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ বলে মত দিয়েছিলেন। The Bengal Spectator আরও বলেছিলেন যে, বিধবা-বিবাহ-জাত সন্তানকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতে হলে আইনের দ্বারা ঐ বিবাহ সিদ্ধ হওয়া দরকার। শাস্ত্রের সমর্থনের কথা বলতে গিয়ে পরাশরের বিখ্যাত শ্লোকটিও[৪] উদ্ধৃত করা হয়েছিল। সরকারের কাছে বিধবা-বিবাহকে আইন পাস করে সিদ্ধ করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছিল। এইরূপ আলোচনা সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ কখনও কখনও দু'-একটি বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৫২ সালের ২৩শে মার্চ "বেঙ্গলহরকরা"তে প্রকাশিত একটি বিধবা-বিবাহের ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র "সমাজোন্নতি বিধয়িনী সুহৃদ সমিতি" নামে একটি সমিতি স্থাপন করে প্রস্তাব নিলেন যে, তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন, বহুবিবাহরোধ প্রভৃতি সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে সমিতির পক্ষ থেকে বহুবিবাহরোধে ভারতের ব্যবস্থাপক সভার উদ্দেশে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। বিরুদ্ধবাদীরাও আবেদন করেন। সরকার এ বিষয়ে নীরব ছিলেন।

অতএব বিদ্যাসাগর যে সময়ে সমাজসংস্কার বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, সেই সময়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকসমাজেও এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ডিরোজিয়ানদের প্রস্তাবিত সংস্কারের ধারণার সঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের বাস্তববোধ ও দূরদৃষ্টির সংমিশ্রণে সমস্ত বিষয়টিকে এমন গুরুত্বপূর্ণ করে তুললেন এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তায় এমন একটি গতিবেগ সঞ্চার করলেন, যা ছিল অভূতপূর্ব।

এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর তাঁর কোনও বাল্য-ক্রীড়া-সঙ্গিনীর অকালবৈধব্যে বিচলিত হয়ে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, কিংবা মায়ের কথায় তিনি শাস্ত্র থেকে বিধবা-বিবাহের পক্ষে যুক্তি উদ্ধার করেছিলেন ইত্যাদি তাৎক্ষণিক প্রেরণার কাহিনীগুলির গুরুত্ব খুব বেশী বলে মনে হয় না। বস্তুতপক্ষে, এই বাস্তববাদী পন্ডিত হঠাৎ অনুপ্রেরণাবশে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এইরূপ বক্তব্য মেনে নিলে তাঁর দূরদৃষ্টি, বিচারশক্তি ও বাস্তববোধের প্রতি অবিচার করা হয়। সন্দেহ নেই যে, তাঁর গ্রামের বালবিধবাদের দুঃখকষ্ট থেকে, আত্মীয়দের অনুরূপ অবস্থায় জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে, জগৎদুর্লভবাবুর বাড়ীতে বিধবা রাইমণির জীবনযাত্রা থেকে, শহরের পরিচিত মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সমাজের ব্যাধিগুলির উৎস সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা করতে পেরেছিলেন ; সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে সমাজসংস্কারের রূপরেখা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

"সর্বশুভকরী" পত্রিকার "বাল্যবিবাহের দোষ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশের (ভাদ্র, ১৮৫০) প্রায় পাঁচ বৎসর পরে "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" প্রকাশিত

হয়। প্রায় দশ মাস পরে, ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক"। এই দুটি বইয়ে বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় আছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং তাঁকে অনেক বিনিদ্র রাত্রি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে কাটাতে হয়েছিল।

৩

বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তা প্রধানত নিম্নে উল্লিখিত রচনাগুলিতে বিধৃত রয়েছে। মোট দশটি প্রবন্ধ ও পুস্তকের মধ্যে পাঁচটি দৃঢ়নিবদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ রচনা ; আর অন্য পাঁচটি সরস বিদ্রূপ ও তীব্র শ্লেষে পরিপূর্ণ।

১. বাল্যবিবাহের দোষ, 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় ভাদ্র, ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত। যদিও লেখাটি নাম ছাড়াই প্রকাশিত, তবুও এটি বিদ্যাসাগরের রচনা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর সমস্ত জীবনীকাররাই।

২. বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়কে প্রস্তাব। জানুয়ারি, ১৮৫৫।

৩. বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক। অক্টোবর ১৮৫৫।

৪. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার। আগস্ট, ১৮৭১।

৫. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। এপ্রিল, ১৮৭৩।

৬. অতি অল্প হইল—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত। মে, ১৮৭৩।

৭. আবার অতি অল্প হইল—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত। সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।

৮. ব্রজবিলাস—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮৪। প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ করা যায়নি।

৯. বিধবা-বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা-বিষয়িনী—কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিনঃ। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮৭।

১০. রত্নপরীক্ষা—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য প্রণীত। আগস্ট ১৮৬৬।

এই রচনাগুলি ছাড়াও কিছু ব্যক্তিগত[৫] এবং সরকারের নিকট লেখা চিঠিপত্রে[৬] সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত প্রকাশ পেয়েছে।

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে নারী। তাঁর কথায়, "এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য-বশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।"[৭] স্ত্রীজাতির



এইরূপ অবস্থার জন্য তিনি তিনটি অনাচারকে দায়ী করেছেন। একটি হ'ল বাল্যবিবাহ-প্রথা, দ্বিতীয়টি বিধবাদের পুনর্বিবাহে দেশাচার ও শাস্ত্রের অসম্মতি, এবং তৃতীয়টি হ'ল কুলীনদের বহুবিবাহ-প্রথা। এই তিনটি কুপ্রথার অবসান ঘটানোই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল বলে এই সংস্কার-প্রচেষ্টাকে সামগ্রিকভাবে নারীমুক্তির প্রয়াস বলা যায়।

উপরের তালিকার প্রথম পাঁচখানি বই পান্ডিত্যপূর্ণ, দৃঢ়নিবদ্ধ যুক্তিপূর্ণ রচনা। এগুলি তাঁর সংস্কারপ্রয়াসের ভিত্তিস্বরূপ। অবশিষ্ট রচনাগুলি বিদ্যাসাগরের স্বনামে প্রকাশিত না হলেও এগুলি তাঁরই রচনা।[৮] বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনার অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে যে সমস্ত রচনা সৎ সমালোচনা এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা-বিদ্বেষের বা বিশ্বাসের প্রভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ নয়, বিদ্যাসাগর ধৈর্যসহকারে সেগুলির উত্তর দিয়েছেন এবং যুক্তিগুলিকে প্রবলতর যুক্তি দিয়ে খন্ডন করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু রচনা ছিল বিদ্বেষপ্রসূত এবং শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। বিদ্যাসাগর এই সমালোচনাগুলিকে তীব্র শ্লেষের দ্বারা নস্যাৎ করেছেন এবং মাঝে মাঝে প্রতিবাদীদেরও দৃষ্টিকটুভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। কখনও কখনও এই আক্রমণ যে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেনি, একথা বলা যায় না। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই বইগুলি রচনার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিল—উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সমালোচকদের মুখ বন্ধ হয়েছিল।

এই রচনাগুলির মধ্যে 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) বহুবিবাহের প্রতিবাদী তারানাথ তর্কবাচস্পতির তীব্র সমালোচনা। বাচস্পতি বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন। তাছাড়া ১৮৪৫ সালে বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। তারানাথ একটি সংস্কৃত পুস্তিকায় বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-সংক্রান্ত বইটি আলোচনাকালে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছিলেন। পরে বিদ্যাসাগর পাল্টা আক্রমণ করেন 'অতি অল্প হইল' নামক পুস্তিকায়। তারানাথ বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করে বিদ্যাসাগরকে পুনরায় আক্রমণ করলে বিদ্যাসাগরের 'আবার অতি অল্প হইল"-তে তারানাথকে মর্মান্তিক আক্রমণের লক্ষ্য হতে হয়। বিদ্যাসাগরের ভাষার প্রয়োগ ইত্যাদি সমর্থন করা সব সময়ে কঠিন হলেও একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, বিদ্যাসাগরকে সেই সময় অনেক অশ্রাব্য গালিগালাজের লক্ষ্য হতে হয়েছিল। সেই কারণে সম্ভবত তাঁর অবরুদ্ধ ক্রোধ এই বেনামী রচনাগুলিতে শালীনতা ও সংযমের নিয়ন্ত্রণ বিশেষ মেনে চলে নি। তারানাথ বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যেই বিদ্বানসমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর আক্রমণে বিদ্যাসাগর অপেক্ষাকৃত বেশী ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, "ধর্মের উপর কেহ আঘাত করিলে সেই আততায়ীকে নিরস্ত করা", তাদের অবশ্য কর্তব্যকর্ম। সেই সভায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় প্রতিপন্ন করে সংস্কৃতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটি 'সমাচার চন্দ্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল। 'ব্রজবিলাস' ব্রজনাথের বক্তব্যকে নস্যাৎ করার জন্যই রচিত হয়েছিল। 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বিষয়িণী' রচনাটির আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ঐ সভা এবং সভার সম্পাদক তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতরা কিভাবে তাঁদের

বিধান বদলে ফেলতে পারেন, তার কয়েকটি উদাহরণ প্রকাশ করেছেন বিদ্যাসাগর। 'রত্ন পরীক্ষা' তিনজন পন্ডিতের 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' নামক একটি পুস্তিকার উত্তরে লেখা। আক্রমণের তীব্রতা না থাকলেও ব্যঙ্গ ও শ্লেষ বইটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

বেনামে বিদ্যাসাগরের এই রচনাগুলি বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করতে অনেকাংশে সফল হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ হালকা রচনা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করে জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছিল। সমাজসংস্কারের লক্ষ্যে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে জনমতগঠনের কাজে বিদ্যাসাগরই এই ধরনের রচনাকে প্রথম সার্থকভাবে ব্যবহার করেছিলেন।

৪

এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সহসা 'পরাশর সংহিতার' চতুর্থ অধ্যায়ে বিখ্যাত 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' শ্লোকটি আবিষ্কার করেছিলেন। এই কাহিনীটিকে সামান্য অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। ১৮৪২ সালে ডিরোজিয়ানদের The Bengal Spectator পত্রিকায় বিধবা-বিবাহ বিষয়কে প্রবন্ধেই এটি উদ্ধৃত হয়েছিল। শ্লোকটি বিদ্যাসাগরের অজানা ছিল এমন মনে হয় না। বরং এই ধারণা সঠিক হবে যে, কলেজ লাইব্রেরীতে কাজ করার সময় তিনি 'পরাশর সংহিতার' শ্লোকটির যথার্থ শাস্ত্রীয় পরিপ্রেক্ষিত, ঐ গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়ের শ্লোকগুলির সঙ্গে অর্থ ও ভাব-সঙ্গতি এবং শ্লোক-নির্দিষ্ট বিধানকে একটি বিশেষ কালের জন্য নির্ধারিত বিধান বলে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে, শুধু এই শ্লোকটির অর্থ বিদ্যাসাগরের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কোন্ বিশেষ কালে ও সমাজে এর প্রয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে এবং সেই কালের ও সেই সমাজের শাস্ত্রনির্দেশিত অন্য প্রথা ও নিয়মের সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা—সেই তথ্যই বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন ছিল। তা হলেই শ্লোকটির নির্দেশকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। 'পরাশর সংহিতা' গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং অন্যান্য প্রতিবাদী এবং সমর্থক শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে বিচার করে শ্লোকটির যথার্থ কালানুক্রমিক অবস্থান আবিষ্কার করেছিলেন। ফলে শ্লোকটি তাঁর হাতে প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছিল।।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সমর্থনে যেভাবে যুক্তির সৌধ নির্মাণ করেছেন, তা আজও আমাদের চমৎকৃত করে। কেবলমাত্র বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বা জ্ঞানের গভীরতায় নয়, তাঁর বাস্তববোধ ও ইতিহাস-চেতনা তাঁর বক্তব্যগুলিকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে।

প্রথমত, তাঁর বক্তব্যের ধারা একান্তভাবে ন্যায়শাস্ত্রানুগ (logical)। সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্য তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একটি ধাপও বাদ দেন না বা পাঠকের কল্পনা বা অনুমানের উপর ছেড়ে দেন না। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য, দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নেই, সুতরাং এই নতুন প্রথা প্রচলিত করতে হবে। কিন্তু যদি এই প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত না হয়, তবে সেটি প্রচলন করা হবে অকর্তব্য কর্ম। কিন্তু যদি যুক্তি অনুমোদিত হয়? তা হলে. বিদ্যাসাগর বলেছেন, আমাদের দেশের লোক তা মেনে নেবেন না। অতএব বিধবা-বিবাহ যুক্তি নয়, শাস্ত্র-অনুমোদিত হতে হবে। সুতরাং, শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ হচ্ছে। এখানে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কোন্ যুক্তির কথা বলছেন বিদ্যাসাগর?

শাস্ত্রের বাইরে কোন্ যুক্তি অবলম্বন করে বিধবাবিবাহকে সমর্থন ও প্রচলন করা যায়? অবশ্যই সামাজিক ও মানবিক যুক্তি। কিন্তু সে যুক্তি তো আমাদের দেশের মানুষের কাছে গ্রাহ্য হবে না। তাই তাঁকে শাস্ত্র-মন্থন করতে হয়েছে শাস্ত্রীয় যুক্তির জন্য। বিদ্যাসাগর একটি সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্য শাস্ত্রীয় সমর্থন সংগ্রহে সচেতন ভাবে ব্যাপৃত হলেন ; কারণ তৎকালীন অবস্থায় শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও যুক্তিই মানুষের নিকট গ্রাহ্য হোত না।

বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রবিচারের পদ্ধতিটিও ছিল গতানুগতিকের থেকে ভিন্ন। তিনি শাস্ত্রকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে শাস্ত্রের বিচার করেছেন। শাস্ত্রের বা শাস্ত্রকারদের ঐতিহাসিকতা তিনি বিচার করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রোক্ত কালগুলিকে তিনি ইতিহাসের কাল হিসাবে মেনে নিয়েছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগগুলি ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের এক-একটি যুগ। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ক্রমবিবর্তন ঘটেছে —এই যুক্তিবাদী ধারণাটিকে ভিত্তি করেই তিনি শাস্ত্র-বিচার করেছেন। এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তরণ ঘটেছে ক্রমবিবর্তনের নিয়ম মেনে। তাই একযুগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার অন্য যুগের থেকে ভিন্ন। এইভাবে তাঁর যুক্তিগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, পাঠকের মনে অপ্রতিহতভাবে সেগুলি প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতবর্ষে শাস্ত্রের ও শাস্ত্রকার ঋষির অপ্রতুলতা কখনও ছিল না। কিন্তু কোন্ ঋষির শাস্ত্র বর্তমানকালে অনুসরণ করা কর্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন। শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক যুগের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। যুগানুসারে মানুষের শক্তি হ্রাসহেতু, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চার যুগের আচরণীয় ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন।[৮] সুতরাং এক যুগের ধর্ম অন্য যুগের উপর আরোপ করা, এক যুগের শাস্ত্রানুমোদিত প্রথা অন্য যুগের প্রচলিত করার বিধান দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তা ছাড়া ক্রমাগত শক্তিহ্রাসের ফলে কলিযুগের মানুষের পক্ষে পূর্ববর্তী যুগের আচরণীয় ধর্ম পালন করাও শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে সম্ভব নয়। সেই কারণে চার যুগের আচরণীয় ধর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বিধান আছে। বিদ্যাসাগর সেই বিধান আবিষ্কার করেছেন পরাশর সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে। সেখানে উল্লেখ আছে মনু-রচিত ধর্মশাস্ত্র সত্যযুগের জন্য, গৌতমের শাস্ত্র ত্রেতাযুগের জন্য, শঙ্খ-লিখিত শাস্ত্র দ্বাপরযুগের জন্য এবং পরাশরের শাস্ত্র কলিযুগের জন্য। যুগপরিবর্তনের সাথে মানুষের শক্তিহ্রাস হচ্ছে বলে শাস্ত্রগুলিও সেই বিবর্তনকে স্বীকার করে ক্রমশঃ স্বল্পশক্তি মানুষের জন্য রচিত হয়েছে।

এইভাবে শাস্ত্রীয় বচনের ভিত্তিতেই পরাশর বচনের কালোপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' শ্লোকটি শাস্ত্রীয় বিধান হিসাবে এক নতুন মাত্রা পেল। বহু অনুসন্ধানে ও পরিশ্রমে বিদ্যাসাগর এই শ্লোকটির যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কার করেছেন। যে বিচারধারা প্রয়োগ করে তিনি শাস্ত্রবচনকে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রাহ্য করলেন তা বৈজ্ঞানিক এবং তাঁর ইতিহাস-চেতনায় নিষিক্ত। এই মানসিকতাই নবযুগের আধুনিক মানসিকতা।

বিধবা-বিবাহজাত সন্তানের সমাজে স্বীকৃতি প্রয়োজন। সেইজন্য প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রবচনের ব্যাখ্যায় তিনি যেভাবে যুক্তিবিন্যাস করেছেন, তা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কলি-পূর্বযুগে বিধবা-বিবাহজাত সন্তানকে 'পৌনর্ভব' বলা হোত। এইরূপ সন্তানের কোনও সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার থাকত না। পরাশর সংহিতায় কলিযুগে তিন প্রকার পুত্রের বিধান অছে—ঔরস, ক্ষেত্রজ ও দত্তক। পরাশর পৌনর্ভবের কোনও উল্লেখ করেন নি। যেহেতু বিবাহিতা বিধবার

পুত্র ক্ষেত্রজ বা দত্তক হতে পারে না, সেইজন্য অনিবার্যভাবে সেই পুত্র ঔরসপুত্রের সামাজিক মর্যাদা ও আইনগত অধিকার ভোগ করবে।

'আদিত্যপুরাণ' ও 'বৃহন্নারদীয়'—এই দুই শাস্ত্রের পুত্র-সংক্রান্ত বিধান পবাশর সংহিতার ব্যাখ্যাকে নাকচ করে দেয়। বিদ্যাসাগর সুকৌশলে এই দুই পুরাণ গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রমাণ করলেন। আদিত্যপুরাণের নির্দেশ অনুসারে কলিযুগে ঔরস ও দত্তক ছাড়া কোনও পুত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। তাই বিধবাবিবাহ জাত সন্তান ঔরসপুত্র বলেই গণ্য হবে। তারপরেও বিদ্যাসাগর এই দুই পুরাণের বিধান যে গ্রহণযোগ্য নয় তা প্রমাণ করলেন। ব্যাস-সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখলেন, 'যেখানে "বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ, আবার স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ।"[১১] আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারীদয় পুরাণ, কিন্তু পরাশরসংহিতা স্মৃতি। সুতরাং ব্যাসদেবের নির্দেশ অনুসারে স্মৃতি অর্থাৎ পরাশর-সংহিতাই এস্থলে মান্য।'

এইভাবে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের যে সামগ্রিক ও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের ধারার সূচনা করলেন, তা বস্তুতপক্ষে অভূতপূর্ব। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এর জন্য যে জ্ঞানের ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতার প্রয়োজন, তা সাধারণ পন্ডিতদের মধ্যে দুর্লভ ছিল। লক্ষণীয় যে, এই বিশ্লেষণে তিনি শাস্ত্রের বিধানগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তোলেন নি, তাঁর বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রেখেছেন এই বিধানগুলির যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের স্থান ও কালের আলোচনার মধ্যে। এই বিশ্লেষণ সম্যকভাবে অনুধাবন করলে অনিবার্যভাবে শাস্ত্রের বিধানগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগবে পাঠকের মনে। বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি এত দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল যে, ছিদ্রান্বেষী পন্ডিতেরাও এর মধ্যে কোনও দৌর্বল্য দেখতে পাননি। রাধাকান্ত দেব বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন ; কিন্তু তিনিও যুক্তি-বিস্তারের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগরের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রথম বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর, অনেকে বিদ্যাসাগরের যুক্তি খন্ডন করার চেষ্টা করে প্রবন্ধ লেখেন বা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রতিবাদীদের বক্তব্যের জবাব দেন বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে (অক্টোবর, ১৮৫৩)। প্রতিবাদীদের বক্তব্য অনেক। বিধবা-বিবাহের মন্ত্রের কোনও পরিবর্তন হওয়া উচিত কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে শুরু করে পরাশর-বিধি মনু-বিরুদ্ধ কিনা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তোলা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর সবগুলিই খন্ডন করেছেন। খন্ডন করতে গিয়ে তাঁকে প্রায় সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রই পাঠ করতে হয়েছে। তাঁর জ্ঞানের এই অসাধারণ বিস্তৃতি পাঠককে আশ্চর্যান্বিত না করে পারে না।

দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর যে প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রতিবাদ যুক্তিগুলি খন্ডন করেছেন সেগুলি হোল, (১) পরাশর বচন বাগ্‌দত্ত সম্পর্কে নয়, বিবাহিত সম্পর্কে, (২) পরাশরের বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নয়, (৩) পরাশরের বচন বিবাহ সিদ্ধ করার জন্য, বিবাহ-নিষেধাত্মক নয়, (৪) বৃহৎ পরাশর সংহিতাও বিধবা-বিবাহ নিষেধ করে না, (৫) পরাশর সংহিতাতে পতিতা ভার্যা ত্যাগ নিষেধ বা পতিত পতির প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নেই, (৬) বাগ্‌দানের পর বর নিরুদ্দেশ হলে কন্যার পুনরায় বিবাহের নিষেধ নেই, (৭) কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পরাশরের বিবাহবিধি নীচজাতিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, (৮) বিধবা কন্যাকে পুনরায়

দান করা শাস্ত্রসম্মত, (৯) বিধবার বিবাহকালে পিতার গোত্র উল্লেখ করে দান করার বিধি আছে, (১০) প্রথম বিবাহের মন্ত্র দ্বিতীয় বারেও প্রযোজ্য, (১১) দেশাচার শাস্ত্রের থেকে বেশী মান্য নয়।

প্রতিবাদের প্রধান বিষয়গুলি থেকে দেখা যাচ্ছে পন্ডিতদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল পরাশর-সংহিতা ; কারণ এতেই বিধবা-বিবাহের স্পষ্ট সমর্থন আছে। পরাশর সংহিতাকে কোনও ক্রমে অবস্থানের দিক থেকে দুর্বল করতে পারলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তাই পরাশর সম্পর্কে তিনটি প্রধান আপত্তি, বিদ্যাসাগর বিশেষ গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করে, তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তির সাহায্যে খন্ডন করেছিলেন। পন্ডিতদের বক্তব্যগুলি ছিল. (১) পরাশর কেবল কলিযুগের জন্যই বিধান দেননি, চার যুগের সব কয়টির জন্যই বিধান দিয়েছেন। (২) পরাশর মনুবিরোধী মত প্রকাশ করেছেন, এবং পরাশর-প্রদত্ত বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধ। (৩) পরাশর 'নষ্টে মৃতে' শ্লোকটিতে বাগ্‌দত্তা সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে, বিধবাদের সম্পর্কে নয়।

বিদ্যাসাগর কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে শাস্ত্রের বিচার না করে সামগ্রিকভাবে সমস্ত শাস্ত্র এবং তাদের তুলনামূলক গুরুত্ব বিচার করেছেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপ্তি আছে, যার ফলে তাঁর যুক্তিগুলি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রতিবাদীদের বক্তব্যে সেই ব্যাপ্তি নেই। দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পরাশর-সংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র নয়,—এই বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য প্রতিবাদীরা বলেছেন যে আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয় ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ কলিপূর্ববর্তী যুগের প্রচলিত প্রথা এবং কলিযুগে নিষিদ্ধ। কিন্তু পরাশর-সংহিতায় এই প্রথাকে কলিযুগের প্রথা বলে বলা হয়েছে। সুতরাং পরাশর-সংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র নয়। দ্বিতীয়ত, পরাশর-সংহিতার শুধু প্রথম দুই অধ্যায়েই কলিযুগের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই দুই অধ্যায় ছাড়া অন্যান্য অধ্যায়গুলি কলিযুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রসঙ্গত 'নষ্টে, মৃতে' শ্লোকটি চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। তৃতীয়ত, পরাশর-সংহিতায় অন্য যুগ সম্পর্কে উল্লেখ আছে বলে এটিকে শুধু কলিযুগের শাস্ত্র বলা চলে না।

এই বক্তব্যের উত্তরে বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি অনুসরণ করলে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা সহজ হবে। আদিপুরাণ, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণে অশ্বমেধ ছাড়াও মহাপ্রস্থান গমন, অগ্নিপ্রবেশ, সমুদ্রযাত্রা, বিবাহিতার বিবাহ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় কলিযুগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রমাণ আছে যে নিষেধ সত্ত্বেও এগুলি কলিযুগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলিযুগের প্রথমে পান্ডবরা অশ্বমেধ ও মহাপ্রস্থান গমন করেন। এ ছাড়া শূদ্রক নামে এক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কহ্লনের "রাজতরঙ্গিণী"-তে মিহিরকুলের অশ্বমেধ, সমুদ্রযাত্রা, অগ্নিপ্রবেশ ইত্যাদির উদাহরণ পাওয়া যায়। সুতরাং কলিযুগে আদিত্যপুরাণ ইত্যাদির বিধান মানা হচ্ছে না। বরং পরাশর-প্রদত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ ছাড়াও ব্রাহ্মণের অশৌচ-সংক্ষেপ ইত্যাদি কয়েকটি বিধান যা কলিপূর্বযুগে মানা হোত, তা কলিযুগেও মানা হচ্ছে। আদিত্য ইত্যাদি পুরাণের বিধান যখন মানা হচ্ছে না, পরাশরের বিধান যখন প্রচলিত আছে, তখন সেই পুরাণগুলিকে কোনক্রমেই পরাশর-সংহিতারথেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যায় না। বাস্তব অবস্থা বিচার করে শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করা যায়। কলিযুগে পরাশর-সংহিতা যেহেতু মানা হয়েছে, সেইজন্য এই শাস্ত্রই কলিযুগের শাস্ত্র।

দ্বিতীয় বক্তব্যের উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, যে প্রথম দুই অধ্যায় ছাড়া অন্য অধ্যায়গুলিতে উল্লেখ নেই বলেই যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে একথাও স্মরণ করা দরকার যে, পরাশর-সংহিতা প্রথম দুটি ছাড়া অন্য অধ্যায়গুলিকে পরাশর সংহিতা কলিপূর্বযুগের শাস্ত্র বলেও উল্লেখ নেই। সুতরাং এই অধ্যায়গুলিকে "কলি-পূর্বযুগের শাস্ত্র বলে মানা যেতে পারে না। তাছাড়া প্রথম অধ্যায়েই কলির ধর্মাচরণ সম্পর্কে বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে বলেই প্রত্যেক অধ্যায়ে কলিযুগের উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া, পরাশর যখন অন্যযুগের ধর্ম উল্লেখ করেছেন, তখন তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল কলিযুগের সঙ্গে অন্য যুগের পার্থক্য দেখানো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের, সমাজের ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটে। তাই বিভিন্ন যুগের আচরণীয় ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন। যুগের বিবর্তনে শক্তিহ্রাস হয় বলে শাস্ত্রকার স্বীকার করেছেন। সত্যযুগের মানুষের ধর্মাচরণ কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ মানুষের শক্তি বেশী ছিল। কলিযুগের ধর্মাচরণ অপেক্ষাকৃত সহজ। পাপের ক্ষেত্রেও তাই। আগে স্বল্প বিচ্যুতিতেই পাপ হোত ; কলিতে মানুষের শক্তি কম বলে গর্হিততর কাজেই পাপ হয়। পরাশর চারযুগের অবস্থার তুলনা করেছেন কেবল কলিযুগের ধর্মাচরণের পরিপ্রেক্ষিতটিকে স্পষ্ট করার জন্য। সুতরাং তাঁর বিধান কলিযুগের জন্য। এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদীর যুক্তিকেই শুধু খন্ডন করা হোল না, পরাশর-সংহিতাকে দৃঢ়ভাবে একটি বিশেষ কালের ও বিশেষ সামাজিক অবস্থার শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হোল। কলিযুগে হৃতশক্তি মানুষের কষ্ট সহ্য করার শক্তি কম বলে বৈধব্য-যন্ত্রণা আজীবন সহ্য করা সম্ভব নয়, ইঙ্গিতে এই বক্তব্যটিকেও তুলে ধরা হয়েছে।

যুগ ও সমাজের দৃঢ় অবস্থান থেকে বিদ্যাসাগর প্রতিবাদীদের যুক্তি অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়াসে খন্ডন করতে পারলেন। 'মনুস্মৃতি'কে বেদে বলা হয়েছে মহৌষধ[১১], অর্থাৎ প্রধান শাস্ত্র। সুতরাং মনুর সঙ্গে সংঘাত হলে পরাশর-সংহিতা মান্য হবে না। কিন্তু 'মনুস্মৃতি' সত্যযুগেব শাস্ত্র এবং পরাশর-সংহিতা কলিযুগের। কিন্তু বেদে কালের উল্লেখ নেই। কালভেদে মানুষের শক্তিভেদ আছে। সুতরাং মনুস্মৃতি অবশ্যই সত্যযুগের মানুষের পক্ষে মহৌষধ, অর্থাৎ প্রধান, কলিযুগের স্বল্পশক্তি মানুষের পক্ষে নয়। বাস্তব অবস্থা বিচার করলে মনুস্মৃতি কলিযুগের শাস্ত্র হতে পাবে না। মনুর বিধান[১১] অনুসারে ত্রিশ বৎসরের পুরুষ বার বৎসরের মেয়েকে বিবাহ করবে এবং চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের মেয়েকে বিবাহ করবে। মনুর বিধান, এই নিয়ম ভ্রষ্ট হলে ধর্মভ্রষ্ট হবে। কিন্তু কলিযুগে আট, নয়,ও দশ বৎসরই বিবাহের বয়স। এই নিয়মই পালন করা হয় এবং তাতে ধর্মভ্রষ্ট হতে হয় না। সুতরাং মনুর বিধান অমান্য করলেও বাস্তব অবস্থায় ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। এইভাবে পরাশর-সংহিতাকে মনুস্মৃতি থেকে রক্ষা করলেন বিদ্যাসাগর। সেই সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গৃহীত না হলে শাস্ত্রবিধান কার্যকরী করা দুষ্কর—এই সত্যটিও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

প্রতিবাদীদের যুক্তিখন্ডনে বিদ্যাসাগর তর্কশাস্ত্রের যুক্তিধারাকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। কলিযুগে আদিপুরাণ, ক্রতু, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ[১১] সাধারণভাবে (ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় সামান্যাকারে) একবার বিবাহিতা হলে স্ত্রীলোকের পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু এইভাবে সার্বিক নিষিদ্ধকরণ মানুষের সমাজে, কোনও বিশেষ ও গুরুতর কারণ ব্যতীত অচল। পরাশর

তাঁর "নষ্টে মৃতে" শ্লোকটিতে পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে বিধান দিয়েছেন। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেগুলি "সামান্যাকারে" দেওয়া বিধানের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে বিধবার বিবাহ সিদ্ধ হবে না। কাত্যায়ন ইত্যাদি সংহিতাকর্তারা কোনও যুগ উল্লেখ না করে বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিধানে যুগের উল্লেখ না-থাকাতে আদিপুরাণ ইত্যাদি যখন বিশেষভাবে কলিযুগের জন্য বিধবা-বিবাহ সামান্যাকারে নিষিদ্ধ করল, তখন আদিপুরাণ ইত্যাদির বিধানই মান্য হোল। কিন্তু পরাশর-সংহিতা কলিযুগেই পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করলেন। বিধান দিলেন, এই পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ। কারণ ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে, "সামান্য-বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান হয়, অর্থাৎ যে যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ খাটে"।[১৫] বিদ্যাসাগর একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর যুক্তিটি প্রাঞ্জল করেছেন। বেদে দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনার বিধান দেওয়া আছে ; কিন্তু জাবালি অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দনা নিষেধ করেছেন। বেদে পশুহিংসা নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐ বেদেই বিশেষ বিধিদ্বারা যজ্ঞে পশুহিংসার বিধান দেওয়া আছে। সেইরূপ কলিযুগে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও পরাশর-নির্দিষ্ট পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে বিদ্যাসাগর, আদিপুরাণকে স্বীকার করে নিয়েও, পরাশরের বিধানকে কলিযুগের বিধান রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

৫

শাস্ত্রনির্ভর কুযুক্তিগুলিকে খন্ডন করতেই বিদ্যাসাগর মনোযোগ দিয়েছিলেন বেশী এবং শাস্ত্রবিধানেই তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থন পেয়ে গিয়েছিলেন। তবুও তিনি সমস্যাটির সামাজিক ও মানবিক যুক্তিগুলিকে আদৌ উপেক্ষা করেন নি। অল্পবয়সী বিধবাদের সারাজীবন নানা বিধিবিধান, আচার-বিচারের দ্বারা কন্টকিত এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়। গভীর সহানুভূতিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না। দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।" মানবিক দুর্বলতা শাস্ত্রীয় বিধানের কঠোরতার দ্বারা দমন করলে তার ফল সমাজের পক্ষে ভাল হয় না। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষে এবং ভ্রূণহত্যা-পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।" দেশের ও সমাজের এই অবস্থায়, "দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও ধর্ম"।[১৬] বিদ্যাসাগরের মতে এইরূপ দেশ দুর্বল স্ত্রীজাতির পক্ষে অনুপযুক্ত স্থান।

শাস্ত্রের বিধান হয়ত স্ত্রীজাতির উপর সাধারণভাবে খুব নিষ্ঠুর নয়, কিন্তু দেশাচার বা লৌকিক রক্ষা শাস্ত্রের বিধানকে অগ্রাহ্য করে সমাজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে শাস্ত্রীয় বিধানের গ্রহণযোগ্যতা কমে গিয়ে দেশাচার প্রবল হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের কথায়, "দেশাচারই এদেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা, দেশাচারই এদেশের পরমগুরু, দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।[১৭] কিন্তু এই দেশাচার প্রকৃতপক্ষে কী এবং

তার শক্তির উৎসই বা কোথায়? হিন্দুশাস্ত্রগুলি যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় সামাজিক রীতিনীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এক যুগের বা সময়ের সামাজিক ব্যবস্থায় যে শ্রেণী ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাবলে সমাজের অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির মানুষের উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করে, শাস্ত্রকার ঋষিরা সাধারণত তাঁদের পৃষ্ঠপোষকশ্রেণীর সেই অবস্থান বজায় রেখে এবং তাঁদের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ না করে শাস্ত্রীয় নীতি ও আচরণবিধি ইত্যাদি নির্ধারণ করেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে কিংবা বহিরাগত মানুষের বা বিজয়ী শক্তির আগমনে যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে, তার ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটি সুবিধাজনক শৃঙ্খলা বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তনের সময় পুরাতন শাস্ত্রীয় বিধান সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না বলে নতুন বিধান সৃষ্টি হয়। সেগুলি শাস্ত্রের অনুমোদিত নয় বটে, কিন্তু সমাজের শক্তিশালী জনগোষ্ঠী বা শ্রেণী সেগুলিকে তাদের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করে সমর্থন করে। দেশাচার কখনও চলতি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কর্তৃত্বকারীর স্বার্থ রক্ষা করে চলে ; কখনও বা আগ্রাসী ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বাঁচাতে আত্মরক্ষামূলক এবং পরিশেষে আত্মপীড়নমূলক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে দেশাচার সাধারণত অনেক বেশী বাধানিষেধের দ্বারা সমাজকে সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত করে রেখেছিল। বস্তুতপক্ষে, শাস্ত্র যেখানে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ দিতে অক্ষম, সেখান থেকেই দেশাচারের শুরু। শাস্ত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে না ; দেশাচার সমসাময়িক প্রয়োজনকে কতকগুলি আচারের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়। দেশাচারের পৃষ্ঠপোষকরা দেশাচারকে শুধু শাস্ত্রসম্মত নয়,ধর্মরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। বিদ্যাসাগর তাই ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন "হা ধর্ম, তোমার মর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয় কিংবা কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান।"

ক্ষুব্ধ-ব্যথিত বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত ধর্মের নামে, দেশাচারের নামে, অমানবিক আচার বন্ধ করার জন্য মনুষ্যত্বের নিকট আবেদন জানিয়েছেন, এবং মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন।

বিদ্যাসাগরের আবেদন ব্যর্থ হয়নি। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর যে বাদানুবাদের ঝড় উঠেছিল, তা প্রথমদিকে পণ্ডিতসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে সেই বিতর্কের উত্তেজনা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কবিতা-গান-ছড়ার মাধ্যমে শুধু শহরে নয়, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও বিধবাবিবাহের উত্তাপ মানুষকে স্পর্শ করল।[১১] শান্তিপুরের তাঁতীরা শাড়ীর পাড়ে সুতো দিয়ে বিদ্যাসাগরের নামে ছড়া বুনলেন। স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পক্ষে-বিপক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠল। বিবাহ-বিরোধীদের মধ্যে প্রধান ছিল ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর', সমর্থকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। এই পত্রিকায় (১৩৯ সংখ্যা) বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরের সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিধবা-বিবাহকে সমর্থন জানানো হয়। কলকাতা ও মফঃস্বলের সমস্ত পত্রপত্রিকাই এই বাদানুবাদে অংশগ্রহণ করেছিল। 'ভদ্রলোক' সমাজের এই উত্তেজনা ধীরে ধীরে কলকাতার শ্রমজীবী সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বাংলাদেশের জনচিত্তকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল, এর পূর্বে কোনও আন্দোলন তা করতে পারেনি।

কিন্তু বিদ্যাসাগর জানতেন যে শাস্ত্রীয় যুক্তিতে বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ প্রতিপন্ন হলেও আইনের দ্বারা সমর্থিত না হলে এই বিবাহ প্রচলিত হবে না। তাই আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সই-সম্বলিত দরখাস্ত পাঠাতে শুরু করলেন। বিদ্যাসাগরের এবং সঙ্গে প্রায় একহাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ, একটি দরখাস্ত পাঠানো হোল ব্যবস্থাপক সভার নিকট, ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে (নাম ছিল 'Marriage of Hindu Widows') সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের পাঠিয়ে দেন ; নিজেও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে তাঁদের সন্দেহ ও আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করেন। হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করলে হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে উঠবে,—সরকারের এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। সরকার এই অজুহাতে সংস্কারমূলক আইন পাস করা থেকে বিরত থাকত। কিন্তু সমস্ত আইনের কার্যকারিতা এক ধরনের ছিল না। 'সতী'প্রথা রোধের জন্য যে আইন, তা ছিল Compulsory law অর্থাৎ মানুষ এই আইন মানতে বাধ্য এবং না মানলে শাস্তি পেতে পারে। কিন্তু বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইন ছিল Permissive law অর্থাৎ এই আইন মানা বা অমান্য করা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মূলকথা, বিধবার বা তার অভিভাবকের মতের বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

১৮৫৫ সালে ১৭ই নভেম্বর বিধবা-বিবাহ আইনসঙ্গত করার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি আনলেন জে. সি. গ্রান্ট। তিনি ছিলেন আইনবিষয়ক সদস্য। ১৮৩৭ সালের Law Commission-এর সদস্য হিসাবে এবং পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতায়, তিনি বাল-বিধবা সমস্যার সামাজিক ও আইনগত দিক সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সুতরাং বিলটিতে, শুধু বিবাহ সিদ্ধ করা ছাড়াও, উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রশ্নটি আইনের দ্বারাই সমাধান করা হোল। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল' দল বিধবা-বিবাহের যে একটি নির্দিষ্ট বিধি প্রচলনের সুপারিশ করেছিলেন তা কিন্তু গ্রাহ্য হোল না। তাদের মতানুসারে বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী দুটি অঙ্গীকারপত্রে সই করবে এবং বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে এই অঙ্গীকারপত্র দুটি রেজেস্ট্রী করা হবে। তাদের বিবাহিত জীবনে অঙ্গীকারপত্রের চুক্তি বলবৎ থাকবে। বিলটির আলোচনা চলাকালে, ১৮৫৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি, ইয়ং বেঙ্গল দলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র ইত্যাদি প্রায় ৩৭৫ জনের স্বাক্ষরিত একটি সংশোধনী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রীয় বিবাহের স্তরেই রাখতে চেয়েছিল ; সিভিল ম্যারেজ হিসাবে গণ্য করে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলদের বেশী ক্ষোভের লক্ষ্য হতে চায়নি।

প্রতিবাদীরা সংখ্যার দিক থেকে কম ছিলেন না। বর্ধমানের মহারাজা বিধবা-বিবাহ সমর্থনে স্বাক্ষর করলে বিদ্যাসাগর আনন্দিত হয়ে জে. পি. গ্রান্টকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "It is really a matter for congratulation that the first man of Bengal is going to take up the cause." কিন্তু ব্যক্তির গুরুত্ব যত বেশী হোক্ না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের গুরুত্বকে একবারে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তাছাড়া লক্ষণীয় যে, সেই সময় বর্ধমান ও কৃষ্ণনগর রাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট এবং তাঁরা প্রজাদের মতামতও অনেকাংশে প্রভাবিত করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিবাদীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাধাকান্ত দেব বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে

দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন, তাতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৭ হাজার।[২০] বিহারীলালের মতে বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা ছিল ৫০/৬০ হাজারের মতো। দরখাস্ত এসেছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বিবাহের পক্ষে যেমন ছিল, তেমনি বিপক্ষেও। সেকেন্দ্রাবাদ, পুনা, সাতারা, ধারওয়ার,. বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকগুলি আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছিল।[২১]

ভৌগোলিক বিস্তৃতির বিচারে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব দরখাস্ত এসেছিল, তার মধ্যে বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। জে. পি. গ্রান্ট ব্যবস্থাপক সভায়, ১৮৫৬ সালের ১২ই জুলাই জানিয়েছেন, "I believe there are upwards of 40 petitions against the Bill signed by, from 50,000 to 60,000 persons; in favc r of the Bill there are upwards of 25 petitions, signed by more than 5000 persons."[২২] বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা দেশাচারের শক্তিকে প্রমাণ করে দিল। সরকার বিরুদ্ধবাদীদের মতামত উপেক্ষা করেছিলেন, কারণ আইনটি ছিল Permissive law ; এর দ্বারা হিন্দুধর্মের আচারে কার্যকরী ভাবে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না। বিদ্যাসাগরও দেশে রক্ষণশীলদের শক্তির একটা আভাস পেলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সমাজ সম্পর্কিত চিন্তার উপরও কিছু ছায়া বিস্তার করেছিল।

১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই আইন (Act XV of 1856) পাস হোল। আইন পাস হওয়ার পরেই সমাজে বিধবা-বিবাহ, অন্তত বাল্য-বিধবাদের বিবাহ শুরু হল না। উচ্চবর্ণে, বিশেষ করে কুলীনদের মধ্যে বাল-বিবাহের সংখ্যা মোটেই অল্প ছিল না। কিন্তু তবুও বিধবা-বিবাহের কোনও উদ্যোগ দেখা গেল না বলে বিদ্যাসাগরই এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন। চব্বিশপরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বর্ধমান জেলার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা কালীমতির বিয়েই আইন পাস হবার পর প্রথম বিধবা-বিবাহ। এই বিয়ের সমস্ত ব্যয়[২৩] বহন করেছিলেন বিদ্যাসাগর, এবং বিয়ে হয়েছিল তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে। শহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি[২৪] উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদীদের আক্রমণ আশঙ্কায় পুলিশ-বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। যথেষ্ট প্রচার সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বিধবা-বিবাহ দিতে বিশেষ অনুপ্রাণিত হলেন না। এই ঔদাসীন্যকে মেনে নিয়ে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকার মতো মানুষ ছিলেন না বিদ্যাসাগর। নিজেই অর্থব্যয় করে বিধবা-বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিলেন তিনি। সেই সময় কলকাতার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার জন্য অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যাই হোক, রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো থেকে শুরু করে প্রায় শতাধিক বিধবা-বিবাহের সমস্ত খরচ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিবাহের খরচ এবং প্রয়োজনে গহনা ইত্যাদি দিচ্ছেন শুনে অনেকেই বিধবা-বিবাহের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হতে শুরু করলেন। ফলে বিদ্যাসাগরের খরচ বেড়ে গেল। তাঁর নিজের উপার্জনের টাকায় ব্যয়-সঙ্কুলান হল না বলে তিনি ধার করতে বাধ্য হলেন। যাঁরা তাঁকে অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের আর দেখা পাওয়া যায়নি। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন, "এ সকল কাজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবা-বিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে (ঋণ)

পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন"।[২৫] দুর্গাচরণ তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পরে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেন। কেউ কেউ আবার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে বিধবা-বিবাহ প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে নি বলে তাঁরা অর্থসাহায্য দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।[২৬] বিভিন্ন অজুহাতে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কথার খেলাপ করেছেন। বিদ্যাসাগর স্থিরচিত্তে মেনে নিয়েছেন ; কিন্তু নিজের লক্ষ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হননি। এই প্রসঙ্গে ১৮৬৭ সালে (৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪) "সোমপ্রকাশে"[২৭] প্রকাশিত একটি চিঠির কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের "প্রায় ৬০টি বিবাহ দিতে ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। মৃত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন স্বদেশহিতৈষী সাহায্য করেন এই মাত্র। ইহাতে প্রায় ৪২ হাজার টাকা উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ভাবিয়াছিলেন অন্য অন্য সকলে এই প্রকার সাহায্য করিবেন। কিন্তু চাঁদা-পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া টাকা না-দেওয়া অধিকাংশ লোকের যে রোগ আছে, এস্থলে তাহার কার্য হইয়াছে। বিদ্যাসাগর ৩৫ হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। মাসে মাসে ৫ হাজার টাকা করিয়া সুদ দিতে হইতেছে"।

এই সময় বিদ্যাসাগরের আয়ের উৎস ছিল তাঁর রচিত বইগুলির 'রয়্যাল্টি' এবং সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরী। এই আয়ের উপর নির্ভর করে তাঁকে তাঁর বৃহৎ সংসার, আত্মীয়-স্বজন ও দুঃস্থ মানুষকে নিয়মিত সাহায্য এবং সর্বোপরি বিধবা-বিবাহের খরচ চালাতে হোত। তাঁর আর্থিক অবস্থা এতই সঙ্গীন হল যে, তাঁকে বাংলার গভর্নর সিসিল বিডনের নিকট একটি চাকুরির জন্য অনুরোধ করতে হল। বিডন অবশ্য প্রায় একবছর আগে বিদ্যাসাগরকে একটি চাকুরি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিদ্যাসাগরের অনুরোধ। বিডনের পক্ষে আশু এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হোল না। তবে বছর তিনেক পরে তিনি বিদ্যাসাগরকে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ঐ পদের মাইনে হবে সমমর্যাদার ইউরোপীয় অধ্যাপকের মাইনের থেকে কম। স্বাভাবিক ভাবেই আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে এরূপ প্রস্তাব বিদ্যাসাগর গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি বিডনকে এ সম্পর্কে অন্য চেষ্টা করা থেকেও বিরত থাকতে বললেন।[২৮] বিদ্যাসাগর তাঁর আয় থেকেই ঋণশোধের দায়িত্ব নিলেন ; কিন্তু বিধবা-বিবাহে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বন্ধ করলেন না।

বিদ্যাসাগরের ঋণ সম্পর্কে কলকাতার শিক্ষিতসমাজের এক অংশ অন্ততঃ সচেতন ছিল। বিদ্যাসাগরের ঋণশোধের জন্য "হিন্দু পেট্রিয়ট," "এডুকেশন গেজেট" প্রভৃতি পত্রিকার তরফ থেকে একটি চেষ্টা হয়েছিল। ১৮৬৭ সালের মে মাসে এই পত্রিকাগুলি জনসাধারণের নিকট চাঁদা তুলে বিদ্যাসাগরের ঋণপরিশোধের একটি প্রস্তাব রাখে। বিদ্যাসাগর এই সময় পারিবারিক কারণে অনেকদিন বীরসিংহে ছিলেন। কলকাতায় ফিরে হিন্দু পেট্রিয়টের উদ্যোগের খবর শুনে এবং পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেখে তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেন। জনসাধারণের নিকট চাঁদা তুলে তাঁর ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করা হবে, এই ধরনের প্রস্তাবই তাঁর পক্ষে আত্মমর্যাদা-হানিকর। "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রকাশিত তাঁর প্রতিবাদপত্রে লিখলেন, "কয়েকটি বন্ধুর অর্থসাহায্য এবং যত অল্পই হউক আমার নিজ আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এযাবৎ সংস্কারের পথে চলিয়া আসিতেছি ; এবং আশা আছে এখনও এইরূপ চলিতে পারিব"।[২৯] বিদ্যাসাগরের ঋণ মোট কত

হয়েছিল তাঁর আভাস তিনি চিঠিতে দেননি, তবে প্রথম বিবাহ দিতে যে দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল তা উল্লেখ করেছেন। মফঃস্বলের বিধবা-বিবাহে বিয়ের খরচ ছাড়াও যে নানারূপ দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলায় জড়িত হতে হয়েছিল ফলে খরচ বেড়ে যাচ্ছিল, সে কথাও উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর ঋণের সমস্ত দায় নিজের উপর নিয়েছিলেন, কারণ বিধবা-বিবাহ সংস্কার-কাজে তিনি একাই উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেই কারণে তিনিই ঋণ করেছিলেন। সুতরাং তিনিই সব ঋণ শোধ করবেন। এই চিঠি লেখার সময় তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল ২২/২৩ হাজার টাকার মত। কিন্তু সেই সময় তিনি অনেক ঋণ শোধ করে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর কতগুলি বিধবা-বিবাহ দিয়েছিলেন? চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "শতাধিক বিধবা-বিবাহ তিনি নিজব্যয়ে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন"।[৩০] এই সমস্ত বিয়ের কাপড়-গহনা ইত্যাদি বিদ্যাসাগর কিনে দিতেন, অনেক সময় আনুষঙ্গিক দানসামগ্রীও। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে জিনিসপত্র, গহনাগাঁটি ইত্যাদির লোভে স্ত্রী বর্তমানেও আবার বিয়ে করেছিল,—এইরূপ কয়েকটি ঘটনা বিদ্যাসাগরের নজরে আসায় তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক দুঃখের কারণ হয়েছিল।

বিবাহিতা বিধবারা আইনের দিক থেকে স্ত্রীর মর্যাদা, দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার, সন্তানের উত্তরাধিকার ইত্যাদি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা তাঁরা সহজে পাননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনরাও তাঁদের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব রাখতেন ; কখনও কখনও বা জাতিচ্যুত বলে মনে করতেন। এইসব কারণে বিধবা-বিবাহ বর্ণহিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। বস্তুতপক্ষে অনেকদিনের দেশাচার সহজে ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ এই সংস্কারের দুর্বলতার দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।[৩১] তর্কবাগীশের মতে সমাজের সব "বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমন্ডলীকে" স্বমতে না আনতে পারলে "অপরিণাম-দর্শী নব্যদলের" কয়েকজনকে নিয়ে কোনও কাজ হবে না। তর্কবাগীশ সারাদেশের লোককে বোঝানোর জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কথা বললেন। "ইহাতে কালবিলম্ব ঘটিবে, কিন্তু সময়ের স্রোত তোমার অনুকূলেই বহিবে"। লোকবলের নিকট অর্থাভাব অনুভূত হইবে না। বিদ্যাসাগর তর্কবাগীশের উপদেশ অগ্রাহ্য করেন, কারণ তাঁর নিজের কথায় "এই বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ মন্ডলীর "অনেককেই নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিযাছি। সকলেই ক্ষীণ-বীর্য ধর্ম-কঞ্চুকে সংবৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি"। বিদ্যাসাগর মনে করতেন এই ক্ষীণ-বীর্য ব্যক্তিদের ইংরেজ সরকারের আইনের দ্বারা বিধবা-বিবাহ স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা যাবে, যেমন হয়েছিল সতীপ্রথা নিবারণ করার সময়ে। বিদ্যাসাগরের ধারণা সঠিক ছিল না।

বিদ্যাসাগর জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বিধবা-বিবাহের জন্য ব্যক্তিগত সমর্থন ও সাহায্য দিতে কার্পণ্য করেন নি। শ্রীহট্টের বালবিধবাদের বিবাহ দেওয়ার জন্য একটি স্থানীয় সংস্থাকে, ১৮৯০ সালের মার্চ মাসের "বামাবোধিনী পত্রিকা" অনুসারে, ৫০০ টাকা দান করেছিলেন। সন ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসের "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি তথ্যে জানা যাচ্ছে যে সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে একাশিটি (৮১) বিধবা-বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে "ভারতী" পত্রিকা মন্তব্য করেছে যে, "বিধবাবিবাহ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে।" কিন্তু 'ভারতী'র এই আশাবাদী মন্তব্যের বাস্তব ভিত্তি খুবই দুর্বল। সমসাময়িক ব্যক্তি ও পত্রপত্রিকার মতামত বিচার করলে একথা স্পষ্ট হয় যে, বিদ্যাসাগরের

জীবদ্দশাতেই বিধবা-বিবাহের প্রতি আগ্রহ দ্রুত কমে গিয়েছিল এবং আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই প্রায় নিঃসঙ্গ যোদ্ধা তাঁর চিন্তার অবস্থান এবং কর্মের উদ্যোগ থেকে বিচ্যুত হননি। এই ব্যর্থতার প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি পুত্র নারায়ণের বিধবা-বিবাহের সিদ্ধান্তে খুশী হয়েছেন এবং দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, "বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। ...... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব ; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না"।[৩২]

রক্ষণশীল জমিদার ও ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশাচারের শক্তিই প্রবল হোল। বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী শাস্ত্রব্যাখ্যা, তাঁর মানবিক আবেদন গ্রাহ্য হোল না। তবুও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ছিল এক অভূতপূর্ব সংস্কার-চেষ্টা। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই সংস্কারের প্রাণ। তিনি এর শাস্ত্রীয় সমর্থন আবিষ্কার করেছেন, তিনি প্রতিবাদী যুক্তি খন্ডন করেছেন, বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার করেছেন, আইন-প্রণয়নের জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের স্বমতে এনেছেন, নিজের খরচে বিধবাদের বিয়েও দিয়েছেন। তবুও বিদ্যাসাগরের অভূতপূর্ব আন্দোলনের সাফল্য ছিল খুবই সীমিত। এই আন্দোলন ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন একজন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হলে সে আন্দোলনের অনেক সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠান-নির্ভর ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না ; সুতরাং তাঁর আরব্ধ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিজের সামর্থ্য ও কর্মোদ্যোগের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রখর ছিল যে. নীতিগত কোনও বিষয়ে সহমত বা সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হোত না। এই আপসহীনতায় অনেকের নিকট আগ্রাসী ব্যক্তিত্ব[৩৩] বলে প্রতিভাত হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, তিনি তাঁর লক্ষ্য এবং কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে আপসহীন ছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের চিন্তা অপরের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ এবং মতামতের দৃঢ়তার[৩৪] জন্য অনেকের সহযোগিতায় কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বা কোনও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিধবাবিবাহের সপক্ষে যে জনমতের প্রকাশ ঘটেছিল, তা শেষ পর্যন্ত অসংগঠিতই রয়ে গিয়েছিল।

৬

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তবুও কিছু সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু বহুবিবাহরোধে বিদ্যাসাগরের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। রামমোহনের 'আত্মীয়সভাতে' অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার সঙ্গে বহুবিবাহ ও কুলীন প্রথা বিষয়েও আলোচনা হয়েছিল। রামমোহন ১৮১২ সালে তাঁর "Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females," নামক রচনায় বহুবিবাহকে নারীমুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় বহুবিবাহের বিষয়ে মতামত প্রকাশিত হলেও[৩৫] এই প্রথার বিরুদ্ধে কোনও সুসংহত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। ১৮৫৫ সালে 'সমাজ উন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতির" পক্ষে কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং অক্ষয়কুমার দত্ত উদ্যোগ নিয়ে বহুবিবাহরোধে

ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আবেদনে জানালেন, "বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য; তাহা রহিত হইলে হিন্দুদের ধর্মলোপ হইবেক"।[৩৬] বিদ্যাসাগর এই সময়ে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত ; তবুও প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, আর একটি আবেদনপত্রে বহুবিবাহরোধে আইন-প্রণয়নের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। "The remedy though obvious and perfectly consistent with the Hindu Law, cannot, in the present disorganised state of the Hindu society, be applied by the force of public opinion or any other power than that derived by the Legislature."[৩৭] বর্ধমানের মহারাজা ইত্যাদির স্বাক্ষরযুক্ত এই আবেদনটি পাঠাবার পরেই, ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে, ১২৭টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। প্রায় ২৫ হাজার স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ছিলেন "নবদ্বীপ, দিনাজপুর, নাটোর, দিঘাপতিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজারা এবং দেশস্থ প্রায় যাবতীয় প্রধান লোক"।[৩৮] তৎকালীন আইনবিষয়ক কাউন্সিলর জে. পি. গ্রান্ট আশ্বাস দেন যে, শীঘ্রই বহুবিবাহ-নিরোধক একটি বিল আনা হবে। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে সংস্কার সম্পর্কিত সমস্ত উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে এল। রামমোহনের পুত্র রামপ্রসাদ রায় "নিরতিশয় উৎসাহ ও পরিশ্রমে"[৩৯] এবং গ্রান্টের সঙ্গে পরামর্শমত যে খসড়া-বিলটি তৈরি করেছিলেন, তা-ও হারিয়ে যায়।

১৮৬৩ সালে বেনারসের রাজা দেওনারায়ণ সিং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে আর একটি খসড়া-বিল তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু বিলটি সভায় আসার আগেই দেওনারায়ণের কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগেই[৪০] বাংলাদেশের জমিদার ও বিদ্বান সমাজের একটি প্রতিনিধিদল লেঃ গভর্নর সিসিল বিডনের সঙ্গে দেখা করে বহুবিবাহ-রোধ করার জন্য আইন-প্রণয়নের আবেদন জানান। বিদ্যাসাগর সেই সময় রক্ষণশীল হিন্দুদের নিকট হিন্দুসমাজের অনিষ্টকারী রূপে পরিচিত ছিলেন বলে তিনি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে থাকলেও নেতৃত্ব দিতে চাননি। এবারে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগেই প্রায় ২১ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র পাঠানো হয়। বিডনও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আইন তৈরির সুপারিশ করেন। ভারতের গভর্নর-জেনারেলের মতে বহুবিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হলে তা সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে না। মুসলমান এবং বাংলার বাইরে অধিকাংশ হিন্দু বহুবিবাহ রোধ করার জন্য আইন সমর্থন করবেন না। তবে যদি এমন কোনও আইন তৈরি করা যায়, যার ফলে হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী-গ্রহণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না, অথবা এই আইন হিন্দু-সমাজব্যবস্থায় ইংরেজ-শাসনব্যবস্থার অযথা হস্তক্ষেপ বলে প্রতিভাত হবে না, তা'হলে এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য আইন-প্রণয়নের কথা ভারতসরকার বিবেচনা করে দেখবেন।[৪১] গভর্নর-জেনারেলের এই পরস্পরবিরোধী বাগাড়ম্বরের মধ্যে বহুবিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন পাস করার অনিচ্ছাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রদত্ত শর্ত মেনে বহুবিবাহরোধে কোনও আইন তৈরি হতে পারে না। কিন্তু সরকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়টি নিজের উপর না রেখে ভারতীয়দেরও অংশীদার করতে চেয়েছিলেন, তাই বাংলাসরকারকে বলা হোল যে বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা যেন পেশ করা হয়।

বিডন ৭ জনের একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটির মধ্যে ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন, সি. হবহাউস এবং এইচ. প্রিন্সেপ। পাঁচজন বাঙ্গালী সদস্য হলেন সত্যশরণ ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, রমানাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ছাড়া সবাই ছিলেন জমিদারশ্রেণীর। এঁদের মধ্যে সত্যশরণ ঘোষাল ও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বহুবিবাহরোধে আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারী। কমিটি এ বিষয়ে একমত হোল যে ভারতসরকারের শর্ত মেনে বহুবিবাহরোধে আইন করা সম্ভব নয়। কমিটির তিনজন সদস্য—জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র ও রমানাথ ঠাকুর—আইন-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে নাকচ করে দিয়ে বললেন যে, দেশে শিক্ষাপ্রসার হলে বহুবিবাহ কমে যাবে। বিদ্যাসাগর ঐ তিনজনের মতামতের সঙ্গে সহমত হলেন না। তিনি পৃথকভাবে নিজের মত ব্যক্ত করলেন।[৮২] তাঁর মতে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রথা নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর ভারতসরকারের দেওয়া শর্তের মধ্যেও বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকারী ঘোষণাসূচক একটি আইন (Declaratory Law) পাস করা যায়। সিসিল বিডনও ঐ তিনজন বাঙ্গালী সদস্যের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি স্পষ্ট জানালেন যে, সরকারী আইন ব্যতীত এইরূপ দৃঢ়মূল ও বহুযুগ ধরে প্রচলিত প্রথাকে নির্মূল করা সম্ভব হবে না।

বিদ্যাসাগরের সুপারিশটিও অগ্রাহ্য হোল ; কারণ সেক্রেটারী অফ্ স্টেট এই বিষয়ে আইন পাসে অনিচ্ছুক ছিলেন। যদিও তাঁদের অনিচ্ছার মূলে অন্য কারণ ছিল, তবুও সেক্রেটারী অফ্ স্টেট তাঁর ডেস্‌প্যাচে বললেন যে, 'এমন কি বাংলাদেশেও বেশির ভাগ মানুষ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে নন্"।[৮৩] আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টার এখানেই শেষ হোল।

১৮৬৬ সালেই বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিগুলিকে খন্ডন করে একটি বই লিখতে শুরু করেন। বইটি ছাপাও শুরু হয়। কিন্তু এই সময় বহুবিবাহ বন্ধ করতে সরকারের আইন করার অনিচ্ছার কথা অনুধাবন করে বইটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ১৮৭১ সালে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আবার জল্পনা শুরু হয় এবং এই সময়ে এই প্রথার অবসান ঘটাতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল, "সনাতন ধর্ম-রক্ষিণী সভা"। বিদ্যাসাগর তাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই বইটি দ্রুত প্রকাশ করেন। বিধবা-বিবাহে উদ্যোগ নেওয়ার পর থেকেই বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল হিন্দু ও ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের নিকট হিন্দুবিদ্বেষী বলে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া ১৮৬৬ সালে যাঁরা বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তাঁরা "হিন্দুধর্মবিরোধী" এবং হিন্দুধর্ম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে এই উদ্যোগ করিয়াছে" ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৭১ সালে হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা উদ্যোগ নেওয়ায় উপরিউক্ত অভিযোগগুলির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হবে। সুতরাং এই সময়েই বিদ্যাসাগর সত্বর তাঁর বহুবিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম বইটি প্রকাশ করলেন। লক্ষণীয় যে, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে বিদ্যাসাগরের বিশ্বাসযোগ্যতা যে অনেক কমে গিয়েছিল, সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নিজেই সম্যক সচেতন ছিলেন। তাই বলে তিনি সংস্কার-প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন নি। সবসময় সামনের সারিতে না এসে তিনি বাস্তব-বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে দুটি বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে প্রথম বইটিতে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক যুক্তিগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ-প্রথা ও কৌলীন্যের অত্যাচার কমে যাবে বলে যাঁরা মনে করেছিলেন,

বিদ্যাসাগর শিক্ষার দিক থেকে অগ্রসর একটি অঞ্চলের সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে তাঁদের যুক্তি খন্ডন করেছেন। কলকাতা থেকে ১০/১২ মাইল দূরে হুগলীজেলার জনাই গ্রাম শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল না। এই গ্রামের ৬৪ জন কুলীন ২ থেকে ১০টি বিয়ে করেছেন। হুগলী জেলাও আলোকপ্রাপ্ত জেলাগুলির একটি। এই জেলাতে ৫ থেকে ৮০টি পর্যন্ত বিয়ে-করা ১৩০ জন কুলীনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই সংখ্যাগুলি সমস্যাটির গভীবতা স্পষ্ট করে তুলেছে।

অনেক প্রতিবাদী সরকারী আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ বন্ধ করার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল যে, কালক্রমে শিক্ষা ও চেতনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ-প্রথাও উঠে যাবে। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন দেশাচার-শাসিত হিন্দুসমাজের এই কুপ্রথাগুলি নির্মূল করার উপযুক্ত কোনও শক্তি তখন অবশিষ্ট ছিল না। তাই রাজশক্তির উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "আমাদের ক্ষমতা কোথায়? ক্ষমতা থাকিলে ঈদৃশ বিষয়ে গভর্নমেন্টের নিকট যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না। আমরা নিজেরাই সমাজের সংগঠনকার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম"।[৪৬]

তারানাথ তর্কবাচস্পতি সহ পাঁচজন পন্ডিত সংস্কৃত ভাষায় একটি পুস্তিকা লিখে বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ' রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ে প্রস্তাবের' সমালোচনা করেন। তারানাথের বক্তব্যে আক্রমণের তীব্রতা ছিল। বিদ্যাসাগর তারানাথের বক্তব্য খন্ডন করার জন্য বহুবিবাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। তারানাথের প্রতি বিদ্যাসাগর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শনের' আষাঢ় সংখ্যায় দ্বিতীয় পুস্তকের সমালোচনায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক বক্রোক্তি ও নিন্দা করেছেন।[৪৭] ফলে বঙ্কিমও দেশবাসীর নিকট যথেষ্ট শ্লেষ ও বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের দেওয়া তালিকাটি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথা অনুসারে তালিকায় মৃত ব্যক্তির নামও আছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপ একজনের নামও সংগ্রহ করতে পারেন নি। সুতরাং বিদ্যাসাগরেব দেওয়া তালিকাটি ভুল প্রমাণিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, বাঙ্কিমের আশা ছিল যে, বহুবিবাহ এদেশে "স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিবে ও অল্পদিনে উহা লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা"। বঙ্কিমের এই আশা, বলা বাহুল্য, পূর্ণ হয়নি।

১৮৫৫ সালে বহুবিবাহ বন্ধ করে সরকারী আইন করার জন্য বিদ্যাসাগর আবেদন করেছিলেন। তা গ্রাহ্য হয়নি। এই আবেদনের প্রায় একশত বৎসর পরে শেষ পর্যন্ত আইন করেই বহুবিবাহ-প্রথা বন্ধ করতে হয়েছিল। "অল্পদিনে এটি লুপ্ত হইবার" কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। শুধুমাত্র শিক্ষার দ্বারা এই কুপ্রথা দূর করা যাবে না বলে বিদ্যাসাগর মনে করতেন। হিন্দুসমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল; তাই তিনি আইনের সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করতে উদ্যোগী হযেছিলেন।

৭

সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিদ্যাসাগর শেষবারের মত তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন ১৮৯১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারের সহবাস-সম্মতি-আইনে (Age of Consent Bill)।

'বাল্যবিবাহের দোষ' (১৮৫০) তার প্রথম সমাজবিষয়ক রচনা। এই প্রবন্ধে তিনি শাস্ত্রোক্ত যুক্তি ব্যবহার করেন নি ; বরং অভিযোগ করেছেন যে "লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবস্থার পাশে আবদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহ-নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি"। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি ব্যবহার করেছেন, তা বৈজ্ঞানিক ও মানবিক। "বাল্যবিবাহে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং এইরূপ বিবাহজাত সন্তানেরা দুর্বল ও ক্ষীণজীবী হয় ; এমনকি অনেক সময় গর্ভবাসকালে বা প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাল্যবিবাহের ফলেই বাঙ্গালীরা এবং উড়িষ্যা-প্রদেশবাসীরা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ও মানসিক দিক থেকে ভীরু স্বভাবের। সেইজন্য রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখনও বাংলাদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই"। অপরিণত মানসিকতার জন্য "বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়,—তাহা দম্পতিরা কখনও আস্বাদ করিতে পায় না"।

১৮৫৫ সালে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সময় বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ও দেশাচারের শক্তি সম্পর্কে অনেক সচেতন। "এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ"—এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহের বিষয়ে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিও প্রয়োগ করেছেন। সহবাস-সম্মতি-সংক্রান্ত আইনে তাঁর মতামত দিতে গিয়ে তিনি কেবল শাস্ত্রোক্ত যুক্তির উপরই নির্ভর করেছেন।

সহবাস-সম্মতি বিষয়ক বিলটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় দন্ডবিধি ও ভারতীয় ফৌজদারী আইনের দু'একটি ধারা সংশোধন করে বারো বৎসরের কম বয়সের স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সহবাস বন্ধ করা। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত চাওয়া হলে, তিনি গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও, নানা শাস্ত্র পর্যালোচনা করে সরকারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর যে শাস্ত্রগুলির উপর নির্ভর করে মতামত দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে 'মনুসংহিতা' ছাড়া 'স্মৃতিসারসংগ্রহ' ও "নির্ণয়সিন্ধু" শাস্ত্র হিসাবে বহুল প্রচলিত বা প্রামাণিক নয়।

বিদ্যাসাগরের অসম্মতির কারণ, এইরূপ আইন হিন্দুদের ধর্মীয় প্রথার (Religious usage) বিরোধী বলে গণ্য হবে। এই ধর্মীয় প্রথার সমর্থনে তিনি উল্লিখিত শাস্ত্রগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নাবালিকা স্ত্রীকে স্বামীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর পরামর্শ ছিল এইরূপ ঃ "It will be penal for a man to have intercourse with his wife before she has her first menses. Such a law would not only serve the interest of humanity by giving reasonable protection to child wives, but would so far from interfering with religious usages, enforce a rule laid down in the Shastras."[৪৮]

Religious usage বা বহুদিন ধরে প্রচলিত ধর্মীয় প্রথাকে যুক্তি হিসাবে মেনে নেওয়া এবং শাস্ত্রবচনকে নির্ণায়ক রূপে গ্রহণ করার জন্য বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক অনেকে মনে করেছিলেন যে, শেষজীবনে সমাজ-সংস্কারের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছিল।[৪৯] বিদ্যাসাগর বিলটির উপর মতামত দিয়েছিলেন সরকারের নিকট লেখা একটি চিঠিতে। একটি প্রবন্ধের পরিসরে যেভাবে সমগ্র বিষয়টির বিচার করা সম্ভব হয়, একটি চিঠিতে সে সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকে না। বিহারীলাল লিখেছেন, "অনেকে জল্পনা করিতে থাকেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে পারিয়াছেন"। বিহারীলাল যদিও

আনন্দিত এই কারণে যে অন্তত শেষবয়সে বিদ্যাসাগর ধর্মশাস্ত্রের উপর আস্থা ফিরে পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি একথা মানতে পারলেন না যে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে আপনার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। বিহারীলাল বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ভুলভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন, "বিদ্যাসাগর ভুল করলে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করতেন না, তিনি এইরূপ কপটচারী ছিলেন না"। কিন্তু শুধু সমসাময়িক রক্ষণশীল হিন্দুরাই নন, বিদ্যাসাগরের শাস্ত্র ও religious usage-এর উপর অতিনির্ভরতার জন্য বিনয় ঘোষও তাঁর মধ্যে "স্বশ্রেণীর স্ববিরোধ" দেখেছেন।[৫০] তিনিও মনে করেছিলেন যে, শেষজীবনে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল।

এই বিলটির সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবটি বিচার করে দেখলেই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "যে বিধি স্ত্রী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলেই তাঁহার প্রতি নৃশংস আচরণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে উদ্যত, সে বিধির সমর্থন আমি কোনও প্রকারেই করিতে প্রস্তুত নহি"। এবিষয়ে তাঁর প্রস্তাব "As majority of the girls do not exhibit that symptom (of first menses) before they are thirteen, fourteen, or fifteen, the measure, I suggest, would give much larger, more real and more extensive protection than the bill"[৫১] সুতরাং বিদ্যাসাগরের মতে আইনসম্মত ভাবে সহবাসের বয়স হওয়া উচিত তের, চৌদ্দ, কিংবা পনের। এইভাবে আইনটিতে কিছু নমনীয়তা আনতে চেয়েছিলেন ; সেইসঙ্গে সহবাসকে স্ত্রীর দৈহিক ও মানসিক পরিণতির সঙ্গে যুক্ত করে, বিজ্ঞানসম্মত করাও ছিল তাঁর লক্ষ্য।

সহবাস-সম্মতি আইন, বস্তুতপক্ষে, বাল্যবিবাহের কুফলগুলিকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস মাত্র। সহবাসের বয়স বারো বৎসর করার ফলে হিন্দুসমাজ বারো বৎসরের নিচে কন্যার বিবাহে প্রলুব্ধ হবে না এইরূপ একটা উদ্দেশ্য এই বিলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। বিদ্যাসাগর এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রস্তাবে তিনি এই বয়স বাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিলেন। শাস্ত্রবচনের সাহায্য নিয়ে তিনি যে প্রস্তাব দিলেন, তাতে অনিবার্যভাবে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স হবে তের থেকে পনের বৎসর।

বিদ্যাসাগরের মত, অর্থাৎ শরীর ও মন পুষ্ট না হলে স্বামীর সঙ্গে সহবাস বাঞ্ছনীয় নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক। তাঁর প্রস্তাব বিলের প্রস্তাবের থেকে, অর্থাৎ মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১২ বৎসর করার থেকে, উদার ও যুক্তিনির্ভর। এই প্রস্তাবটি তিনি শাস্ত্রীয় বচনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের লক্ষ্যে শাস্ত্রীয় যুক্তিকে ব্যবহার করেছেন। সহবাস-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অবস্থানে অবিচল ছিলেন। ধর্মীয় প্রথা ও শাস্ত্রবাক্যকে তিনি ব্যবহার করেছেন সহবাসের বয়সকে বারো থেকে তেরো ও পনেরো বছরের মধ্যে তোলার জন্য। সরকার অবশ্য তাঁর মত গ্রাহ্য করে নি। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও যুক্তিবিন্যাসের ধারাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল অপরিবর্তিত। বিভিন্ন কারণে তাঁর সাফল্য সীমিত ছিল বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তায় ও সামাজিক লক্ষ্যে স্ববিরোধিতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও মানবিক প্রশ্নে সমস্ত জীবনব্যাপী এইরূপ স্থির লক্ষ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তার দৃষ্টান্ত বিরল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর, ধর্ম ও বিদ্যাসাগর

১

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত ও ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে যে বির্তক তাঁর জীবদ্দশাতেই ধূমায়িত ছিল, মৃত্যুর পরেও সেই বিতর্কের অবসান ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে এইরূপ একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সহজে একটি সর্বজনমান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো দুরূহ হয়ে ওঠে। তথ্যের অপ্রতুলতা এই ব্যাপারে সর্বপ্রধান বাধা। বিদ্যাসাগর সচেতনভাবে তাঁর রচনায় ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতেন। অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি তাঁর যুক্তিবাদী মনকে আদৌ আকর্ষণ করত না। আলাপ-আলোচনাতেও তিনি এই বিষয়ে স্বল্পবাক্ ছিলেন বলেই জানা যায়। তবুও, বিদ্যাসাগর মজলিসী মানুষ ছিলেন। তাঁর মেছুয়াবাজারের বাসায়, বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রীটের (অধুনা কৈলাস বসু স্ট্রীট) বাড়িতে কিংবা বাদুড় বাগানে তাঁর নিজের বাড়ির দোতলায় প্রায়ই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগমে আলোচনার আসর বসত। সমসাময়িকদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, গুরুতর বিষয়ের বিদগ্ধ আলোচনায় কিংবা সরস কথোপকথনে বিদ্যাসাগরের সমতুল্য ব্যক্তি দুলর্ভ ছিল। দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর দ্বারকানাথ যখন প্রস্থান করলেন, তখন বিদ্যাসাগর সেখানে উপস্থিত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যকে বললেন, " এ কাকে এনেছিলে হে, এ চোখেমুখে কথা কয়, আমাকে থ করে দিল। আমি ত জানতাম যেখানে আমি, সেখানে আর কেউ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপর যায়। " [১] কালক্রমে দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। দ্বারকানাথের বাড়িতে একদিন আলাপ-আলোচনার পর বিদ্যাসাগর প্রস্থান করলে দ্বারকানাথ উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের বললেন. " বাবা রে, এক giant ! দেখলে কেমন বুদ্ধিবিদ্যার দৌড়। মানুষটার যেমন heart তেমনি head।"[২] এইসব আলোচনার আসরে সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম, শাস্ত্র ইত্যাদি আলোচিত হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই আলোচনার কোনও বিবরণ কেউ লিখে রেখে যান নি। রবীন্দ্রনাথ তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে বিদ্যাসাগরের বসওয়েল কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্নতা, সরলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।"[৩] নির্ভরযোগ্য তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক জীবনীকারদের এবং তাঁর পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর নির্ভর করতে হয় বেশি। তাঁরাও আবার আপন আপন মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসেছেন। তবুও এই মতামতগুলি বিশেষ মূল্যবান, কারণ এগুলির

বিস্তারিত এবং নিরপেক্ষ আলোচনার মধ্য দিয়েই বিদ্যাসাগরের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের পরিধি এবং গভীরতার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) বালকবয়স থেকে বিদ্যাসাগরকে চিনতেন, যৌবনে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। কৃষ্ণকমল দ্বিতীয়বার বিবাহ করাতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কিছুদিন মনোমালিন্য হয়েছিল বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা চিরদিনই অটুট ছিল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় দুই দশক পরে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্মৃতিচারণের সময় কৃষ্ণকমল মন্তব্য করলেন, "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধহয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে কথা লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুজ্জ্যের সহিত পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেন; ললিত সে সময় যেন কতকটা যোগসাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ লোকে বলাবলি করিত।[৪]" কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার মধ্যে। তাঁর মতে "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাস টলিল; চিরপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!" কৃষ্ণকমলের এই ব্যাখ্যা কিন্তু সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না; ডেভিড হেয়ারের স্কুলে পড়েন নি। তিনি ইংরাজি সাহিত্যের বন্যায় নিজের বিশ্বাসকে ভাসিয়েও দেননি। তাঁর যুক্তিবাদী মনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আমাদের দেশেরই ক্লাসিকাল সাহিত্যে এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তার প্রভাবে। তাঁর মানবমুখিতা এই দুই উৎস থেকেই আহরিত। কৃষ্ণকমল স্বয়ং অগুস্ত কোঁতের (Auguste Comte, 1798-1857) Positivist Philosophy বা ধ্রুব দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজে সেকথা স্বীকার করে বলেছেন, "আমি Positivist, আমি নাস্তিক।" কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব দুই ভাইয়ের উপর বড় সামান্য ছিল না।" সেই প্রভাব কোঁতের দর্শন পড়ার আগেই কৃষ্ণকমল ও তাঁর দাদার (তরুণ বয়সে এঁর মৃত্যু ঘটে) ধর্মমতকে প্রভাবিত করেছিল। কারণ, "বোধ হয় সতেরো-আঠারো বৎসর পর্যন্ত সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ এই সকল ধর্মানুষ্ঠানে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। পরে, ইংরাজি অধ্যয়ন ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক ক্রমশ বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল, তত হিন্দুধর্মে শৈথিল্য জন্মিল।"[৫]

বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা সম্পর্কে কৃষ্ণকমলের বক্তব্য প্রকাশিত হলে জনৈক পাঠক 'হিতবাদী' পত্রিকায় কৃষ্ণকমলের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। চিঠির উপরে বিদ্যাসাগর "শ্রীহরি শরণং" লিখতেন, সুতরাং তিনি নাস্তিক হতে পারেন না— এই ছিল কৃষ্ণকমলের মন্তব্যখণ্ডনের প্রধান যুক্তি। এর উত্তরে কৃষ্ণকমল বলেন, "চিঠির উপর 'শ্রীহরি' লেখা থাকিলে লোকে নাস্তিক হয় কি না ইহার উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; তবে আমি শপথপূর্বক বলিতে পারি যে, কোনও কোনও সময় বিদ্যাসাগর এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন—'ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি ত আর কামড়াবেন না।' একথা আস্তিক বা নাস্তিকের মুখে শোভা পায়, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা

বিবেচনা করিবেন"।[৬] কৃষ্ণকমল নিজে নাস্তিক ছিলেন বলে বিদ্যাসাগরকেও নাস্তিক প্রমাণ করতে আগ্রহী ছিলেন এরকম অভিযোগও করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর-সম্পর্কিত অল্প যে কয়েকটি মন্তব্য পাওয়া যায়, সেগুলি বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিশ্বাস প্রমাণ করে না। তা ছাড়া, কৃষ্ণকমল স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে তাঁর থেকে তাঁর বড়দাদার উপর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব ছিল বেশি। বিদ্যাসাগরের প্রভাবে ধর্মাচরণে শৈথিল্য জন্মে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁর প্রভাবে নাস্তিক হয়েছিলেন এরূপ কোনও প্রমাণ নেই। কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক প্রমাণের চেষ্টাও করেননি।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬) রচিত বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিকট থেকে লক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ হাইকোর্টের রায়ে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সম্পত্তির অধিকার পাবার পর পিতার চিঠিপত্র ইত্যাদির মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চণ্ডীচরণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার উদ্দেশ্যে। সুতরাং চণ্ডীচরণের জীবনী লেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অপ্রাচুর্য ছিল না। চণ্ডীচরণ নিজে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁর গভীর ধর্মবিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস তাঁর চিন্তা ও বিচারকেও যে প্রভাবিত করেছিল এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে যে-কোন মহৎ প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এই বিশ্বাস, তাঁর পূর্বসূরী ও কিছু কিছু সমসাময়িকদের মতো, তাঁরও ছিল। বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টায় যে প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, তার কারণ ব্যাখ্যা করে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কারকার্য সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র ও শাস্ত্রগত ধর্মব্যাখ্যা-সম্মত হইয়াছিল। সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সংস্কার ব্যাপার ধর্ম-সংস্কারপ্রসূত হয় নাই বলিয়া বিশেষভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিল না"।[৮] চণ্ডীচরণের বক্তব্য ধর্ম-সংস্কারের মধ্য দিয়েই সমাজ-সংস্কার হবে ; কারণ ধর্মের ক্রমবর্ধমান জড়ত্ব ও অবক্ষয়ের ফলেই সমাজদেহেও কুসংস্কার এবং ক্ষয়িষ্ণুতা প্রকট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক মানসিকতাটি চণ্ডীচরণ সম্যক অনুধাবন করতে পারেন নি বলেই মনে হয়।

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তিজীবনেও তেমনি বিদ্যাসাগর ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখবেন, এ কথা মেনে নিতে ধার্মিক চণ্ডীচরণ সম্মত ছিলেন না। বিদ্যাসাগরকে ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করলে তাঁকে অশ্রদ্ধেয় করা হবে, এইরূপ একটা ধারণাও চণ্ডীচরণকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি লিখছেন, "অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগরের কোনও ধর্মবিশ্বাস ছিল না, কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এবং তাঁহার আচার-আচরণে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোনও এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্যজীবনের আচার-ব্যবহার ক্রিয়াকল্পসম্পন্ন হিন্দুর অনুরূপ ছিল না ; অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।"[৯] চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরকে ধর্মবিশ্বাসী প্রমাণ করার জন্য 'বোধোদয়' নামক স্কুলপাঠ্য একটি বইয়ে 'ঈশ্বর' শিরোনামে একটি রচনার উল্লেখ করেছেন। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরের উপর

কোনও লেখাই 'বোধোদয়ে'র প্রথম সংস্করণে ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'বোধোদয়' প্রকাশের পর বিদ্যাসাগরকে বলেন, "অনেকে আমার নিকট বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বরের বিষয়ে কোনও কথা নাই কেন?"[১০] পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বরের কথা থাকবে বলে বিদ্যাসাগর আশ্বাস দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম প্রবন্ধ 'পদার্থ-এর' পরেই 'ঈশ্বর' শিরোনামে একটি লেখা সংযোজিত হয়। চণ্ডীচরণের মতে, "নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হইলে তাঁহার মতো শিক্ষার সুহৃদ বালকগণের পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বরবোধক পাঠ সন্নিবিষ্ট করিতেন না।" দ্বিতীয় সংস্করণ বোধোদয়ে 'ঈশ্বর' প্রবন্ধটির প্রথম বাক্য ছিল, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ।" ঈশ্বরের এই সংজ্ঞা বালকের বোধশক্তির পক্ষে এতই দুরূহ যে, পরে এই বাক্যটিকে পরিবর্তন করে ঈশ্বরকে পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তারূপে বর্ণনা করতে হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বোধোদয়ে ঈশ্বর স্থান পেলেন বিদ্যাসাগরের স্ব-ইচ্ছায় বা তাঁর অন্তরের প্রেরণায় নয়, বন্ধুর অনুরোধে। কালক্রমে, জনমতের চাপেই ঈশ্বরের বিবর্তন ঘটল। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম থেকে জীব ও পদার্থের সৃষ্টিকর্তা রূপে দেখা দিলেন। গভীর মানসিক ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রয়োজন ছাড়া প্রচলিত নিয়ম ও বিশ্বাসের উপর আঘাত দিয়ে সংঘাতসৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ছিল না। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রখর বাস্তববোধ ছিল বলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় সংঘাত এড়িয়ে যেতে পারতেন। যাই হোক, 'ঈশ্বর' শীর্ষক পরিচ্ছেদটির সংযোজন বিদ্যাসাগরের "ধর্মবিশ্বাস" প্রকাশ না করলেও এটি যে সাধারণ মানুষের মানসিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ রেখেই সংযোজিত হয়েছিল, তাতে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। চিঠিপত্রের উপর "শ্রীহরি শরণং" ইত্যাদি পাঠ লেখার প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "তিনি কেবলমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কোনও কাজই করিতেন না। যাহা নিজ হৃদয়ের অনুমোদিত, তাহাই অসঙ্কোচে সম্পন্ন করিয়াছেন।"[১১] পত্রশীর্ষে "শ্রীশ্রী হরি" লেখা ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ বলে মনে করলে বিষয়টির অতি-সরলীকরণ করা হয়। চণ্ডীচরণের নিম্নে উদ্ধৃত তথ্যটির মধ্যেও কিছু অসঙ্গতি দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। চণ্ডীচরণ লিখছেন, "গোস্বামী মহাশয় বলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি প্রবল ধর্মবিশ্বাসবিশিষ্ট লোক ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও নিজের ধর্মমত বা বিশ্বাস দেখাইতে বা জানিতে দিতে চাহিতেন না। ধর্মমত বা বিশ্বাস সর্বদাই গোপন করিয়া চলিতেন।"[১২] "প্রবল ধর্মবিশ্বাসী" ব্যক্তি কী কারণে ধর্মবিশ্বাস গোপন করতেন তা স্পষ্ট না হ'লে বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১) চণ্ডীচরণের সমসাময়িক হলেও তিনি বিদ্যাসাগরের পরিচিত ছিলেন না ; কিংবা কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁর উপর বিদ্যাসাগরের জীবনীরচনার দায়িত্বও অর্পণ করেন নি। তিনি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার প্রেরণায় প্রচুর পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়, "বিদ্যাসাগর পুস্তকের বিষয় সংগ্রহে যে রূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তেমন গুরুতর পরিশ্রম জীবনে আর কখনও করি নাই।"[১৩] বিহারীলাল ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু, বিদ্যাসাগরের হিন্দু-সমাজের কুসংস্কারগুলির সংস্কার-প্রচেষ্টা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বিহারীলালের মতে বিদ্যাসাগর "ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে" বিধবা-বিবাহ-রূপ, "অকীর্তিকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন," কারণ "কারুণ্য-প্রাবল্যে বিদ্যাসাগর

আত্মসংযমে সমর্থ হন নাই"। বিহারীলালের সিদ্ধান্ত, "ইহা তাঁহার দোষ নহে, দোষ তাঁহার শিক্ষার। হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। হিন্দুসমাজের গঠনের মূল তত্ত্ব এইজন্য তিনি লক্ষ করিতে সমর্থ হইতেন না"।[১৪] তা সত্ত্বেও বিহারীলাল বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলতে পারেন নি, যদিও তাঁর অহিন্দু জনোচিত কাজকর্মের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। বিদ্যাসাগরের চিকিৎসক ডাঃ অমূল্যচরণ বসুর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বংশে নিয়ম ছিল পিতা, মাতা, পিতামহ বা পিতামহী মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই-একবার মন্ত্র দিবার প্রস্তাব দিয়া সুবিধা করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি এবিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন। পরে তাঁহার জননী বিদ্যাসাগরকে মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর 'বিবেচনা করিয়া লইব' বলিয়া স্বীকার করেন। একদিন পিতামহী পীড়াপীড়ি করিলে বিদ্যাসাগর মন্ত্রগ্রহণের একান্ত অব্যাহতি নাই ভাবিয়া পিতামহীকে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। মন্ত্রগ্রহণে বিদ্যাসাগরের মত নাই বুঝিয়া পিতামহী আর মন্ত্র লইবার কথা বলেন নাই।"[১৫] ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানেও "তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, তবে অপর কাহারও সন্ধ্যাহ্নিক দেখিয়া তিনি নাসিকা সঙ্কুচিতও করিতেন না। আপন পরিবারের মধ্যে তৎসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল না।" বিহারীলালের এই সমস্ত তথ্যের দ্বারা বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা প্রমাণিত হয় না, যদিও তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ক্ষুব্ধ বিহারীলাল সোজাসুজি বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক না বললেও, তিনি হিন্দুধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেননি বলে তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"-এর অনুবাদে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে কণ্বের তপঃপ্রভাবে দেব-প্রদত্ত অলংকারে সজ্জিত হওয়ার অলৌকিক কাহিনী বর্জন করেছেন। বিহারীলালের মতে, "ঋষিশক্তি ও ব্রাহ্মণ্য-মহিমা বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু সন্তানের ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি?"[১৬] বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে দেবসেবার জন্য কোনও অর্থসংস্থান করে যান নি। বিহারীলালের মতে "উহাতেও বিদ্যাসাগরের মতিগতির পরিচয়।"[১৭] বিহারীলাল ঘোরতর হিন্দু ; তিনি বিদ্যাসাগরের সমস্ত বিচ্যুতির সমালোচনা করেছেন, সেই সঙ্গে ধর্মীয় মতামত ও আচার-নিষ্ঠা পালনে তাঁর ঔদার্যেরও উল্লেখ করেছেন। ধর্মের প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। "ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যাসাগর অনেক কথাবার্তা কহিলেন। শেষে একটু ধর্মের তর্ক সহসা আসিয়া পড়িল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, দেখ, ধর্ম-কর্ম ওসব দলবাঁধা কাণ্ড, এই দেখ মনুর একটি শ্লোক ঃ—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়ং সতাংমার্গং তেন গচ্ছণ্ ন দুষ্যতি।। (মনুসংহিতা।)

পিতা-পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন, সৎপথ অবলম্বন করিয়া সেই পথে চলিবে, তাহাতে চলিলে দোষ হয় না। কেন বাপু, সৎপথেই যদি চলিবে তবে আবার পিতা-পিতামহ কেন, দুই পথ না বলিলে দলরক্ষা হয় না, এই না? পাছে অপরের, অপর জাতির লোক সৎপথে যায়, দল ভাঙ্গিয়া যায়, এইজন্যই না মনুঠাকুরের এত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। তাই বলি, ধর্মকর্ম ওসব দলবাঁধা কাণ্ড।"[১৮] হিন্দুধর্ম পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে ধর্মে ও সমাজে যে

অচলায়তন গড়ে উঠেছে, যা প্রবহমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, সেই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের গভীর অন্তর্দৃষ্টির উদাহরণ এই বক্তব্যটি।

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত" বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয় এবং এটিই বিদ্যাসাগরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী। কয়েকটি অন্তরঙ্গ ঘটনার বিবরণ এই জীবনীতে পাওয়া গেলেও, আমাদের প্রত্যাশা আরও বেশী ছিল। শম্ভুচন্দ্রের বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র গায়ত্রীমন্ত্র ভুলে গিয়ে, ঠাকুরদাসকে ফাঁকি দিতে, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় ঠোঁট নেড়ে যে মন্ত্রপাঠের ভান করেছিলেন তা আদৌ গায়ত্রী নয়। পরে অবশ্য পিতার নিকট উপযুক্ত প্রহার লাভ হয়েছিল। অতএব ঈশ্বরচন্দ্র বালককাল থেকেই ধর্ম ও ধর্মীয় আচার সম্পর্কে উদাসীন ও নিস্পৃহ। ঠাকুরদাস কিন্তু ধর্ম-আচরণে নিষ্ঠাবান এবং গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। বিদ্যাসাগর পিতার অনুরক্ত এবং পিতৃভক্তিতে কারুর থেকে ন্যূন ছিলেন না। তবুও পিতার থেকে বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর মায়ের ও পিতামহের প্রভাব ছিল বেশি। ঋজু চরিত্রের পর্যটন-প্রিয় মানুষটি বিদ্যাসাগরের ভাষায় "নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন"। ভগবতী দেবী প্রতিবেশী গ্রামবাসীর প্রতি মমতায়, দরিদ্রের সেবায়, অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্যায় বিদ্যাসাগরের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস বাস্তবতাবোধের দ্বারা পরিচালিত। গ্রামের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজায় অজথা আড়ম্বর না করে সেই টাকায় দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানোতে তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। তীর্থ ও তীর্থবাস না করে গ্রামের গরিব মানুষের সেবা তাঁর কাছে অনেক আকর্ষণীয় ছিল। তিনি ঠাকুরদাসকে তীর্থবাসের জন্য মৃদু তিরস্কারও করেছিলেন। ধর্ম ও ঈশ্বরে ভগবতীদেবীর বিশ্বাস বিশেষ গভীর ছিল বলে মনে হয় না।

বিদ্যাসাগরের উপর ভগবতীদেবীর প্রভাব যত বেশী ছিল, ঠাকুরদাসের প্রভাব ততটা ছিল না। বিদ্যাসাগর ১৮৪১ সালে তাঁর প্রথম তীর্থযাত্রার ব্যয়নির্বাহ করেছিলেন তাঁর স্কলারশিপের টাকা থেকে। ১৮৪২ সাল থেকে ঠাকুরদাস চাকুরি ছেড়ে বীরসিংহেই ছিলেন ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত। তারপর বিদ্যাসাগরের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কাশীবাসী হন। বিদ্যাসাগর শুধু পিতামাতার কেন, কোনও আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত ব্যক্তির ধর্মাচরণে বাধা দেন নি ; যদিও তিনি নিজে কোনও দিন মন্ত্রোচ্চারণ করেন নি বা কোনও হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করেন নি।[২০] অপরের ধর্মাচরণের প্রতি সহিষ্ণুতার অভাব কখনও দেখা যায়নি, এমনকি সেই আচরণের মধ্যে কিছুটা অমানবিকতা থাকলেও। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের চাকুরি পরিত্যাগের অল্পকালের মধ্যেই তার স্নেহময়ী পিতামহীর মৃত্যু হয়। শম্ভুচন্দ্রের কথায়, "সন ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে পিতামহীর আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া, বীরসিংহ হইতে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়। শালিমার গঙ্গাতীরে বিনা আহারে কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া কুড়িদিন পরে গঙ্গালাভ করেন"।[২১] আনুমানিক আশি বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধাকে গঙ্গার তীরে এক চালাঘরের মধ্যে কুড়িদিন কেবলমাত্র জল খাইয়ে রাখার অর্থ তাঁকে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। দুর্গাদেবীর বাঁচার ইচ্ছা ছিল কিনা জানা যায় না ; কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদিমার বাঁচার ইচ্ছা ছিল বলেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। "১৭৫৭ সনে দিদিমার (তিনি দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী ছিলেন) মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ

অঞ্চলে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ির বাইরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁর মত নাই। তিনি বলিলেন, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস্‌নে।" কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তখন তিনি কহিলেন, 'তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।' গঙ্গাতীরে লইয়া একটা খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিন দিন-রাত্রি জীবিত ছিলেন।[২২] দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৮ বৎসর মাত্র। তিনি বাধা দিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানা যায় না ; তবে তিনি যে ধর্মীয় আচারের নামে এই নিষ্ঠুরতাকে মেনে নিয়েছিলেন, তা তাঁর নীরবতা থেকেই স্পষ্ট। পিতামহীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অবশ্য বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গেই হয়েছিল। "অগ্রজ মহাশয় পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শ্রাদ্ধের ব্যয়ার্থ রীতিমত টাকা দিয়েছিলেন, শ্রাদ্ধের দিবস অনেক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সমাগম হইয়াছিল।. . অন্যূন তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন, এবং পরদিবস আরও প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। ইহাতে পিতৃদেব পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।'[২৩] সুবলচন্দ্র মিত্রের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ; "But he, nevertheless, never objected to the members of his family following their own beliefs or acting up to the rites of their respective faiths. On the contrary, he rather encouraged them and helped them in the performance of those rites and he was often heard to say that it was improper to throw obstacles in the way of one's acting up to one's faith."[২৪]

কাশীতে বসবাসকালে ঠাকুরদাস যখন যা করতে চেয়েছেন, বিদ্যাসাগর সে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। বিদ্যাসাগর নিজেও অনেকবার কাশী গিয়েছেন, দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন, কিন্তু কোনওদিন মন্দিরে দেবদর্শনে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। ঠাকুরদাসের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সদাচারী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন ; তাঁদের বেদজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। আবার মূর্খ ও লোভী বাঙালি ব্রাহ্মণেরা তাঁর নিকট অর্থ দাবি করলে তিনি তাঁদের কিছু রূঢ় সত্যকথা শুনিয়ে দিয়েছেন। "আপনারা যত প্রকার দুষ্কর্ম করিতে হয় তাহা করিয়া দেশ পরিত্যাগপূর্বক কাশীবাস করিতেছেন। এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।" ব্রাহ্মণেরা বললেন, "আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না।" বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।[২৫] তাঁর কাছে তাঁর পিতামাতাই যে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা, একথাও জানিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের মন্তব্যের মধ্যে অনিবার্যভাবে কিছু ক্রোধ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ঈশ্বর ও ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের চিত্রটি হঠাৎ স্বীকৃতির আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দিনময়ী দেবীর মৃত্যুর পর কলকাতাতে নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধাদিকার্য ও ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি করিয়েছিলেন ; আবার পুত্র নারায়ণকে দেশাচার অনুসারে "আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদিগের ভোজন ও সম্বর্ধনা কার্যাদির জন্য বীরসিংহে পাঠাইয়াছিলেন।[২৬] ভগবতীদেবীর মৃত্যুর পর (১৮৭১) "দশাহে যথাশাস্ত্র কলিকাতার অতিসন্নিহিত কাশীপুরস্থ গঙ্গাতীরে চন্দনধেনু করিয়া ঔর্ধ্বদেহিক শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করেন।

শাস্ত্রানুসারে একবৎসর কাল শোকচিহ্নরূপ নিরামিষ পাক করতঃ একসন্ধ্যা ভোজন করিয়া শরীর ধারণ করিতেন।"[২৭] এক বৎসরের জন্য তিনি জুতো ব্যবহার করেননি, নরম বিছানায় শয়ন করেননি বা কোনও বিলাসদ্রব্যও ব্যবহার করেন নি। এই কৃচ্ছ্রসাধন দেশাচারসম্মত। সন্দেহ নাই বিদ্যাসাগর মাতার মৃত্যুতে গভীর শোকাহত হয়েছিলেন এবং প্রায়ই মায়ের নাম স্মরণ করে অশ্রুপাত করতেন। পিতার মৃত্যুর (১৮৭৬) পরও তিনি অনুরূপ শাস্ত্রসম্মত শ্রাদ্ধাদি করেছিলেন। বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও তিনি শাস্ত্র ও দেশাচারসম্মত প্রথা মেনে চলতেন বলে জানা যায়, যদিও তাঁর মতামত কোনও সময় কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ত করেনই নি, কেউ তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি সে সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করতেন। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বসু নিজের কন্যার বিবাহের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ বসুকে তাঁর মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতেই পরামর্শ দিয়েছেন ; নিজে কোনও মতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন নি। "নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়,তদনুসারে কর্ম করাই কর্তব্য।"[২৮]

গায়ত্রী ভুলে গেলেও বিদ্যাসাগর কিন্তু দৃশ্যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। যজ্ঞোপবীত, শিখা এবং ধুতি-চাদর-চটিতে চিরাচরিত ব্রাহ্মণের রূপটিই স্পষ্ট। আবার বাড়িতে আসবাবপত্রে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিচয়। লেখাপড়ার কাজকর্ম করেন চেয়ার-টেবিলে। বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার ছবি বা মূর্তি নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিক ইত্যাদি করেন না। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যাসাগরকে জানতেন তাঁর শেষ দশ-বার বৎসর। তিনি লিখেছেন, "বাড়িতে তো কোনও পুজো হতে দেখিনি. . .অনেকদিন কেটেছে এমন যে বিকেল থেকে ঠায় ঘরে বসে গল্পগুজব হতে হতে রাত হয়ে গেছে, সেখানেই খাবারটাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে তো দেখিনি।"[২৯] কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের চিহ্ন উপবীত ত্যাগ করেন নি। রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর উপবীত ত্যাগ করেন। এতে রামতনুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। রামতনুকে পৈতৃক বাড়ি ত্যাগ করতে হল। সব শুনে বিদ্যাসাগর রামতনুকে বললেন, "বাপের কথায় পৈতে গাছাটি রাখতে পারলে না।"[৩০] পরে রামতনু যখন উত্তরপাড়া স্কুলের হেডমাস্টার, তখন তাঁর উপবীত ত্যাগের ঘটনা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে তাঁকে একটি সামাজিক অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কোনও দোকানদার তাঁকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করতেন না। তাঁর বাড়িতে কাজ করতে রাঁধুনিরাও অস্বীকার করত। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর নৌকাযোগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও রাঁধুনি পাঠিয়েছেন, একবার নয়, বেশ কয়েকবার।[৩১] বিদ্যাসাগরের নিকট উপবীতের কোনও বিশেষ মাহাত্ম্য নেই—তার গ্রহণ ও বর্জন সমান অর্থহীন। উপবীত ত্যাগ করলে যদি আত্মীয়দের মনে দুঃখ দেওয়া হয়, তবে তা ত্যাগ না করাই শ্রেয়। আবার উপবীত ত্যাগের ফলে রামতনুর অসুবিধা লাঘব করতে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, যা প্রকারান্তরে রামতনুর কাজের নৈতিক সমর্থন বলেই মনে করা যায়। তাঁর অসাধারণ বাস্তববোধের ফলে তিনি কয়েকটি আচার-আচরণকে মেনে নিয়েছিলেন, কোনও ধর্ম বা ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রেরণায় নয়, বাস্তব দিক থেকে এগুলি অনাবশ্যক সংঘাত সৃষ্টি করবে না বলেই। কিন্তু যে বিষয়গুলিতে তাঁর বিশ্বাসের প্রশ্ন অনিবার্যভাবে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই বিদ্যাসাগর দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। মৃত্যুর দুই-তিন মাস আগে

তাঁর কন্যা বাড়িতে একতলার একটি ঘরে "পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন ও হোমের ব্যবস্থা"[৩২] করেন। দীর্ঘ কয়েক বৎসর রোগভোগের ফলে শারীরিক দিক থেকে তখন তিনি জীর্ণ ও দুর্বল। সাধারণ মানুষ এইরূপ অবধারিত মৃত্যুর ছায়ায় মানসিক দিক থেকেও দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু বিদ্যাসাগর স্বস্ত্যয়নাদিতে সায় দিতে পারেন নি। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "নিজের তাদৃশ বিশ্বাস না থাকায় কেবল কন্যা প্রভৃতির অনুরোধে বাড়িতে এই হোম করিতে দিতে রাজী হয়েছিলেন। একতলার যে ঘরে হোম হয়েছিল, সেটি ছিল দোতলা থেকে নামার সিঁড়ির পাশে।" কিন্তু সে ঘরে বিদ্যাসাগর প্রবেশ করেন নাই। কন্যার বিশেষ অনুরোধে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেসে বললেন,"মা, এইখানেও ধোঁয়া আসছে, মনে দুঃখ করিস্ না।"[৩৩]

(৩)

ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত অনেকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট কেউ কোনও স্পষ্ট জবাব পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। শম্ভুচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুসারে একবার "দুইজন ধর্মপ্রচারক এবং কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক" বিদ্যাসাগরকে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "ধর্ম যে কী তাহা বর্তমান অবস্থায় মানুষের জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও প্রয়োজন নাই।"[৩৪] কিন্তু শম্ভুচন্দ্র যদি যথাযথ উদ্ধৃত করে থাকেন, তবে তাঁর শেষ বাক্যটি অর্থবহ, "আমার বোধহয় যে পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এইরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে তাবৎ এই তর্ক থাকিবে, কস্মিনকালেও ইহার মীমাংসা হইবে না।" সুতরাং ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদিকে সাধারণ মানুষের হিসাবের বাইরে রাখাই শ্রেয়। এটি "নবযুগের" মানবকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের মত। বিদ্যাসাগর ধর্মকে শুধু আলোচনার বাইরে নয়, সামাজিক জীবনের বাইরে রাখারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। একবার দুইজন ধর্মপ্রচারককে ধর্মপ্রচারের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একটি গল্পও বলেছিলেন বিদ্যাসাগর। পাপের জন্য ঈশ্বরের দরবারে সবাইকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেহেতু ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে কেউই সঠিক জানেন না, তাই মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য ঈশ্বরের নিকট ধর্মপ্রচারকদের শাস্তির মাত্রা বেড়ে যায়। বিদ্যাসাগর মজা করে বললেন, "আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব না।"

বস্তুতপক্ষে ধর্মপ্রচারকদের বিদ্যাসাগর ঠিক মেনে নিতে পারতেন না। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগর একদিন একজন খ্রীষ্টান পাদরিকে ধর্মালোচনায় আহ্বান করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে এমন যুক্তিবিন্যাস করলেন যে, পাদরি উপযুক্ত জবাব না দিতে পেরে রুষ্ট হয়ে বললেন, "বৃদ্ধবয়সেও আপনি এমন নাস্তিক? মৃত্যুর পর নরকেও আপনার স্থান হবে না।"[৩৫] বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগানের বাড়ির নিকটে বসবাসকারী জনৈক ব্রাহ্ম-প্রচারক (হেরম্ব মৈত্রর পিতা চাঁদমোহন মৈত্র) একদিন দর্শনপ্রার্থী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে অনেক পথ ঘুরিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌঁছে দেন। বৃদ্ধের এই অযথা হয়রানির কথা শুনে বিদ্যাসাগর চাঁদমোহন কে তিরস্কার করে বলেন, "যার জানা পথে এত গোল, সে না-জানি অজানা পথে লোকের কত দুর্দশা ঘটায়। তুমি বাপু একাজ আর কোরো না।"[৩৬]

শশধর তর্কচূড়ামণি কাশীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নামকরা দর্শনশাস্ত্রবিদ্ ও ধর্মপ্রচারক। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার সময়

কলকাতায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাসাগর কথাপ্রসঙ্গে তর্কচূড়ামণিকে বলেন, "আমিও দর্শন পড়েছি। দুর্বোধ্য বিষয়, কিছুই ভাল বোঝা যায় না। পণ্ডিতমশায় পড়াবার সময় যখন জিজ্ঞেস করতেন, 'ঈশ্বর বোঝো তো'? আমি বলতাম, আপনি যেমন বোঝেন, আমিও তেমনি বুঝি, পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান।' আমার কথা শুনে পণ্ডিতমশায় খুব হাসতেন।"

তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার আগে তাঁকে বিদ্যাসাগর বললেন, "আপনি এসেছেন, বক্তৃতা করুন, লোকে বলবে বেশ বলেন ভালো। এইরকম একটা প্রশংসা পাবেন, আর কিছু না। আমার স্কুলের (মেট্রোপলিটান) ছেলেরা যে মুরগীর মাংস খায়, আপনার বক্তৃতায় তারা যে মাংস ছাড়বে, তা একেবারেই মনে করি না।"[৩৭]

কাশীতে একবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাসায় গিয়েও দেখা পান নি। বিদ্যাসাগর বাঙালিটোলায় গিয়ে খোঁজ করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্যাসাগর সম্ভবত ভেবেছিলেন ভদ্রলোক কোনও বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে কঠিনতম প্রশ্নটি করলেন, যে প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত বিদ্যাসাগরও সঠিকভাবে জানতেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের ধর্মমত জানতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, "আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই ; তবে এই কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন, তবে তাহাই আপনার ধর্ম।" বিদ্যাসাগরের নিকট ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সান্ত্বনার ব্যাপার।

অমূল্যচরণ বসু ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরিবারের ডাক্তার, এবং বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন। "তিনি একবার অনুনয়বিনয় করায় শেষে বলিয়াছিলেন, 'গীতার উপদেশ অনুসারে চলিলেই ভাল হয়'।[৩৮]গীতার কোন্ উপদেশ? নিষ্কাম কর্মের? সম্ভবত তাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্নেহের সুযোগে অনেকে অনুনয়বিনয়ের ফলে অমূল্যবাবু যে জবাব পেয়েছিলেন, তাতে বিদ্যাসাগরের নিজের বিশ্বাসের ছবিটাই ছিল অনুপস্থিত।

একবার এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে বিদ্যাসাগর বললেন, "তারা বলছে শুনলাম, আমরা মুশারও পায়ের ধুলা নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধূলা নিচ্ছি, শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধূলা নিচ্ছি, আরে বাপু, ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য তো মরে ভূত হয়ে গিয়েছে, পায়ের ধূলো কি রে বাবা।"[৩৯] মানুষকে অবতার রূপে পূজা করার ব্যাপারটি তাঁর বিচারবুদ্ধির বাইরে ছিল বলেই মনে হয়। মানুষের পুণ্যাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগর যে আকর্ষণীয় রসিকতা করতেন তার উদাহরণ নিচের কথোপকথনটি। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন কাশীবাস করে সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তরগমনের কিছুদিন পূর্বে একবার আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভট্টাচার্য মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণে আসনে বসাইয়া তামাক দিতে বলিয়াই বলিলেন, 'তুমি মরিয়াছ নাকি?'

—কেন আমি মরবো কেন? মলে কি আসতেম?

—তা দেখো আমাকে যেন পেয়ে বসো না।

ভট্টাচার্য মহাশয় তামাক খাইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'তোমার শেষটা কাশীতে গেলে, মরবার বুঝি আর জায়গা জুটলো না। তা গেছ ত আবার ঐরকম সরে পড় কেন? জান ত কাশীবাস করে বাইরে মলে কী হয়?

—হ্যাঁ তা জানি, তবুও মাঝে মাঝে দায়ে পড়ে আসতে হয়।

—শিগ্‌গির শিগ্‌গির পালাও, না হলে কাশীর এপারে ওপারে ভিতরে বাহিরে অনেক ফারাক, বলি একটু গাঁজা-টাঁজা খেতে শিখেছ ত?

—কেন গাঁজা খেয়ে কী হবে?

—বলি একটু অভ্যেস রেখো, কি জানি কখন কী কাজে লাগে, বলা ত যায় না। মনে কর যদি তোমার কাশীপ্রাপ্তি হয়, তাহলে তো শিব হবে? শিব হলে তোমার নন্দীভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে তখন টানতে হবে ত? আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে দম আট্‌কে মরে যাবে আর তোমার এত সাধের শিবত্ব ফস্‌কে যাবে।"[৪০]

রসসমৃদ্ধ এই কথোপকথনটি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছুদিন আগেই ঘটেছিল। সেই সময়ও বিদ্যাসাগর কাশী, শিব ইত্যাদি নিয়ে উপভোগ্য রসিকতা করেছেন। গানবাজনা বা তাঁর সময়ের থিয়েটার-কবিগান ইত্যাদিতে বিদ্যাসাগরের কোনও আগ্রহ ছিল বলে জানা যায় না। বিধবাবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে যেসব গান ইত্যাদি লেখা হয়েছিল,তার কয়েকটি তিনি শুনেছিলেন, সেগুলির বক্তব্য জানবার জন্য। মাতৃ-বিয়োগের পর তিনি মায়ের স্মরণে প্রায়ই অশ্রুপাত করতেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয় ; এই কন্যার শ্বশুরমহাশয় শ্যামাসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। শুধু 'মা' নামেই বিদ্যাসাগরের তৃপ্তি হত বলে "কেবল যে যে গানে মা মা থাকিত সেই গানই শুনিতেন। গানে শখ ছিল না ; কিন্তু মাতৃনামপূর্ণ গানে প্রাণ মাতিয়া উঠিত। মাতৃভক্তের এমনই প্রাণ বটে"।[৪১] বিহারীলালও এই গান শোনার আগ্রহকে মাতৃভক্তিরই প্রকাশ বলেছেন—প্রচ্ছন্ন কালী-সাধনার প্রয়াস বলে অভিহিত করতে পারেন নি। বিহারীলাল একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, "যিনি বেহালা বাজাইয়া শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন", তিনি বিদ্যাসাগরকে গান শোনাতেন বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনিই অখিলদ্দিন। চণ্ডীচরণ বহু অনুসন্ধানে "তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে অনেক সাধ্যসাধনার পর" গানগুলি লিখে নিয়েছিলেন। অখিলদ্দিন বলেছিলেন, "বিদ্দেসাগরবাবু আমায় বড় ভালবাসিতেন, আর এই গান শুনিয়া খুব খুশী হইতেন। তাহার নিকট অনেক পয়সা পাইয়াছি।"[৪২] চণ্ডীচরণের মতে গান শোনার ঘটনা, "অনেক দিনের কথা।", সুতরাং মৃত্যুর কিছুদিন আগের ঘটনা নয় বলেই মনে হয় ; কারণ অখিলদ্দিনও ভাল স্মরণ করতে পারেন নি বিদ্যাসাগর তাকে কত পয়সা দিতেন। কিন্তু যে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে, গান শুনে বিদ্যাসাগর কি ঈশ্বরপ্রেমে আকুল হয়ে অশ্রুপাত করতেন?

অখিলদ্দিনের বাউল গানগুলিতে একটি মিস্টিক উপলব্ধির বিষয় আছে, সেটিকে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা মনে করলে যথার্থ বিষয় অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। এই বাউল গানগুলি কি শুধু ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? এই গানের কথা ও সুর বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রিয় গ্রাম, সেখানের শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনুষঙ্গ, গ্রামের মানুষজন, বিশেষত তাঁর পিতামাতাকে স্মরণ করিয়ে দিত না? সেই স্মৃতি তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করত না? যে ঈশ্বরপ্রেমের গভীরতায় ভক্ত মানুষ অশ্রুমোচনে প্ররোচিত হন, সেই প্রেমে সংশয় বা সন্দেহের ছায়াটুকু পর্যন্ত থাকে না। এই

গানগুলি যদি বিদ্যাসাগরের চিত্তের সুপ্ত ঈশ্বর-প্রেমকেই আলোড়িত করে থাকে, তবে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে পারেন নি কেন? তাই এই গানগুলির প্রতি বিদ্যাসাগরের আকর্ষণকে ঈশ্বরপ্রেমের নির্দেশিকা বলে মেনে নিলে তাঁর মানসিকতাকে যথার্থ অনুসরণে ত্রুটি থেকে যাবে।

বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগর অনেকবার ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করেছেন। একজন দুষ্টলোক এক বিধবার সর্বস্ব অপহরণ করে তার উপর অত্যাচার করছে। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "এই জগতের মালিককে যদি পাই, তা'হলে একবার দেখি। এ জগতের মালিক থাকলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে।"[৪৩] ঈশ্বর নিরীহ নিরপরাধের রক্ষাকর্তা, এই বক্তব্যের প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর একবার চেঙ্গিস খানের অহেতুক নিষ্ঠুর গণহত্যার উল্লেখ করে বললেন, "এই হত্যাকাণ্ড ত ঈশ্বর দেখলেন? কই, একটু নিবারণ করলেন না। তা তিনি থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না।"[৪৪] ১৮৮৭ সালের জুন মাসে 'স্যার জন লরেন্স' নামে কলকাতা থেকে পুরীগামী একটি জাহাজ ঝড়ে পড়ে এবং বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়। জাহাজের প্রায় আটশত যাত্রী রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে জগন্নাথদর্শনে যাচ্ছিলেন। একজন তীর্থযাত্রীও বাঁচেন নি। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে।[৪৫] বিদ্যাসাগর স্বাভাবিক ভাবেই শোকে দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বললেন, "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর? কেমন করে তিনি পরম করুণাময় হয়ে একসঙ্গে ডুবিয়ে মারতে পারলেন সাত-আটশত মানুষ? এই কি দুনিয়ার মালিকের কাজ? এইসব দেখলে এই দুনিয়ার কেউ মালিক আছে বলে সহসা মনে হয় না।"[৪৬] চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "সময়ে সময়ে তাঁহার মুখে এইরূপ তীব্র গভীর আক্ষেপোক্তি শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর-বিশ্বাস-হীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, এইরূপ মর্মপীড়ায় ঈশ্বরের অনেক ভক্তসন্তান অন্তরের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিবার সময় এইরূপ ভাবের পরিচয় দিয়া ফেলেন।" যদি বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ঈশ্বরভক্তির প্রশ্নাতীত পরিচয় পাওয়া যেত, তা হলে এইসব আক্ষেপোক্তিকে "ভক্ত সন্তানের অন্তরের গভীর বেদনা" অথবা ঈশ্বরের উপর অভিমান বলে মেনে নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিশ্বাসের বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। তার উপর চণ্ডীচরণের নিজেরই বক্তব্য যে বিদ্যাসাগর "যাহা নিজ-হৃদয়ের অনুমোদিত, তাহাই অসঙ্কোচে সম্পন্ন করিয়াছেন।" এই বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য, কারণ তাঁর চরিত্রে এই দুর্লভ দৃঢ়তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। চণ্ডীচরণের উপরিউক্ত বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হলে বিদ্যাসাগর তাঁর গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসকে সজ্ঞানে সংশয়ের একটি আবরণ সৃষ্টি করে তার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন—এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

বিদ্যাসাগরের সংশয়প্রকাশকে তাঁর সৎ অন্তঃকরণের অকপট সরল প্রকাশ বলে মনে করাই শ্রেয়। এই প্রসঙ্গে বিপিনবিহারী গুপ্ত একদা কথা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন? উত্তর হইল, 'ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলো, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী'।"[৪৭] এটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নয়। ক্ষুদিরাম বসুও বলেছেন, তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। মোটের

উপর মনে হয় তিনি agnostic বা সংশয়বাদী ছিলেন।[৪৮] ক্ষুদিরাম বসু একই নিশ্বাসে বিদ্যাসাগরকে একেশ্বরবাদী ও সংশয়বাদী বলেছেন। দুটির মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট। তাঁর দেওয়া উদাহরণে অবশ্য আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, তাঁর পক্ষপাতিত্ব সংশয়বাদীর দিকেই। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলাও যেমন দুরূহ, তেমনি তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বললে অবধারিতভাবে সত্যের অপলাপ হবে। তিনি অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী ছিলেন—এইটিই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সত্যের সবথেকে কাছাকাছি। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, বিদ্যাসাগরের মতে বিখ্যাত ব্যক্তি পরম যত্নে সার্থকভাবে নিজের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের জগৎটিকে সাধারণ মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনও অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ছিল কিনা তাই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর বিশ্বাসকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টার) একদিন বিদ্যাসাগরের বেত খাওয়ার গল্পটি শুনিয়ে বললেন, "তাই বিদ্যাসাগর বলেন, 'নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! (সকলের হাস্য)। আমি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই বুঝি না, আবার পরকে কী লেক্‌চার দেবো?" এই কথার উপর বিবেকানন্দের মন্তব্য, "যে এটা বোঝে নাই সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেমেয়েদের বিদ্যা শেখাতে হবে, আবার সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলেমেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে? যে একটা বোঝে সে সব বোঝে।" বিবেকানন্দের কাছে সমাজসেবা কিংবা মানুষের সেবা ও ঈশ্বরচেতনা একই বস্তু। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে, অতএব, বিদ্যাসাগর ঈশ্বর-বিশ্বাসী। বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ কিন্তু ঠিক এইভাবে বিদ্যাসাগরের বিচার করেন নি। তার কারণ, উভয়ের মধ্যে ধর্ম ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। বস্তুতপক্ষে, গুরু অপেক্ষা শিষ্যের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের মানসিকতার বেশী মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

(৪)

ধর্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) ১৮৫০ সালে দাক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির মন্দিরে পূজোর কাজ করতে এসে, পরে মন্দিরের পুরোহিত এবং সাধনার ফলে তাঁর 'ঈশ্বরদর্শনের' সুযোগ হয়েছিল। তাঁর খ্যাতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 'ভদ্রলোক' সমাজের একটা অংশ তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরীশ ঘোষ ইত্যাদি। জমিদার-ব্যবসায়ী শ্রেণীর কিছু ব্যক্তিও তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ শিষ্যের বাড়ি ছাড়াও কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।

রামকৃষ্ণের উপদেশের ভাষা ছিল সরল ও গ্রাম্য ; বক্তব্যের মধ্যে যে উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করতেন তা-ও গ্রাম্যজীবন থেকে নেওয়া। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তিনি ছিলেন অসাধারণ তীক্ষ্ণধী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। তাই ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়কে তিনি সহজবোধ্য ভাষায় সাধারণের নিকট উপস্থিত করতে পেরেছেন এবং তার মধ্য থেকেই তাঁর নিজের চিন্তাও

একটি নির্দিষ্ট আকার নিয়েছে। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণের ধর্মোপদেশের ও চিন্তার দু'একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারিরা ছাড়াও ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তকরা সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মরা হিন্দুধর্মের সংস্কার করে যে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করলেন, তা বিভিন্ন কারণে সমাজের শিক্ষিত স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। তা ছাড়া ব্রাহ্মদের মধ্যেও দল-উপদলের সৃষ্টি হয়ে ধর্মের সংস্কার-প্রচেষ্টাকে স্তিমিত করে দিল। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের উদ্যোগগুলিও ব্যাহত হয়েছে, কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে ঐ সংস্কারপ্রচেষ্টাকে গতি দেওয়ার মত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ধর্ম ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে রামকৃষ্ণের উপদেশগুলি একটি নতুন ধর্ম-আন্দোলনের সূত্রপাত করল। 'নিরাকার ব্রহ্মের' উপাসনা ছেড়ে সাকার দেবতার পূজা সাধারণের নিকট অনেক আকর্ষণীয় হল। তা ছাড়া জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—এই তিন মার্গের মধ্যে রামকৃষ্ণ জোর দিলেন ভক্তি-মার্গেই, কিন্তু কোনও পথেরই তিনি নিন্দা বা সমালোচনা করলেন না। ভক্তি-মার্গের অনেকগুলি ভাবের মধ্যে আবার প্রাধান্য পেল 'সন্তান ও দাস্যভাব'। কর্ম-মার্গের আলোচনায় রামকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের কথা বললেও সমাজের সংস্কারমূলক বা সেবামূলক কাজকর্মকে ঈশ্বরলাভের উপায় বলে মনে করতেন না। শম্ভু মল্লিক তাঁর শিষ্য ছিলেন ; কিন্তু তাঁর স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি জনসেবামূলক কাজকে তিনি প্রকৃত ভক্তের কাজ বলে মনে করতেন না। "যত মত তত পথ" এই সহজ বাক্যটিকে জনপ্রিয় করে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার এক নতুন দিক খুলে দিলেন। ফলে অন্য মতাবলম্বীদের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাবনা রইল না।

রামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁর মত ও পথ হল ব্যক্তিগত ভাবে সাধনাই ঈশ্বরলাভের উপায়স্বরূপ। ব্যক্তি-মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিই রামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর লক্ষ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিবেকানন্দ কিন্তু রামকৃষ্ণের এই মূল লক্ষ্যটিকে কিছু পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন।[৫৭] বস্তুতপক্ষে বিবেকানন্দের নেতৃত্বেই দরিদ্রনারায়ণ-সেবা থেকে শুরু করে মানুষের সবরকমের সেবাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণ মিশন। স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তির থেকে জ্ঞান ও কর্মের উপর বেশি জোর দেওয়া হল।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (বাং ১২৬১-১৩৩৯) বিদ্যাসাগর স্থাপিত মেট্রোপলিটন স্কুলের (শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ) শিক্ষক ছিলেন এবং ১৮৮২ সাল থেকে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করতেন। যদিও তিনি ঘনিষ্ঠ ভক্তদের একজন রূপে পরিচিত ছিলেন, তবুও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেননি। তিনি রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ সাড়ে চার বৎসরের (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ থেকে আগস্ট ১৮৮৬) মধ্যে ১৮৬ দিনের কথোপকথনের একটি যথার্থ চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাঁর রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে। তাঁর সমসাময়িক সকলেই এই বিবরণকে সৎ ও তথ্যনিষ্ঠ বলেছেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট, বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাড়িতে। প্রায় ৪ ঘন্টা রামকৃষ্ণ এই বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগরের বয়স ৬২ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছিল, আর রামকৃষ্ণের বয়স ৪৬ বৎসর। বিদ্যাসাগর তাঁর ৩০

বৎসর বয়ঃক্রম থেকেই বাংলাদেশে সুপরিচিত। কলকাতার ভদ্রলোক সমাজে রামকৃষ্ণের পরিচিতি কম ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর মানসিকতা অনুযায়ী ধর্মের জগতের মানুষের খোঁজ-খবর বিশেষ রাখতেন না। মহেন্দ্রনাথ (শ্রীম) যখন বিদ্যাসাগরকে জানালেন যে রামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে আসতে চান, তখন বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন, "কী রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরেন?" স্বভাবতই বিদ্যাসাগর সাময়িক পত্রিকায় রামকৃষ্ণের উপর প্রকাশিত লেখাগুলি পড়েন নাই। যাই হোক, মহেন্দ্রনাথের কথায় "বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন।"[৫২] এই কথামত ৫ আগস্ট ১৮৮২, বেলা ৪টার সময় রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কয়েকজন শিষ্য এবং মহেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ির অভিমুখে রওনা হলেন। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছিলেন চার ঘণ্টা—বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা। বিদ্যাসাগর এই সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের আগমনের জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন, এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিদিনের মত কিছু প্রার্থীও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, এ ছাড়াও ছিলেন বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয়-বন্ধুরা। রামকৃষ্ণ যখন সশিষ্য সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় বিদ্যাসাগরের কাজকর্ম করার হল্‌ঘরে এলেন, তখন "তিনি দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন। ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগরের পরনে থানকাপড়, পায়ে চটিজুতো, গায়ে একটি হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মত কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল, সব দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁতগুলি বাঁধানো। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ, তাই গলায় উপবীত।" মহেন্দ্রনাথের বর্ণনাটিতে শুধু বিদ্যাসাগরের চিত্রটিই নয়, পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়াটিও সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে বিদ্যাসাগরের উৎসুক প্রতীক্ষার বা প্রয়োজনাতীত আগ্রহের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কিঞ্চিদধিক যে চারঘণ্টা সময় রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি কিঞ্চিৎ জলযোগ করেছেন, কয়েকবার অল্প সময়ের জন্য ভাব-সমাধি-প্রাপ্ত হয়ে নীরব থেকেছেন, চারটি রামপ্রসাদী গান শুনিয়েছেন। গানগুলি গেয়ে তিনি বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে প্রাঞ্জল করেছেন। প্রত্যাশিতভাবে একটি ভাব ও আবেগের আবহও তৈরি হয়েছিল। রামকৃষ্ণ, বস্তুতপক্ষে, আলোচনা শুরু করেন তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌পটুতায় এবং অজস্র গ্রাম্যজীবনের চিত্রকল্প ব্যবহার করে। তাঁদের কথোপকথন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, রামকৃষ্ণ প্রথমদিকে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেছেন বেশ সোজাসুজি, সুন্দর উপমার সাহায্যে। খাল বিল হদ্দ (হ্রদ) নদী দেখার পর সাগর দেখা, কিংবা বিদ্যাসাগরের বিদ্যাদান, অন্নদানের উল্লেখ এবং তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলে বর্ণনা করার মধ্যে বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা করার একটি চেষ্টা কেমন ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ব্যাজস্তুতিতে এবং অবশেষে শ্লেষে পরিণত হল, তা দৃষ্টি এড়াবে না বলেই মনে হয়। বিদ্যাসাগর "দরকচা মারা পণ্ডিত" নয়, বলেছেন রামকৃষ্ণ। কিন্তু প্রায় চারঘণ্টা ধরে উপদেশ দেওয়ার পর রামকৃষ্ণ যে বিদ্যাসাগরের উপর গভীর, দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি তা সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করতেপেরেছিলেন। সমস্ত সময়টিতে বিদ্যাসাগর

দু-একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ছাড়া মোটামুটি নীরবই ছিলেন। প্রথমে রামকৃষ্ণের মন্তব্যের উত্তরে বিদ্যাসাগর যেভাবে সরস জবাব দিয়েছিলেন, ধীরে ধীরে সেরূপ বাক্-পটুতাও কমে এল। কথোপকথনটি অনুধাবন করলে একথা প্রতীয়মান হবে যে বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের তীক্ষ্ণধী বিশ্লেষণে, বাক্যবিন্যাসের কৌশলে এবং সহজ ভাষায় দুরূহ বিষয় সহজবোধ্য করার ক্ষমতায় বেশ কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণভাবে রামকৃষ্ণের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন তা-ও মনে হয় না। কিংবা বলা যায়, রামকৃষ্ণ তাঁর মতামতকে সম্যকভাবে প্রভাবিত করতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ ব্যক্ত করেছেন কামিনীকাঞ্চনের প্রতি তাঁর ঘৃণা, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে ঈশ্বরলাভের জন্য ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব, অনির্বচনীয় ব্রহ্মার নির্লিপ্ততা ইত্যাদি। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই, রামকৃষ্ণের এই কথাটি বিদ্যাসাগরের নিকট নতুন মনে হয়েছে এবং তিনি তা অকপটে বলেছেন। ভক্তিমার্গের ব্যাখ্যায় রামকৃষ্ণ দাস্যভাব ও সন্তানভাবের ব্যাখ্যা ক'রে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর নিজের ভাবের কথাও জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেও তিনি রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে পারেন নি অথবা রামকৃষ্ণের বিশ্বাসের সংস্পর্শে এসে নিজেও বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেন নি। তাই রামকৃষ্ণ যখন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কী ভাব জানতে চাইলেন, তখন বিদ্যাসাগর বললেন, "আচ্ছা, সে কথা একলা একলা আপনাকে একদিন বলব।" রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বিশ্বাসের সংশয় সম্পর্কে একটি নিশ্চিত ধারণা করে নিয়ে বললেন, "তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।"

বিদ্যাসাগর যদিও অল্প কথা বলেছিলেন, তবুও তার সংশয়ী চিত্তটির সামান্য আভাস দিয়েছেন এই কয়েকটি মাত্র কথাতেই। উল্লেখ্য, তিনি কোনও তর্কের সৃষ্টি করেন নি, কারণ তা শুধু শিষ্টাচারবিরুদ্ধই হত না, তা হত সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও অরুচিকর। সকলের শক্তি সমান নয়, এই বক্তব্যটি যখন রামকৃষ্ণ বোঝাচ্ছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেন, "তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? বিদ্যাসাগর সম্ভবত মানুষ এবং অন্যান্য জীবের গুণ ও ক্ষমতা তাদের পারিপার্শ্বিকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এইরূপ কোনও বস্তুবাদী ধারণা থেকে কিংবা ঈশ্বর সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন এইরূপ কোন ভক্তিবাদী ধারণা থেকে এই প্রশ্নটি করে থাকবেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের রসিকতা এই প্রশ্নের উত্তরে ঝলসে উঠল। তিনি বললেন, "তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আর কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়? আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো?" বিদ্যাসাগর এবিষয়ে আর কোনও কথাই বলেন নি। রামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতে অবশ্য কোনও রোষ ছিল না ; কিন্তু বিদ্যাসাগর যে তাঁর সমস্ত যুক্তিকে গ্রহণ করতে পারছেন না তার কিছু আভাস পেয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের বাচনভঙ্গীতে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, গানের গলায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তৃতীয় রামপ্রসাদী গানটি গাওয়ার পর, "ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ দেহ উন্নত ও স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদ্গ্রীব হইয়া এক অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিবদ্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।"

বিদ্যাসাগর বিহ্বল হয়েছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় বিদায়

নেওয়ার কিছু আগে যে কথোপকথনটি হল তাতে স্পষ্ট হল যে বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের মধ্যে মানসিক দূরত্ব খুব বেশি কমেনি। কথোপকথনটি উদ্ধৃত করলে অনুধাবনের সুবিধা হবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—এ যা বললুম বলা বাহুল্য আপনি সব সব জানেন ; তবে খপর নাই —নাই ।(সকলের হাস্য) বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। বরুণ রাজার খপর নাই। বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পারেন।"

ভক্তিমার্গের বিষয়, নিষ্কামকর্ম ইত্যাদি বিদ্যাসাগরের জানা আছে, তবে তাঁর যথার্থ উপলব্ধি নেই ; এবং নেই বলেই রামকৃষ্ণের ধারণা, তাঁর ঈশ্বরের উপর আস্থা নেই। রামকৃষ্ণ স্পষ্ট করে একথা বলেন নি বটে, কিন্তু যে উপমাটি তিনি ব্যবহার করেছেন তা বিদ্যাসাগরের অধ্যাত্ম জীবনের অসম্পূর্ণতার প্রতিই ঈঙ্গিত করছে। পরবর্তী কথোপকথনটি এই ধারণাকে সমর্থন করছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।।

বিদ্যাসাগর—যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি ছি।

বিদ্যাসাগর—সে কি? এমন কথা বললেন কেন, বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলে ডিঙ্গি। (সকলের হাস্য) খাল, বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগর সহাস্যবদনে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে। (সকলের হাস্য)"। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে তাঁর কাছে নয়, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নয়, রাসমণির বাগানে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। বাগান দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ কি বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরে অনাসক্তি স্মরণ রেখে? বস্তুতপক্ষে কথোপকথনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত স্বল্পবাক্ এবং ঈশ্বরের সপক্ষে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নি। রামকৃষ্ণের আমন্ত্রণের উত্তরে বিদ্যাসাগরের জবাবটিও উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ যেমন সচেতনভাবে দক্ষিণেশ্বরের উল্লেখ করেন নি, বিদ্যাসাগরও তেমনি রামকৃষ্ণের তাঁর বাড়িতে আগমনকে কোনও ধর্মগুরুর আগমন হিসাবেও গণ্য করেন নি ; এটিকে একটি সামাজিক ব্যাপার মনে করেছিলেন। তাই সামাজিক কৃত্য হিসাবে তাঁরও রামকৃষ্ণের বাড়িতে প্রত্যাগমন করা উচিত বলে মনে করেছিলেন। রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যায় আপাত-বিস্ময়ের মধ্যেও যে একটু তীক্ষ্ণ শ্লেষ ছিল, তা কারুর দৃষ্টি এড়াবে না বলেই মনে হয়। নিজেকে জেলেদের ছোট ডিঙ্গির সঙ্গে তুলনা করে তার অবাধ গতির সঙ্গে, বড় জাহাজ যে কেবল সমুদ্র ও বড় নদীতেই যেতে পারে সেকথার উল্লেখ করলেন। বিদ্যাসাগরের বিপুল জ্ঞান বড় জাহাজের ন্যায় তাঁর চলাচলের ক্ষেত্রকে সীমিত করেছে। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের ও মানসিক দিক থেকে কিঞ্চিৎ জড়ত্বের ইঙ্গিত এই কথোপকথনে আছে। এটি সহজে কারুর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে বলে মনে হয় না। এই শ্লেষটুকুও বিদ্যাসাগর গায়ে মাখলেন না। তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেশ সহজ ভাবেই কথা বললেন এবং কোনও ভাবেই তাঁর নিজের বিশ্বাসের ছবিটি দৃষ্টির সীমার মধ্যে নিয়ে এলেন না। রামকৃষ্ণের সুবোধ্য বক্তব্য অনেক ভক্তকে রামকৃষ্ণের প্রতি এবং দক্ষিণেশ্বরের প্রতি আগ্রহী করেছিল, বিদ্যাসাগর কিন্তু রামকৃষ্ণের প্রভাব থেকে দূরেই অবস্থান করেছেন। তবুও বিদ্যাসাগর যে

রামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার একটি নির্ভুল প্রমাণ রামকৃষ্ণের বিদায়কালে বিদ্যাসাগরের ব্যবহার। তিনি নিজে বাতি নিয়ে পথ দেখিয়ে রামকৃষ্ণকে গাড়িতে তুলে দিলেন। মহেন্দ্রনাথের কথা অনুসারে, "বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম কবিলেন।" প্রায় ১৬ বৎসরের ছোট রামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগর নমস্কার করেছিলেন বলেই মনে হয়। আগমন ও বিদায়ের সময়ে আচরণের পার্থক্যেই বিদ্যাসাগরের পরিবর্তিত ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

রামকৃষ্ণের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বরে যান নি। এই সাক্ষাতের পর বিদ্যাসাগর আরও নয় বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৮-এর মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার কার্মাটারে গিয়েছেন ; কলকাতার নিকটবর্তী চন্দননগর, ফরাসডাঙ্গা ইত্যাদি জায়গাতেও যাতায়াত করেছেন, কিন্তু রাসমণির বাগান তার কাছে অগম্য এবং অপরিচিতই রয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের অবশিষ্ট জীবনের ধারাও রামকৃষ্ণের দ্বারা সামান্যতম প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। রামকৃষ্ণ স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যাসাগরের প্রতি ক্ষুণ্ণ হয়ে তার সমালোচনা করেছেন। ১৮৮৩ সালের ১০ই জুন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তিনি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে। বিদ্যাসাগরের এককথায় তাকে চিনেছি, কতদূর বুদ্ধির দৌড়। যখন বললুম শক্তি বিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর বললে মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বললুম, তা দিয়েছেন বৈকি। শক্তি কমবেশী না হলে তোমার নাম এত হবে কেন, তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া এইসব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই। বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলেফেললে. তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন? কি জানো, জালে প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে, রুই-কাতলা। তারপর জেলে পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনোপুঁটি-পাঁকাল এইসব মাছ বেরোয়—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?"

বিদ্যাসাগরের প্রতি রামকৃষ্ণের ক্ষোভ, তিনি যে অশ্রদ্ধেয় উপমার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন, তা রূঢ় এবং কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কিছুদিন পরে, ২৬শে সেপ্টেম্বর, আবার বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ উঠতে রামকৃষ্ণ বললেন, "বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? বিদ্যাসাগর সেদিন বললে এখানে আসবে, কিন্তু এলো না।" বস্তুতপক্ষে এই কারণেই রামকৃষ্ণের ক্ষোভ। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার, গিরীশ ঘোষ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, বিজয় গোস্বামী ইত্যাদি আরও সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তি রামকৃষ্ণের নিকট এসেছেন ; কিন্তু আসবেন বলেও বিদ্যাসাগর এক বছরের মধ্যে এলেন না। এই ঔদাসীন্য রামকৃষ্ণকে আঘাত দিয়েছিল, হয়ত তাঁর আত্মবিশ্বাস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাই রামকৃষ্ণ ভাষা ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের প্রতি রূঢ় হয়েছেন।

রামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ত্রুটিগুলির উল্লেখ কথোপকথনের সময়ই করেছিলেন। সাক্ষাতের প্রায় একবছর পরে, ২২শে জুলাই ১৮৮৩ সালে, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলছেন, "বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা-রূপা আছে। যদি সে সোনার সন্ধান পেতো, এতো বাইরের কাজ যা করবে তাতে কম পড়ে যেতো, শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জানতে পারলে

তাঁরই ধ্যানচিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে, সে খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়।" বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি আগেও বলেছেন, "ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খপর নাই।" রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের ফলে তাঁর ভাণ্ডারে রত্নের বিষয়ে বিদ্যাসাগর ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নি। ঈশ্বর সম্পর্কে, অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের এই সচেতন অনীহাটুকুই রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকারে এবং বিদ্যাসাগরের পরবর্তী আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কার্মাটারের দরিদ্র মানুষের আকর্ষণ তাঁর কাছে দুর্নিবার, কিন্তু রাসমণির বাগানের আহ্বানে তিনি কোনও আকর্ষণ অনুভব করেন নি। এইটিই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের কুহেলি-সমাচ্ছন্ন মানসলোকের দিগ্‌দর্শনস্বরূপ।

(৫)

অতএব বিদ্যাসাগরকে নিঃসংশয় বিশ্বাসী প্রমাণ করার সম্ভব হচ্ছে না। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না, একথা বলা যায় না ; তবে তিনি যে একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নাই।" ইন্দ্র মিত্র স্পষ্ট করে কোনও সিদ্ধান্তে আসেন নি ; কিন্তু তাঁর কয়েকটি মন্তব্যে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিশ্বাসের পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে। "ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির ভয়! ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির কথা এমন করে লিখতে পারতেন বিদ্যাসাগর?"[৫১] কিন্তু যে উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে ইন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলতে চেয়েছেন, সেই উদ্ধৃতিটির সম্পর্কেই সন্দেহ রয়ে গেছে। একটি সুপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে এই সন্দেহের অবকাশ না থাকলেই ভাল হোত।

ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব মতামত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হলেও তিনি যে সংশয়ীর ন্যায় আচরণে সারা জীবন একটি সংগতি রেখে চলেছিলেন এই ব্যাপারটিই আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে। তিনি সময়ের সঙ্গে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, কিংবা বয়সের সঙ্গে তাঁর অবস্থান থেকে একবারের জন্যও বিচ্যুত হননি—এতেই আমাদের বিস্ময়। গায়ত্রীমন্ত্র ভুলে যাওয়ার মধ্যে যে ঔদাসীন্য, কালক্রমে বিভিন্ন অবস্থায় সেই ঔদাসীন্যই দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শেষবয়সে যখন দীর্ঘ রোগভোগের ফলে, শরীর জীর্ণ এবং মনের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার কথা, তখনও তিনি তাঁর অবস্থানে অটল। দৈনন্দিন ধর্মাচরণের প্রতি, পূজাঅর্চনা, যাগ-যজ্ঞের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও পরিবর্তন আসেনি। আন্তরিক বিশ্বাস ও সেই কারণে গভীর আকর্ষণ ব্যতীত, কেবলমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে, কোনও দেবস্থানে যাওয়ার মধ্যে যে অসততার ইঙ্গিত আছে, বিদ্যাসাগর তা মেনে নিতে পারেন নি। সারাজীবন তাই তিনি ঈশ্বর ও ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য ও সংগতি রক্ষা করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের বিশ্বাসের প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি বিষয়টিকে একান্ত ব্যক্তিগত মনে করে তাঁর মনোভাবকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিদ্যাসাগর। সারা ভারতবর্ষে তাঁর নাম পরিচিত ছিল। মাত্র ৩০/৩২ বৎসর বয়সেই তাঁর ছবি কলকাতায় বিক্রি হোত। এইরূপ বিখ্যাত ব্যক্তিও ঈশ্বর-সম্পর্কিত তাঁর মনোভাব সাধারণ

মানুষের কৌতূহলী জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে গোপন রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়গুলি ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মানবকেন্দ্রিক মানসিকতায় ধর্ম ও ঈশ্বরের গুরুত্ব স্বাভাবিক ভাবেই কিছু লঘু হয়ে যায়। মানুষ যখন প্রথমতম ও প্রধানতম বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, তখন ঈশ্বর-ধর্ম ইত্যাদিকে কিছুটা পিছু হঠ্‌তেই হয়। বিদ্যাসাগরেরও প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষ, যে মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভেদকে অতিক্রম করে কেবলমাত্র মানুষের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করে। এইটিই আধুনিক মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য ফলশ্রুতি। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জিনিস, ঈশ্বর-বিশ্বাসও তাই। বস্তুতপক্ষে ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রধান শর্ত হোল ধর্মকে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিজীবনের সীমানার মধ্যে স্থান করে দেওয়া। শুধু অপরের প্রতি সহনশীলতায় নয়, ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে দেখার মধ্যেই আছে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অঙ্গীকার। বিদ্যাসাগর ধর্ম ও ঈশ্বরকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিজীবনের মধ্যে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছিলেন যে, তাঁর যথার্থ বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা কখনই নিঃসংশয় হতে পারিনি। ধর্মনিরপেক্ষ বা 'সেক্যুলার' মনোভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি বিদ্যাসাগর সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেছেন। এই একটিমাত্র কারণেই তাঁকে ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম মানুষ বলা যায়।

আজ শতাব্দী অতিক্রম করেও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা বা 'সেক্যুলার' মানসিকতার শিক্ষাটিকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নেতৃস্থানীয়রা আছেন, তাঁরা যদি বিদ্যাসাগরের ন্যায় ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসকে তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য করেন, এবং তাঁদের ধর্মাচরণকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য উদ্‌গ্রীব না হন, তবে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিতে সব সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করবে। নতুবা এক সার্বিক অবিশ্বাসী আবহের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি চমৎকার স্লোগান হয়েই থেকে যাবে। বিদ্যাসাগরের জীবন থেকে এই শিক্ষাটি এখনই নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দয়াময় বিদ্যাসাগর

১

বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাতৃভক্তি এবং দয়া ও করুণার ঘটনাগুলি বাঙ্গালী জীবনে লোককাহিনীতে পরিণত হয়ে গেছে। বাঙ্গালীর সামাজিক ব্যবহার এবং মূল্যবোধের উপরও এই কাহিনীগুলির প্রভাব কম নয়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই তাঁর সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। সব কাহিনীই হয়ত যথার্থ ছিল না, কিন্তু কাহিনীগুলির সত্যাসত্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ কোনও প্রশ্ন জাগে নি। বস্তুতপক্ষে, বিদ্যাসাগর তাঁর কাছাকাছি মানুষদের মধ্যে এত উচুঁতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন যে তাঁর চরিত্রে অসাধারণত্ব আরোপ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। তিনি শুধু মহাপুরুষ নন, তিনি প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। তাঁর সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনীই তাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হোত। রাজবলহাটের নিকট বীরসিংহ যাওয়ার পথে দামোদর পার হতে হোত। যেখানে বর্ষার দামোদরের বিস্তৃতি ও ক্ষিপ্রগতি ছিল ভয়ঙ্কর। সাঁতার দিয়ে ঐ নদী পার হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব।[১] কিন্তু বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালের খুব কম মনীষীই জনমানসে এতখানি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন।

বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাস্তববাদী মানুষের মনে কল্পনাবিলাস বা অকারণ ভাববাদী উচ্ছ্বাসের কোনও প্রশ্রয় ছিল না। তাঁর কোনও আধ্যাত্মিক জগৎ ছিল না; ছিল না পার্থিব ভোগবিলাসে কোনও আসক্তি। তাঁর চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রস্থলে ছিল মানুষ। তাই মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণায় তাঁর কঠোর ব্যক্তিত্বের আবরণ ভেদ করে একটি করুণাঘন হৃদয় অনায়াসে প্রকাশিত হয়ে পড়ত এবং সহজে বিগলিত হয়ে ব্যক্তি-মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত।

অতি বাল্যকাল থেকেই পীড়িতের সেবায় আনন্দ পেতেন ঈশ্বরচন্দ্র। সেইকালে সংক্রামক রোগের আধিক্য ছিল। গ্রামের পরিচিত-অপরিচিত সকলের সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অনলস। মা ভগবতী দেবীর উৎসাহ ছিল এই সমস্ত কাজে।[২] সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যাপক বা সহপাঠীর অসুখের সংবাদ পেলে রাত জেগে শুশ্রূষা করতে ঈশ্বরচন্দ্রই অগ্রণী ছিলেন। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেও তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সেবা করতেন। পূজোর ছুটিতে বীরসিংহ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহেও অনুরূপ সেবার কাজ করেছেন। শম্ভুচন্দ্রের কথায় "যে কোনও জাতীয় লোকের পীড়া হইলে সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন।"[৩] এইজন্য বাল্যকালেই গ্রামের লোক তাঁকে 'দয়াময়' এই নামে ডাকতে শুরু

করেন। কৃতজ্ঞ গ্রামবাসীর দেওয়া এই অভিধা কালক্রমে সমগ্র দেশবাসীর সমর্থন পেয়েছিল। মধুসূদন তাকে বলেছিলেন, 'দয়ার সাগর" ও "করুণাসিন্ধু বা করুণাসাগর।" বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই দু'টি অভিধাই বহু-প্রচলিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কলেরায় আক্রান্ত হলে ঈশ্বরচন্দ্রের শুশ্রূষাতেই তিনি সুস্থ হন। তেমনি অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় কলেরায় আক্রান্ত হলে প্রাণভয়ে জয়নারায়ণ ভাগিনেয়কে বাড়ীর বাইরে রেখে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র খবর পেয়ে বাড়ী থেকে বিছানা বালিশ নিয়ে গিয়ে রোগীর শোয়ার ব্যবস্থা করেন। ডঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসার ভার নিতে বলেন। নিজে শুশ্রষা ও পথ্য তৈরী ইত্যাদি করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচিয়ে তোলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরি পাওয়ার পর যখন বৌবাজারে থাকতেন, তখন প্রতিবেশী এক মোক্তারবাবুর বাড়ীর চাকর কলেরায় আক্রান্ত হলে তাকে বাড়ী থেকে বাইরে এনে রাস্তায় শুইয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে জয়নারায়ণ বা মোক্তারবাবুর আচরণ অমানবিক হলেও খুব অস্বাভাবিক ছিল না। সেই সময় সংক্রামক রোগের ভীতি এত বেশী ছিল। বিদ্যাসাগর খবর পেয়ে ঐ ব্যক্তিকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে "আপন শয্যায় শয়ন করাইলেন," এবং কয়েকদিনের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সুস্থ করলেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "এই সময় অনেক লোকের চিকিৎসাদি কাজে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এইরূপ দয়া দেখিয়া সকলেই বলিত ইনি মানুষ নহেন, সাক্ষাৎ দেবতা।"[৪] সেই সময় বিদ্যাসাগরের বয়স ছিল ২৩/২৪ বৎসর।

শুধু রোগযন্ত্রণা নয়, সমস্তরকম দুঃখকষ্ট বিদ্যাসাগরকে বিচলিত করত। চাকুরি করার সময় প্রায়ই পায়ে হেঁটে বীরসিংহে যেতেন বিদ্যাসাগর। একবার গ্রামে যাওয়ার পথে দেখলেন এক বৃদ্ধ' একটি অত্যন্ত ভারী বোঝা নিয়ে অতি কষ্টে পথে চলছে। শুনলেন বৃদ্ধের পুত্রই এই বোঝা বাপের মাথায় তুলে দিয়ে বাড়ীর পথে এগিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর ঐ বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে কয়েক মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। আর একবার বীরসিংহ—কলকাতার পথে ; সদ্যমৃত এক দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন বিদ্যাসাগর। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে মৃত ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ভরণপোষণের জন্য কিছুই রেখে যাননি। সেই অপরিচিত মৃত ব্যক্তির নিকট বিদ্যাসাগরের বেশ কিছু ঋণ ছিল. এই মিথ্যা অজুহাতে তিনি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অর্থসাহায্য করলেন। কলকাতার পথে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চোখে জল দেখে বিদ্যাসাগর তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন। বিদ্যাসাগরের অতিসাধারণ বেশভূষা দেখে ব্রাহ্মণ প্রথমে তাঁকে অগ্রাহ্য করলেও শেষ পর্যন্ত জানালেন যে, কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য মোটা অঙ্কের ঋণ করতে হয়েছিল। শোধ করতে না-পারার জন্য ঋণদাতা আদালতে নালিশ করেছেন ; তাতে ভিটে-মাটি ক্রোক হওয়ার সম্ভাবনা। সেইজন্য ব্রাহ্মণ চোখের জল ফেলছিলেন। বিদ্যাসাগর নিজের পরিচয় না দিয়ে মোকদ্দমার নম্বর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিবরণ জেনে নিলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন ব্রাহ্মণের কথা সঠিক। মোকদ্দমার তারিখ আসার আগেই সুদে-আসলে মোট ২৪০০ টাকা কোর্টে জমা দিলেন। ব্রাহ্মণ ঋণমুক্ত হলেন, কিন্তু কোনও দিনই জানতে পারলেন না সেই মানুষের নাম যিনি তাঁকে ঋণমুক্ত করেছিলেন।[৫] মাদ্রাজ প্রদেশবাসী একব্যক্তি কলকাতায় এসে অর্থাভাবে বিপদে পড়েন। লোকমুখে বিদ্যাসাগরের বদান্যতার কথা শুনে তিনি একটা চিঠি পাঠিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর চিঠি পেয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করেন।

আর্থিক সাহায্য নিতে অনেকের আত্মমর্যাদায় বাধত বলে গোপনে সাহায্য দিতেন বিদ্যাসাগর। গোপনীয়তা রাখার জন্যই অনেক 'মাসোহারা'-প্রাপকের নামও লিখে রাখতেন না। একবার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত লেখা শুরু করেন। বিদ্যাসাগর দু'চার কথা শোনার পর বলেন,"লেখা ভাল হইয়াছে; কিন্তু দান ও সাহায্য বিষয়গুলি উঠাইয়া দিও, নতুবা অনেকে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইবেন।" কিন্তু আমি এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার পূর্বে অনেককে জিজ্ঞাসা করায় যাঁহারা ঐ বিষয় মুদ্রিত করিতে আপত্তি করিলেন, তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিলাম না, এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও সরলভাবে অনুমতি দিলেন, তাঁহাদের বিষয় মুদ্রিত করিলাম"।[৭] নিজের আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর ছিল বলেই বিদ্যাসাগর গ্রহীতার আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষার জন্য এতখানি সংবেদনশীল হতে পেরেছিলেন।

বীরসিংহে যাওয়ার সময় প্রত্যেকবারই ৪/৫ শত টাকা এবং প্রায় অনুরূপ টাকার কাপড়-চোপড় নিয়ে যেতেন। প্রয়োজনমত টাকা ও কাপড়চোপড় দিতেন গ্রামবাসীদের। দিনের বেলা লজ্জায় দান গ্রহণ সম্ভব হোত না বলে, রাত্রের অন্ধকারে বিদ্যাসাগর স্বয়ং সাহায্যের টাকা বা কাপড়চোপড় পৌঁছে দিয়ে আসতেন।[৮] বিহারীলাল সরকার অনেক পরিশ্রমে বিদ্যাসাগরের জীবনীরচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের এ বিপন্নোদ্ধারে কোটিপতি ধনকুবেরকে সবিনয়ে সহস্রবার মস্তক অবনত করিতে হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, পারসিক—যে কেহ হউন না, বিদ্যাসাগরের নিকট হাত পাতিয়া কেহ কখনও বঞ্চিত হন নাই।"[৯]

বর্ধমানে মহামারীর সময়ে বিদ্যাসাগরের জাতি-ধর্মনির্বিশেষে পীড়িতের সেবার উজ্জ্বল উদাহরণ। জলবায়ু ভাল ছিল বলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সেই সময় অনেকেই বর্ধমানে আসতেন। ১৮৬৮ সালে দীর্ঘকাল বাস করার অভিপ্রায়ে এখানে এসে বর্ধমান-মহারাজার কমলসায়রের বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। তিনি ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহারাজা ভাড়া নিতে অস্বীকার করেন। অল্পদিনের মধ্যে কমলসায়রের আশেপাশে দরিদ্র মুসলমান পরিবারগুলি "তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মধ্যে, পোষ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।"[১০] অনেক পরিবারকে অর্থসাহায্য করেন, আবার অনেক পরিবারকে মূলধন দিয়ে সাহায্য করে তাদের স্থায়ী অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। ১৮৬৯ সাল থেকে দীর্ঘদিন ধরে "বর্ধমান-জ্বর" নামে এক মহামারীর জন্য দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। এই মহামারীর সময়েই "বিদ্যাসাগর মহাশয় দুশ্ছেদ্য দরিদ্রবাৎসল্যনিবন্ধন" বর্ধমানে এসে একটি বাগানবাড়ী ভাড়া করে প্রায় দুই বৎসর বাস করেন। প্রথমে সরকারী চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রতুলতার প্রতি লেঃ গর্ভনর গ্রে এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারী চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে প্রয়োজনের উপযোগী করার জন্য চেষ্টা করেন। অতিরিক্ত অন্ততঃ ৪টি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয় এবং একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়েরও বন্দোবস্ত করা হয়। তারপর তিনি নিজের খরচে ডাঃ গঙ্গানারায়ণ মিত্রের তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যও দেওয়া হোত। দরিদ্র রোগীদের পরার কাপড় ছিল না বলে একবার দু'হাজার টাকার কাপড় কিনে রোগীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। ভেদাভেদের জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে কোনও দরিদ্র ব্যক্তি যেন বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাঃ গঙ্গানারায়ণ মিত্রের পরিচালনা ও চিকিৎসাগুণে রোগীর সংখ্যা

ছিল অনেক। কুইনিনের অনেক দাম বলে ডাক্তার দরিদ্র রোগীদের জন্য কুইনিনের বদলে সিঙ্কোনা ব্যবহার করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "যখন পীড়া একই প্রকারের। তখন বড়লোক ও দরিদ্র ব্যক্তি নির্বিশেষে একই ওষুধ হওয়া উচিত।"[১১] তাই হলো। সব রোগীর জন্য এক প্রকারের ওষুধের ব্যবস্থা করতে হলো। বিদ্যাসাগর একজন ভ্রাম্যমাণ ডাক্তারও নিয়োগ করেছিলেন। তিনি শুধু বিনা পয়সায় ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থাই করেন নি, রোগীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে পথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসেরও ব্যবস্থা করতেন। এই সময় বিদ্যাসাগর প্রায় দুই বৎসরের বেশীর ভাগ সময় বর্ধমানে ছিলেন। ডাঃ গঙ্গানারায়ণ মিত্র খুব ঘনিষ্ঠভাবে বিদ্যাসাগরকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দরিদ্রজনের দ্বারে দ্বারে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকলের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে দেখিয়াছেন কৃশ ও রুগ্ণ মুসলমান শিশু-সন্তান তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে। কেহ বা আত্মচেষ্টায় তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তাঁহার উপবীত পরিশোভিত দেহ অপবিত্র হয় নাই। ব্রাহ্মণ পন্ডিত বিদ্যাসাগরে এইরূপ চিত্র কী সুন্দর! কি উদার!"[১২] পীড়িতের সেবায়, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিতে বিদ্যাসাগর মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য করতেন না।

১৮৬৬ সালে 'উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ' দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। জাহানাবাদ মহকুমায় ফসলহানি ছাড়াও, অকৃষিজীবী মানুষদের ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শম্ভুচন্দ্র তখন বীরসিংহেই বাস করতেন এবং এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি লিখছেন, "জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি গ্রামে অধিকাংশ তাঁতীর বাস। তাঁতীরা বস্ত্রবয়ন ব্যতীত অন্য কোনও কার্য করিতে অক্ষম। সুতরাং যে অবধি বিলাতি কলের কাপড় হইয়াছে, তদবধি তন্তুবায়গণের অবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। যেরূপ কাপড় ইহারা ২$\frac{১}{২}$ টাকা জোড়া বিক্রয় করিত, সেইরূপ কলের কাপড় ১$\frac{১}{২}$ টাকা বা ১$\frac{৩}{৪}$ টাকা জোড়া বিক্রয় হইতেছিল। সুতরাং তৎকালে ইহাদের বস্ত্র বিক্রয় হইত না।"[১৩]

বীরসিংহ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দলে দলে ক্ষুধার্ত মানুষ বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে ভীড় করত। বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায়। খবর পেয়ে তিনি শম্ভুচন্দ্রকে লিখলেন, "স্বগ্রাম বীরসিংহ ও উহার সন্নিহিত পাঁচ ছয়টি গ্রামের দরিদ্রগণকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে পারিব। অন্যান্য গ্রামের লোককে কেমন করিয়া খাওয়াইতে পারি। যেহেতু আমি ধনশালী লোক নহি। ...... এমনস্থলে জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটবাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে আমার নাম করিয়া বলিবে যে তিনি জাহানাবাদ মহকুমার দুর্ভিক্ষের কথা গভর্নমেন্টে রিপোর্ট করিলে আমি এখানে লেঃ গভর্নর সিসিল বিডনকে দিয়া সাহায্য করাইতে পারিব।"[১৪] তাই হলো। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে এবং ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা, রামজীবনপুর, শ্যামবাজার ও খানাকুলে অন্নছত্র খোলা হয়। বীরসিংহে যে অন্নছত্রটি খোলা হয় তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন বিদ্যাসাগর। তত্ত্বাবধান করতেন শম্ভুচন্দ্র এবং প্রত্যেকদিন রান্নার তদারক করতেন ভগবতী দেবী স্বয়ং। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়তে থাকায় অন্নছত্রেও অভুক্ত মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল। বিদ্যাসাগর মাসে অন্তত একবার বীরসিংহে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা দেখে আসতেন এবং প্রয়োজনীয় টাকা দিয়ে যেতেন। একবার অন্নছত্রে লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির খবর পেয়ে

লিখলেন, "অভুক্ত যত লোক আসিবে সকলকেই সমাদরপূর্বক ভোজন করাইবে; কেহ যেন অভুক্ত ফিরিয়া না যায়। ত্বরায় টাকা পাঠাইতেছি এবং আমিও সত্বর বাটী যাইতেছি।"[১৫] অনেকে অন্নছত্রে খেতে সঙ্কুচিত হতেন বলে তাঁদের জন্য 'সিধা'র বন্দোবস্ত করেছিলেন। খিচুড়ির পরিবর্তে, দুঃস্থ মানুষদের অনুরোধে, মাঝে মাঝে ভাত-ডাল-মাছ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের পরিবেশন করতে উচ্চবর্ণেরা ইতস্তত করত দেখে বিদ্যাসাগর নিজে তাদের পরিবেশন শুরু করেন। এমনকি ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের রুক্ষমাথায় নিজের হাতে তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু খাবার নয়, বিনা পয়সায় চিকিৎসা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া, সবাইকে পরিধেয় বস্ত্রও দেওয়া হয়েছিল। দরিদ্র 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর কিছু লোকের আত্মমর্যাদায় বাধত বলে গোপনে সাহায্য করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সরকারী ব্যবস্থায় অন্নছত্রে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ কোনও রকমে জীবনধারণ করতে পারত; কিন্তু বীরসিংহের অন্নছত্রে শুধু জীবনধারণের অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসাই পেত না, বিদ্যাসাগর ও ভগবতী দেবীর অকৃত্রিম সহমর্মিতার স্পর্শে তাদের দলিত, ক্লিষ্ট মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়ে উঠত। পীড়িতের সেবার জন্য বীরসিংহ অঞ্চলের মানুষ প্রথম যৌবনেই বিদ্যাসাগরকে বলত 'দয়াময়'; দুর্ভিক্ষের পর সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর নাম হলো 'দয়ার সাগর'।

প্রায় ছয়মাস[১৬] একটি অন্নছত্র চালাতে কত খরচ হয়েছিল বিদ্যাসাগরের? হিসাব একটা রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভুলেও খরচের কথা কখনও কারুর কাছে উল্লেখ করেন নি। দান করে বা পরোপকার করে গ্রহীতার আত্মমর্যাদা যাতে কোনওক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তেমনি ছিল নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস। শতাধিক বৎসর পরে তাঁর সাহায্য-দানের বিস্তৃতি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। বিহারীলাল ও চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরা অনেক ব্যক্তিকেই জানতেন যারা তাঁর কাছে সাহায্য পেয়েছেন। চণ্ডীচরণ লিখছেন, "লোকে পিতৃমাতৃদায় জানাইলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন, কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছি না বলিয়া তাঁদের নিকট বিপদ জানাইলে তিনি সাহায্য করিতেন, সংসারে দৈনিক উদরান্নের জন্য ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইয়া সংসারের সমস্ত সংস্থান বিনষ্ট করিয়াছে, মাথা রাখিবার স্থানটুকু বন্ধক দিয়াছে, আর ২/৪ দিন পরে ঋণদাতা ঘরবাড়ী ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবে, এইরূপ বিপদে তিনি লোককে সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কৃতজ্ঞতা আমরা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি।"[১৬]

অনেক সময় সাহায্য কেবলমাত্র একবারের জন্য নয়, প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য দীর্ঘ দিন ধরে দিয়েছেন। অন্নছত্রের বন্ধ হওয়ার পরও বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রের নিকট খোঁজখবর নিয়ে জানলেন যে অন্নসংস্থানে সামর্থ্যহীন দীনমজুর বা বৃত্তিভোগী পরিবারের বেশ কয়েকটির অবস্থা খুবই খারাপ; একবেলাও খাবার জুটছে না। ঠাকুরদাস বেশ কিছুদিন আগে বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। খরচ হোত প্রায় ছয়-সাতশত টাকা। বিদ্যাসাগর ঐ টাকা দিয়ে পরিবারগুলিকে সাহায্য করার কথা চিন্তা করলেন। ভগবতীদেবী সোৎসাহে সমর্থন করে বললেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক খাইতে না পাইলে পূজা করিবার অবাশ্যক নাই। তুমি গ্রামবাসীদিগকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিলে আমি পরম আহ্লাদিত হইব।" ঠাকুরদাস তখন কাশীবাসী; সুতরাং জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ করে দেওয়া কঠিন হোল না। গ্রামের লোক "দরিদ্র নিরুপায় লোকদের" তালিকা তৈরি করে দিলেন। শম্ভুচন্দ্রকে চিঠিতে লিখলেন, "তুমি পূর্বাবধি যেরূপ নিরুপায়

আত্মীয়দিগকে ও বিধবাবিবাহ সম্পর্কীয় নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে ফর্দানুসারে টাকা বিতরণ করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ এই ফর্দানুসারে গ্রামস্থ নিরুপায় ব্যক্তিদিগকেও মাসে মাসে টাকা দিবে।"[১৮] উল্লেখ্য যে, তিনি সরকারী কয়েকটি অন্নছত্রেও টাকা ও কাপড় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

প্রার্থীদের নিকট বিদ্যাসাগরের বাড়ী ছিল অবারিত দ্বার। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত চলত প্রার্থী ও দর্শনার্থীদের আনাগোনা। ফলে শরীরের উপর অত্যাচার হোত বলে আত্মীয়রা অনেক সময় দারোয়ান রাখার কথা বলতেন। বিদ্যাসাগর কর্ণপাত করতেন না। দর্শন-প্রার্থীদের বাধা দিলে কিংবা কোনও ভাবে বিদায় করে দিলে তিনি অখুশীই হতেন। ১৮৬৫-৬৬ সালে তিনি যখন বর্ধমানে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন সেই সময় বিদ্যাসাগরের পঁচিশ বছরের পুরাতন রাঁধুনি হরকালী চৌধুরী কয়েকজন সাহায্যপ্রার্থী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখা না করিয়ে বিদায় করে দেন। কারণ কয়েকদিন আগেই ঐ স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা ও কাপড় নিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর শুনে এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, তৎক্ষণাৎ হরকালীর বেতন মিটিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন; হরকালীর কোনও কৈফিয়তেই কর্ণপাত করলেন না। অবশ্য হরকালীর সংসার চালাতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য মাসিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা করেন।[১৯]

জীবনের শেষপ্রান্তে যখন তিনি রোগযন্ত্রণায় কাতর, তখনও কোনও দর্শনপ্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতেন না। বায়ুপরিবর্তন ও রোগযন্ত্রণায় উপশমের জন্য তিনি তখন চন্দননগরে "মেজরের কুঠি" নামে একটি বাড়ীতে থাকতেন। এই বাড়ীটির মালিক ছিলেন চক্দীঘির জমিদার সিংহরায়েরা। -- দিন একজন দর্শনপ্রার্থী বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন মণিলাল সিংহরায়কে জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর বাড়ীতে আছেন কিনা। মণিলাল তাকে জানালেন যে বিদ্যাসাগর কলকাতায় চলে গেছেন। বিদ্যাসাগর সে সময় একটু দূরেই পায়চারি করছিলেন। তিনি দ্রুত নিকটে এসে লোকটিকে বললেন যে, মণিলাল জানত না তিনি গত রাত্রেই কলকাতা থেকে চন্দননগরে ফিরে এসেছেন। "এই বলিয়া সাদরে তাহাকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন।" পরে মণিলালকে জিগ্যেস করলেন, "তুই মিথ্যে বলে ঐ লোকটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছিলি কেন?" মণিলাল সিংহের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাতির সম্পর্ক। তাই তিনি রসিকতার ভাষায় জবাব দিলেন, "আপনি কেবল নাকে কাঁদেন যে, আর পারি না। লোকের জ্বালায় যাই কোথায়।" বিদ্যাসাগর মণিলালকে সতর্ক করে দিলেন, "আর অমন করে লোক ভাগাস্ নে।" তারপর বললেন," "ভাই রে, যতদিন বেঁচে থাকি যথাসাধ্য পরের জন্য যা পারি করার চেষ্টা করব।"[২০] বিদ্যাসাগরের এই কথার মধ্যে তাঁর মানসিক প্রবণতার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান শারীরিক অক্ষমতার দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রার্থীরাই আসত না, বিদ্যাসাগর নিজেই মানুষের প্রয়োজন জানার জন্য তাদের কাছে যেতেন। বর্ধমানে বাস করার সময় মাঝে মাঝে পালকিতে চড়ে বীরসিংহে যেতেন বিদ্যাসাগর। পথে কোথাও পালকি থামলে গ্রামের দরিদ্র ছেলেরা ভীড় করত। বিদ্যাসাগর "ছোট ছোট বালক-বালিকাদের আন্তরিক ভালবাসিতেন", তাদের সবাইকে মিঠাই খাওয়ার পয়সা দিতেন এবং তাদের মধ্যে যারা খুব গরীব তাদের কিছু কিছু সাহায্য করতেন। সাংসারিক অবস্থা বুঝে দু-একজনকে সঙ্গে করে বীরসিংহে নিয়ে আসতেন। দু'-চার দিনের মধ্যে মাসিক বেতন ঠিক করে বাড়ীর বা স্কুলের কাজে লাগিয়ে দিতেন। বর্ধমান বীরসিংহের পথে হাজিপুর নামক গ্রামে সেই প্রার্থী বালকের ("তামলি জাতীয় দ্বাদশবর্ষীয় বালক") বহুশ্রুত ঘটনা, যে সামান্য একটাকা

সাহায্য থেকে একটি দোকানের মালিক হয়েছিল নিজের পারিশ্রম ও ব্যবসাবুদ্ধির জোরে। শম্ভুচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায় প্রকৃত ঘটনা একটু ভিন্ন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথোপকথনে ছেলেটি তার ঐ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছিল। বিদ্যাসাগর তাকে বীরসিংহে এনে, "কয়েকদিন বাটীতে রাখিয়া একটি ডালি দোকান করিবার উপযুক্ত টাকা দিয়া বিদায় করেন।"[২১] দৈনন্দিন জীবনের দয়া ও সহানুভূতির কাহিনীর সংখ্যা অনেক; কিন্তু প্রচলিত এবং লিখিত কাহিনী বস্তুতপক্ষে, প্রকৃত ঘটনার ভগ্নাংশ মাত্র। ফরাসডাঙ্গায় একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতেন বিদ্যাসাগর। গঙ্গাতীরের আবহাওয়ায় রোগের কিছু উপশম হোত। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে এক মহিলাকে একটি অসুস্থ ছেলেকে কোলে নিয়ে বেড়াতে দেখলেন। ছেলেটির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি পায়ের হাড়ের কোনও বৃদ্ধি হচ্ছিল না, বরং শুকিয়ে যাচ্ছিল। দুরারোগ্য ব্যাধি। ডাক্তাররাও আশা দেন নি। ছেলেটির বাবা-মা যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ছেলেটিকে কলকাতায় এনে মেডিকেল কলেজে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দেখালেন। অসুখ সারল না, কিন্তু কিছু উপশম হোল। বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছিলেন, "একেবারে সারে নাই, তবে যেমনটি ছিল অন্তত তেমনটিই থাকবে, আর বাড়বে না এইটুকু লাভ।" রোগযন্ত্রণায় কাতর সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের একটি অপরিচিত বালকের জন্য কতখানি উদ্বেগ ও সহানুভূতি! চকদীঘিতে জমিদারদের সাহায্যে যে স্কুল স্থাপন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর একদিন সেই স্কুল দেখতে গিয়ে পাশের গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবারের বাড়ীতে গেলেন। পরিবারটি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে মাসিক সাহায্য পেত। একটি অতি রোগা ছেলেকে দেখে তার দুধ খাওয়ার খরচ হিসাবে মাসে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা করে সাহায্য পাঠিয়ে দিলেন। ক্রমে ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠল।[২২] কান্দীর জমিদাররাও বিদ্যাসাগরের পরামর্শে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। স্কুলের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর কান্দীর রাজবাড়ীতে গেছেন। সেখানে কলকাতার দয়েবহাটের ভুবনমোহন সিংহের বোন ক্ষেত্রমণি দেখা করলেন, দুঃস্থ অবস্থা ক্ষেত্রমণির। ভুবন সিংহেরও তাই। তার বাড়ী সম্ভবত মারোয়াড়-নিবাসী তমসুকদাসের হাতে চলে গেছে এবং ব্যবসাও নষ্ট হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর ভুবন সিংহকে মাসিক ৩০ টাকা সাহায্য দেন। ক্ষেত্রমণিকেও দিলেন মাসে ১০ টাকা করে।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য পরিচিত জনদের মধ্যে কতজন যে মাসিক সাহায্য পেতেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল। এই সাহায্য তাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য ছিল; কারণ যাঁরা সাহায্য পেতেন, তাঁদের অনেকের পক্ষেই উপার্জন করা সম্ভব ছিল না। "বিধবা, হতভাগিনী স্ত্রীলোক সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেই তাহার করুণারসের উদ্রেক হইত।" সেইজন্য প্রত্যেকবার বীরসিংহে গিয়ে অন্তত ৪/৫ শত টাকার কাপড় ঐরূপ দুঃস্থ অনাথাদের দিতেন। কামারপুকুরের নিকট এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়ে ভাঙ্গাবাড়ী দেখে সেই আত্মীয়বাড়ী সারাবার সমস্ত খরচ দেন। এবং শম্ভুচন্দ্রকে "এ বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করেন।"। মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৩-১৮৫৮) মেধাবীছাত্র, সফল অধ্যাপক, এবং স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী বিদ্যাসাগরের বন্ধু, কিছুদিন পর্যন্ত সংস্কৃত প্রেসের সমান অংশীদার। কিন্তু মদনমোহন মুর্শিদাবাদে "জজপণ্ডিত" হয়ে যাওয়ার পর কয়েকটি কারণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মদনমোহনের মনোমালিন্য হয়। মদনমোহনের জামাতা বিদ্যাসাগরের নামে নানা কুৎসা প্রচার

করে সেই দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে দেন। মদনমোহনের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর শুনলেন যে তাঁর মা তখনও জীবিত ও অর্থকষ্টে আছেন। বিদ্যাসাগর আশ্চর্য হলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে মাসে মাসে দশটাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। কিছুদিন পরে মদনমোহনের মা বিদ্যাসাগরের নিকট এসে সংসারে অশান্তির অভিযোগ করলেন। বিদ্যাসাগরের কাশী যাওয়ার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিদ্যাসাগরের খরচেই কাশীবাস করতে লাগলেন। জীর্ণশীর্ণ রোগগ্রস্তা বৃদ্ধা কাশীর জল-হাওয়ায় স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন তিনি।[২৪] বীরসিংহে প্রতিবেশী নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পিতামহী দুর্গাদেবীর "প্রতিষ্ঠিত" অশ্বত্থগাছ নিয়ে মামলা হল বিদ্যাসাগরের। নবকুমারকে বিদ্যাসাগরই লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তার করেছিলেন এবং নাড়াজোলের জমিদারী এস্টেটে চাকুরিও করে দিয়েছিলেন। তিনিই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা করে শম্ভুচন্দ্রকে জেলে পাঠাতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, অনেক টাকা খরচ হয় মামলায়। শেষ পর্যন্ত মামলায় জিতলেন বিদ্যাসাগর। ইতিমধ্যে নবকুমারের মৃত্যু হলো। নবকুমারের স্ত্রী কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে সসম্মানে থাকলেন। যথারীতি টাকা কাপড় ইত্যাদি নিয়ে বিদায় হলেন।[২৫] সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মা ছাড়াও তাঁর কন্যা কুন্দমালা এবং ভাগিনী বামাসুন্দরী মাসে মাসে টাকা পেত বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর তাঁর উইলেও এঁদের জন্য যথাক্রমে মাসিক দশটাকা ও তিনটাকা বৃত্তি ধার্য করে গিয়েছিলেন। মদনমোহনের জামাতা যোগেন্দ্রনাথের কুৎসায় কিংবা প্রতিবেশী নবকুমারের অকৃতজ্ঞতায় দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের জন্য তাঁর হৃদয়ের করুণার উৎস শুকিয়ে যায় নি।

বিদ্যাসাগরের প্রায় দু'হাজার চিঠি ছিল শম্ভুচন্দ্রের কাছে। কারণ, তাঁর নিজের কথামত, "আমি চিরকাল অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ অনুসারে তদীয় নানা দেশহিতকর কার্যে প্রায় ৪২ বৎসর অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি।"[২৬] বীরসিংহ অঞ্চলে সাহায্যদান, বিধবাবিবাহ ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের জন্য শম্ভুচন্দ্রই ছিলেন বিদ্যাসাগরের প্রতিনিধি। তাঁকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠিতে অনেক নাম ও টাকার হিসাব পাওয়া যায়,—যে-টাকা মাসিক সাহায্য হিসাবে গ্রামের দুঃস্থ ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনকে দেওয়া হোত। মৃত্যুর প্রায় তিনমাস আগে শম্ভুচন্দ্রকে লেখা চিঠিতেও ৫৬৩ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।[২৭] বীরসিংহ অঞ্চল ছাড়া কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলের কিছু কিছু লোক সাহায্য পেত। কাশীতেও সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধ ও বিধবাদের অনেকেই সাহায্য পেতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ভরত শিরোমণির কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী, বিদ্যোৎসাহী অমৃতলাল মিত্র, রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার, রাধানাথ চক্রবর্তী ইত্যাদি একদা সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তিরাও। তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বৃত্তিনির্ভর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর অবলম্বনহীনতার জন্যই বিদ্যাসাগরের পরিচিত-বৃত্তের মধ্যে এতগুলি মানুষকে তাঁর দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এঁদের মধ্যে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্বার্থপরতা ও নীচতা। বিদ্যাসাগর সে সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর কেবল বিধবাবিবাহ দেওয়ার জন্যই ঋণগ্রস্ত হননি, মধুসূদন দত্তকে অনাহার ও অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য ঋণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম ঋণ শোধ না করা সত্ত্বেও মধুসূদনকে আবার ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। সর্বমোট কত ঋণ ছিল মধুসূদনের বিদ্যাসাগরের

কাছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল। কারণ বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী অত্যন্ত সংযতবাক্ ছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। মধুসূদনের জীবনীকাররা বলেছেন যে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করেছিলেন। ঋণশোধের থেকে অমিতব্যয়ী মধুসূদনের অভ্যাসের পরিবর্তন হবে, এই আশা ছিল বিদ্যাসাগরের। মাইকেল, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত উক্তিগুলি সত্ত্বেও, আচারে-ব্যবহারে বিদ্যাসাগরকে আঘাত দিয়েছেন ; কিন্তু প্রতিভামুগ্ধ বিদ্যাসাগর এগুলি উপেক্ষা করেছেন। মধুসূদনের অকালমৃত্যুতে[২৮] বিদ্যাসাগর গভীর শোক পেয়েছিলেন। চণ্ডীচরণ মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের নিকট অর্থ-সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। "বহু আলাপ-বিলাপের পর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদ্যাসাগর বললেন, 'প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যাঁহার জান রাখিতে পারি নাই, তাঁহার হাড় রাখিবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।"[২৯]

মধুসূদন ঋণশোধে বিলম্ব করেছিলেন। কিন্তু আরও অনেক ঋণের ঘটনা আছে, সেখানে অসামর্থ্যের জন্য নয়, ইচ্ছাকৃত ভাবে ঋণগ্রাহক ঋণ শোধ করেন নি। অনেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এই আশঙ্কায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখাও করেন নি। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পাঁচশত টাকা ধার নিয়েছিলেন, কিন্তু তার পর তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন নি। রাধানগরের রামকমল মিশ্র ও গঙ্গাদাসপুরের গোরাচাঁদ দত্তকে, বিদ্যাসাগর নিজে টাকা ধার করে আদালতে জমা দিয়ে, গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট থেকে বাঁচিয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁরা টাকাও শোধ করেননি বা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখাও করেন নি।[৩০] এইরূপ অনেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের পরিচিত কৈলাস বসুর সঙ্গে নাটোরের এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ৭ দিনের জন্য সাত শত টাকা ধার নিতে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর টাকা দিয়েছিলেন বেশ কিছুটা ইতস্তত করেই। কিন্তু চারদিনের মধ্যে যখন কৈলাস বসু সহ সেই সাব্-ইন্সপেক্টর টাকা শোধ দিতে গেলেন, তখন তাঁর ক্ষোভ আর কোনও সংযম মানে নি। তিনি দারোগাবাবুকে বললেন, "তুমি ভদ্রসন্তান হইয়া আমাকে প্রবঞ্চনা করিলে, আর তুমি আমার পরিচিত হইয়া (কৈলাস বসু) আমার সঙ্গে চাতুরি করিলে।"[৩১] হতভম্ব দারোগা এবং কৈলাস বাবু প্রথমে কিছু বুঝতে পারেন নি ; পরে বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলেন। বিদ্যাসাগরের ক্ষোভ এবার সংযত ভাষায় প্রকাশ পেল। যে দেশে একবার নিলে আর ফেরত দিতে চায় না, সে দেশে কেমন করে বিশ্বাস হবে যে ৭ দিনের জন্য টাকা নিয়ে ৪ দিনের মধ্যে ফেরত দেবে!

একবার কিছুদিনের জন্য স্বাস্থ্যের কারণে কার্মাটার যাওয়ার প্রয়োজন। 'মাসোহারা' প্রাপকরা সময়ে টাকা না পেলে অসুবিধায় পড়েন। তাই মাসোহারার ২৫০০ টাকা একজন বিশ্বাসী আত্মীয়ের হাতে দিয়ে তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কার্মাটারে রওনা হলেন বিদ্যাসাগর। একমাস পরেই ক্রমাগত চিঠি আসতে শুরু হলো কেউই টাকা পাননি। বিদ্যাসাগরকে কলকাতায় ফিরে আসতে হলো। লজ্জিত মুখে সেই আত্মীয় বললেন যে তিনি বিশেষ প্রয়োজনে টাকাটা খরচ করে ফেলেছেন, পরে ফেরত দেবেন। কিন্তু সে টাকা তিনি আর কোনও দিন ফেরত দেননি।[৩২] স্বার্থপরতা ও নীচতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত পেয়েছেন বিদ্যাসাগর। কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে একটি অনাথ বালককে বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে ছেলেটির ভগিনীপতি লক্ষপতি ধনী। উত্তরপাড়া থেকে একটি বালক

দারিদ্র্যের অজুহাতে বিদ্যাসাগরের নিকট নিয়মিত বই চেয়েছিল। প্রতি বছর ডাকযোগে বিদ্যাসাগর তাঁর কাছে বই পাঠান। এইভাবে পাঁচ-ছয় বৎসর পাঠাবার পর উত্তরপাড়ার হেডমাস্টারের নিকট অনুসন্ধান করে জানলেন যে, ঐ নামে কোন ছেলে উত্তরপাড়া স্কুলে পড়ে না। তবে ঐ নামের একজন পুস্তকবিক্রেতা বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বই আনিয়ে স্কুলের ছেলেদের নিকট বিক্রি করে।[৩৩]

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি করেছিলেন 'হিন্দু এ্যানুয়িটি ফান্ড' বা 'হিন্দু পারিবারিক বৃত্তিভাণ্ডার'। ১৮৭২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনে এক সভায় এই ফাণ্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এতে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও প্রেরণা অবশ্যই ছিল। প্রথম বৎসর তিনি ও দ্বারকানাথ মিত্র এর ট্রাস্টি ছিলেন। মাসে কিছু টাকা জমা দিলে পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরিবারের জন্য কিছু নিয়মিত অর্থসংস্থান থাকবে। এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু মাত্র চারবৎসর পরেই বিদ্যাসাগর এই ফাণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। কারণ "যাঁহাদের হাতে ফান্ডের কার্যভার অর্পণ করা হয়েছিল, তাঁরা সরল পথে চলেন না।" বিদ্যাসাগর তাঁর পদত্যাগ-পত্রে (২১ ফেব্রুয়ারি ,১৮৭৬) ডাইরেক্টর, সেক্রেটারী ইত্যাদি নিয়ম মানেন না বলে অভিযোগ করলেন।[৩৫] আরও অনেক অভিযোগ ছিল,—যেগুলির বেশ কয়েকটির হয়ত আলোচনার মাধ্যমেই মীমাংসা করা যেত, কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন অনমনীয়। বস্তুতপক্ষে তিনি প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেও তিনি সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে পারলেন না। চণ্ডীচরণ যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলেছেন, "তিনিও দশজনের দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া দশজনের সহিত মিলেমিশে কাজ করিতেন না।"[৩৬] এই প্রতিষ্ঠানটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীকে যতটা সাহায্য করতে পারত, ঠিক ততখানি সম্ভব হয়নি।

২

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনে মানুষের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচরণ দেখেছিলেন অনেক। স্বার্থপরতা ও লোভ তাঁর পারিবারিক জীবনেও বড় কম দেখেন নি। বস্তুতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত ভূমিব্যবস্থা, শিল্পায়নের অভাব ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সমাজের মধ্যবিত্তশ্রেণীর আর্থিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুধু উপরের তলায় ওঠার জন্যই নয়, এই শ্রেণীকে নীচের তলায় নেমে না যাওয়ার জন্য সতর্ক থাকতে হোত। ফলে একধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মিথ্যাচার, স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা জীবনকে গ্রাস করেছিল। বিদ্যাসাগর স্বাভাবিক ভবেই এই সমস্ত ভাঙ্গাচোরা মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাদের আচরণে আঘাতও পেয়েছিলেন মর্মান্তিক। সেইজন্যেই অনেক সময় তীব্রভাবে তাঁর ক্ষোভের কথা বেরিয়ে আসত। যার ফলে অনেকের মনে হতো তিনি misanthrope বা মানব-বিদ্বেষী। যেমন মনে হয়েছিল কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের। কৃষ্ণকমল বলেছেন, "বিস্তর লোকের ব্যবহার তাহার প্রতি কদর্য হইয়াছিল যে, অনেক সহ্য করিয়া তিনি অসংযতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন।" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনে "তাহার প্রাণে এমন দারুণ নরবিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহার জন্য আমরাই অনেক পরিমাণে দায়ী। কারণ আমাদের আচরণ দেখিয়াই তাঁহার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।"[৩৭] তিনি মাঝে মাঝে আর্তভাবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলে মন্তব্য

করতেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত-পুরুষ মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভাল হয়।" কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে বলিলে বলিতেন, "রও, ভেবে দেখি সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি ত কখনও তাহার কোনও উপকার করিনি।" তিনি সমস্ত অসম্পূর্ণ মানুষের কথাই বলেছেন তাঁর আক্ষেপে। দেশের মাটিই খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই মানুষও হচ্ছে খারাপ। তাই মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি সমস্তই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। তাই উপকৃত ব্যক্তি উপকার স্মরণ করে না।[৩৮]

কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই ক্ষোভ ও আক্ষেপকে কি তাঁর মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বলে মনে করা যায়? তিনি কী সত্যিই মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন?

সন্দেহ নাই, বিদ্যাসাগর তাঁর চারিপাশের মানুষের ব্যবহারে আহত হয়েছিলেন। সেই আহত হওয়ার কারণ শুধু মাত্র কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব নয়, শুধু নীচতা বা স্বার্থপরতা নয়। তাঁর গভীর ভাবে আহত হওয়ার আর একটি কারণ ছিল তাঁর নিঃসঙ্গতা। মানুষের প্রতি যে গভীর ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তাঁর বাল্যকাল থেকেই রোগীর শয্যাপার্শ্বে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, যে সহমর্মিতায় তিনি মানুষের দুঃখে অজস্র অশ্রুপাত করেছেন, মানুষের প্রতি সেই ভালবাসা তিনি আশেপাশে আর দেখতে পান নি। তাই মনুষত্ববোধের ক্ষেত্রে তিনি একক এবং নিঃসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়,[৩৯] "এদেশে তিনি তাঁর সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। নিজের মধ্যে তিনি যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমন্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই।"

তাছাড়া, বিদ্যাসাগরের যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, তা স্পষ্টতই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকশ্রেণীর কার্যাবলীর জন্যই, তাদেরই ব্যবহারের অনৈতিকতায়। কার্মাটার অঞ্চলের দরিদ্র সাঁওতাল আদিবাসীদের সম্পর্কে অভিযোগের কথা বিদ্যাসাগরের মুখে কখনও শোনা যায় নি। স্বাস্থ্যলাভ ও নির্জনে বিশ্রাম উপভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর সাঁওতালপরগনা অঞ্চলে একটি বাড়ীর খোঁজ করছিলেন ১৮৬৯ সালের পরে। দেওঘরে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ী প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন ; কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করেন। দেওঘর বাঙ্গালী অধ্যুষিত বলে সেখানে প্রার্থী ও দর্শনার্থীর সংখ্যা কম হবে না মনে করেই এই মত পরিবর্তন বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত কার্মাটারে অনেকখানি বাগানসহ একটি ছোট বাড়ী ক্রয় করেন ১৮৭১-৭২ সালে। স্টেশন-সংলগ্ন বাড়ী, এবং বাড়ীর চর্তুদিকে বাগানটি বেশ বড়। বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহোত্তর পরিস্থিতিতে সাঁওতালরা 'দিকু' বা প্রধানত বাঙ্গালী ভদ্রলোকশ্রেণীর মহাজন ও সরকারী কর্মচারীদের মোটেই বিশ্বাস করত না। বিদ্যাসাগর নিজেই একটি গল্প বলতেন, সেই গল্পে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাঁওতালদের ঠকিয়ে কিছু বেশী জমি আত্মসাৎ করার ব্যাপার আছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে সাঁওতালের মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কথা, সে অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত মিথ্যা কথাটা টিকিয়ে রাখতে পারে নি ; সত্য কথাটা ঠিক বেরিয়ে এসেছে। এতেই বিদ্যাসাগরের স্বস্তি ও আনন্দ। তিনি বলতেন ; "দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাদাসিধে আছে। সত্যটা কোনও রকমে গোপন রাখিতে পারে না।"[৪০] ক্ষুদিরাম বসু কার্মাটারে

ছিলেন। সেখানে তখন ৭/৮ ঘর বাঙ্গালী ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীরা মাছ কিনে সাঁওতালদের দাম দিত না বলে তারা বাঙ্গালীদের মাছ বিক্রি করত না। বাঙ্গালীরা বিদ্যাসাগরকে বললেন, তাদের মাছ না-পাওয়ার কথা। বিদ্যাসাগর নিজে পয়সা দিয়ে মাছ কিনে বাঙ্গালীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।[৪১]

শুধু ঠিক ঠিক দাম দিয়ে নয়, ন্যায্য দিনমজুরি দিয়ে বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মনের দীর্ঘদিনের সন্দেহ ভেঙ্গে দিলেন। তাঁর বাংলোর বাগান তৈরির জন্য সাঁওতাল মজুর লাগালেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর প্রচলিত দু'আনার বদলে চার আনা দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিদ্যাসাগরকে বিশ্বাস করেনি সাঁওতালরা—কারণ বিদ্যাসাগরও তো বাঙ্গালী, সুতরাং "ঝুটা বাঙ্গালী" হওয়া সম্ভব। সাঁওতালদের প্রতিপদে ঠকানোর জন্য বাঙ্গালীরা এই অভিধাটি অর্জন করেছিল। দুপুরে প্রবল বৃষ্টি আসার ফলে, সাঁওতালদের আশঙ্কা হলো যে এই অজুহাতেই বিদ্যাসাগর তাদের মজুরি দেবেন না। তারা জোরের সঙ্গে কাজ শুরু করল। বিদ্যাসাগর তাদের কাজ বন্ধ করতে বললেন। শেষে যখন তারা বুঝল যে কাজ বন্ধ করার জন্য তাদের মজুরি কাটা যাবে না, এবং যখন সত্যিসত্যিই বিদ্যাসাগর প্রতিশ্রুতিমত চার আনা মজুরি দিলেন, তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিদ্যাসাগর সেদিন থেকে তাদের কাছে আর 'ঝুটা বাঙ্গালী' রইলেন না।[৪২] বিহারীলালের কথায় "সাঁওতালগণ ক্রমে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। ...... কেহ দাদা, কেহ বাবা, কেহ জেঠা ইত্যাদি সম্পর্ক পাতাইল।"[৪৩]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ব্যবহারে তাদের কোনও সঙ্কোচ ছিল না। তাদের দুঃখেকষ্টে বিদ্যাসাগর ছিলেন সমব্যথী। তিনি রোগে ওষুধ দিতেন, বছরে অন্তত একবার পুজোর সময় তাদের কাপড় দিতেন। একদিন একজন মেথর এসে বলল, বাড়ীতে তার স্ত্রীর কলেরা হয়েছে। সেই মুহূর্তে রওনা হলেন বিদ্যাসাগর তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বাক্স নিয়ে। সঙ্গে একটি লোকও চলল। সারাদিন বিদ্যাসাগর রইলেন সেই রোগীণীর পাশে। সন্ধ্যায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখে বাড়ী ফিরে স্নানাহার করলেন।[৪৪] বিহারীলাল লিখেছেন, "সাঁওতাল প্রবল পীড়ায় শয্যাগত ; বিদ্যাসাগর তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে ওষুধ ঢালিয়া দিতেন, হাঁ করাইয়া পথ্য দিতেন। উঠাইয়া বসাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইয়া দিতেন ; সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন।"[৪৫] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজে একটা ঘটনা দেখেছিলেন, "একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি বিদ্যাসাগর নেই। সব ঘর খুঁজিলাম নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম নেই, শেষে বাগানের পেছনদিকে একটা আগড় আছে, সেটা খোলা ; মনে করিলাম এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা আলপথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হনহন করিয়া আসিতেছেন, দরদর করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই এখানে কেন?' আমি বলিলাম, "আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, 'ওরে, খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনি আসিয়াছিল ; সে বলিল, বিদ্যাসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ এই বাটিতে করে নিয়ে গেছলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, একডোজ ওষুধে তার রক্তপড়া বন্ধ হলো।' ...... আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কতদূর গিয়েছিলেন'? তিনি উত্তর দিলেন ঐযে গাঁটা দেখা যাচ্ছে, মাইলদেড়েক হবে।"[৪৬] সেপ্টেম্বর মাসের দুপুরে রোদে ৫৮ বৎসর বয়সের রোগক্রান্ত মানুষ অনায়াসে তিন মাইল

হেঁটে একটি সাঁওতাল ছেলের চিকিৎসা করে এলেন। চিকিৎসা শুধু নয়, সাঁওতালদের জন্য কাপড়, খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও কলকাতা থেকে নিয়ে যেতেন বিদ্যাসাগর। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন যে প্রতি বৎসর সাঁওতালদের জন্য হাজার টাকার অধিক কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন। শীতকালের জন্য মোটা চাদর ও কম্বল নিতেন। কমলালেবু ও খেজুর পছন্দ করত সাঁওতালরা। বিদ্যাসাগর সেগুলিও নিয়ে যেতেন বেশী পরিমাণে। অনেকে আবার বিদ্যাসাগরকে ফরমাশ করত আয়না, চিরুনি ইত্যাদি জিনিসের জন্য। বিদ্যাসাগর ঐ সমস্ত জিনিসও নিয়ে যেতেন কলকাতা থেকে। সাঁওতালদের ডেকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াতেন বাংলোর প্রশস্ত উঠানে। খাওয়াদাওয়ার পর আনন্দের নাচ হোত। কখনও কখনও সাঁওতালরাও বিদ্যাসাগরকে গ্রামে নিমন্ত্রণ করত। নিঃসঙ্কোচে যেতেন বিদ্যাসাগর। একবার সাঁওতালদের উপহার একটি মুরগী দেওয়া হোল বিদ্যাসাগরকে। পৈতে দেখিয়ে বিদ্যাসাগর আপত্তি করলেন। কিন্তু সাঁওতালরা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মুরগী হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন ; তাকে ঘিরে সাঁওতালদের নাচ শুরু হলো। কার্মাটার মুখরিত হয়ে উঠল সাঁওতালদের আবিমিশ্র আনন্দের উল্লাসে।[৪৭]

একটি সাঁওতাল সঙ্গে একটি মেয়েকে নিয়ে এল বিদ্যাসাগরের কাছে। নিঃসঙ্কোচে বললে, একটা কাপড় দে এর জন্য। সঙ্গের মেয়েটিকে দেখিয়ে দিল। বিদ্যাসাগর বললেন, 'কাপড় নেই।' বিশ্বাস করল না সাঁওতালটি। বিদ্যাসাগরের কাছে চাবি চাইল। বিদ্যাসাগর কোনও দ্বিধা না করেই চাবি দিয়ে দিলেন। সিন্দুক খুলে দেখল অনেক শাড়ী সাজানো আছে। কথামত একটি শাড়ী নিয়ে বাক্সটা বন্ধ করে দিল। তারপর বিদ্যাসাগরকে চাবি ফেরত দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। একটি শাড়ীর প্রয়োজন ছিল, একটিই নিয়েছিল। অনেক আছে দেখে আর একটির জন্য আবদার করল না। বিদ্যাসাগরের খুশি শুধু শাড়ী দেওয়াতে নয়, তাঁর খুশি এই বিশ্বাসে, এই সততায়। কলকাতায় এবং অন্যত্র অন্যতর অভিজ্ঞতার কথাও নিশ্চয়ই মনে পড়ত বিদ্যাসাগরের।

আর একবার, কলকাতা থেকে আসা এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছেন বিদ্যাসাগর। দুটি সাঁওতাল মেয়ে এসে দাঁড়াল বিদ্যাসাগরের কাছে। একজন বললে, এটি আমার বেয়ান হয়, একে একটি কাপড় দে। বিদ্যাসাগর বললেন, কাপড় নেই ; আর থাকলেই বা তোকে দেব কেন। বিশ্বাস করল না মেয়েটি। বিদ্যাসাগরকে দিয়ে সিন্দুক খোলাল। অনেক কাপড় রয়েছে। মেয়ে দুটিকে দুটি কাপড় দিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু মেয়েটি কিঞ্চিৎ হতাশার সুরে বলল, "তুইও মিছা কথাটা শিখলি, হে।"[৪৮]

বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের জন্য একটা স্কুল করলেন কার্মাটারে। অবৈতনিক তো বটেই ; তাছাড়াও বই-শেলেট-পেন্সিল এবং পড়ুয়াদের কাপড়চোপড়, এমনকি কখনও কখনও একবেলা খাওয়ানোর দায়িত্বও বিদ্যাসাগরের। বৃদ্ধ-অশক্ত সাঁওতালদের অনেককে মাসোহারাও দিতেন।[৪৯]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর একদিনের কার্মাটার অবস্থানকালে সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলেন ; সেটি উল্লেখযোগ্য। সেপ্টেম্বর মাস সাধারণত কৃষি-মজুরদের পক্ষে কর্মহীন হওয়ার সময়। সুতরাং আয়ও কম। চালের অভাব, সুতরাং ভুট্টাই প্রধান খাদ্য। সকালবেলাতেই একজন সাঁওতাল ৫/৬টা ভুট্টা নিয়ে এসে বিদ্যাসাগরের কাছে

চাইল ৫ গণ্ডা পয়সা। কারণ তা না হলে তার ছেলের চিকিৎসা হবে না। বিদ্যাসাগর তাই দিলেন। একটি ঘরের মধ্যে অনেক তাক করা আছে—তাতেই রাখলেন ভুট্টা। তারপর আর একজন এল। তার ঝুড়িতে অনেক ভুট্টা। সে চাইল আট আনা। বিদ্যাসাগর তাই দিয়ে ঝুড়ি কিনে নিলেন। যে যা দাম চাচ্ছে বিদ্যাসাগর তাই দিয়ে ভুট্টা কিনে নিচ্ছেন। সকলেই দাম চাইছে তার প্রয়োজনমাফিক। শেষ পর্যন্ত ঘরের তাকগুলি ভুট্টায় ভরে উঠল। হরপ্রসাদ তখনও বুঝতে পারেন নি এত ভুট্টা নিয়ে বিদ্যাসাগর কী করবেন। দুপুরের পরে এই রহস্যভেদ হলো। সাঁওতালরা দল বেঁধে এসেছে খাবারের আশায়। পাঁচ-সাত-দশজন করে এক একটা দলে বসে আছে এবং সমস্ত চত্বরটাই ভরে গিয়েছে। বিদ্যাসাগরকে সবাই বলল, "ও বিদ্যেসাগর, খাবার দে।" বিদ্যাসাগর ভুট্টা বিলোলেন যার যেমন প্রয়োজন। দেখতে দেখতে ভুট্টা ফুরিয়ে গেল। ডালাপাতা সংগ্রহ করে তাতে আগুন দিয়ে ভুট্টা পুড়িয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "খুব খাইয়েছিস্ বিদ্যেসাগর।" হরপ্রসাদ লিখছেন, "আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম, এরকম বোধহয় আর দেখিতে পাইব না।"[৫০] বিদ্যাসাগর এই অভিনব পদ্ধতিতে বৎসরের সবথেকে অভাবের সময় তাদের সামান্য অর্থের প্রয়োজন মেটালেন ; সেই সঙ্গে মূলত তাদেরই ফসলে খাদ্যের অভাবও কিছুটা মেটালেন। এই দৃশ্য দেখার পর সেদিন বিকেলেই হরপ্রসাদের লক্ষ্ণৌ যাওয়ার কথা। বিদ্যাসাগর ও সাঁওতালদের সম্পর্কের মধ্যে এমন একটি অনায়াস সাবলীলতা ছিল, এমন একটি সরল বিশ্বাসের বন্ধন ছিল যা নির্মল আকাশ আর উজ্জ্বল রৌদ্রের মতো—একে অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়। এই অনাহত ঐক্যের বাতাবরণের মধ্যে হরপ্রসাদের কার্মাটার ত্যাগের মুহূর্তে মনে হলো, "আমরা যেন কোনও মহর্ষির আশ্রম হইতে বাহির হইতেছি।" রবীন্দ্রনাথও এই ঐক্যের সূত্রটি সম্পর্কে লিখেছেন, "সরল, সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বজাতীয় বাঙ্গালীর অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।"[৫১] বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্যটি জানিয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু, হিন্দী কবি হরিশ্চন্দ্রের নিকট, "পূর্বে বড়মানুষের সহিত আলাপ হইলে বড় আনন্দ হইত, কিন্তু এখন তাহাদের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি। তাহারা গালি দিলেও আমার তৃপ্তি। তাহারা অসভ্য বটে, কিন্তু সরল ও সত্যবাদী।"

১৮৮৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগর প্রায় নিয়মিত কার্মাটারে যেতেন। দিনময়ীদেবীর মৃত্যুর পর (আগস্ট, ১৮৮৮) নিজের শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হওয়ায় তিনি চন্দননগর এবং ফরাসডাঙ্গা ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারতেন না। কিন্তু কার্মাটারে তাঁর বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক অভিরাম মণ্ডলকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে খবরাখবর নিতেন এবং তার মাধ্যমেই 'মাসোহারা'র টাকা পাঠিয়ে দিতেন। অসুস্থতার মধ্যেও কার্মাটারে সাঁওতালদের সারল্য ও সততার গল্প বলতে কখনও ক্লান্ত হতেন না। শহর কলকাতার সভ্য কিন্তু লোভী ও স্বার্থপর মানুষগুলির থেকে এই আদিম মানুষগুলির সারল্য ও নির্লোভ সততা তাঁকে বেশী আকর্ষণ করত ; তাঁর আহত চিত্তে দিত শান্তির প্রলেপ। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের মানুষের প্রতি বিশ্বাসে যদি আঘাত লেগেও থাকে, কার্মাটারে সাঁওতালদের সংস্পর্শে এসে তিনি সেই বিশ্বাসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে নিতে পেরেছিলেন।

৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিক্ষত ব্যক্তিত্ব ঃ পারিবারিক জীবনে বিদ্যাসাগর

১

সমসাময়িক একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ম এবং প্রচলিত সামাজিক নীতি অনুসারে বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে তাঁর বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মাত্র ২২ বছর বয়সে। সেই সময় তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা হেড্ পণ্ডিত, এবং থাকতেন বৌবাজারের একটি ভাড়াটে বাড়ীতে। সেখানে তাঁর দুই সহোদর ভাই দীনবন্ধু এবং শম্ভুচন্দ্র ছাড়াও চারজন পিসতুতো ভাই, রান্নার জন্য একজন লোক ইত্যাদি মিলিয়ে দশজন তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর পঞ্চাশ টাকা মাইনের কুড়ি টাকা ঠাকুরদাসকে বীরসিংহে সংসার চালানোর জন্য পাঠাতেন। অবশ্য কয়েকবছর পরে দীনবন্ধু উপার্জন করতে শুরু করলে, তিনিও সংসারে অর্থ-সাহায্য করে বিদ্যাসাগরের উপর চাপ কিছুটা লঘু করার প্রয়াস পান। তবুও দুই জায়গায় বৃহৎ পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করার প্রধান দায়িত্ব ছিল বিদ্যাসাগরের উপর।

ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগর-দীনবন্ধু সহ চারপুত্রেরই পঠদ্দশায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষাতেও খুব উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর পুত্রবধূরা সকলেই ছিলেন প্রায় নিরক্ষর[১]। বিয়ের পর ঠাকুরদাস পরিচালিত সংসারে তাঁরা শিক্ষার কোনও সুযোগ পাননি বলেই মনে হয়। বিদ্যাসাগর অবশ্য তাঁর কন্যাদের বীরসিংহে রেখেই, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। একজন বিদ্যালয়-পরিদর্শক বীরসিংহের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে লিখেছিলেন,[২] "The best aided girls' school in my division is Beersingha, the home of Baboo Eshwar Chandra Vidyasagar, whose daughter is the most forward girl, I have met within any of the aided schools." ঠাকুরদাস অবশ্য বীরসিংহে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং বিদ্যাসাগরের মেয়েদের পড়াশুনাতেও কোনও অনুৎসাহ দেখান নি।

১৮৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে সাড়ে চোদ্দ বৎসরের ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে আনুমানিক আটবৎসরের দিনময়ীর বিয়ে হয়। সংস্কৃত কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য যখন পাত্রীর খোঁজ করছিলেন, তখন রামজীবনপুরের আনন্দ অধিকারী নামক এক ব্যক্তির কন্যাকে ঠাকুরদাসের পছন্দ হয়। কিন্তু ঠাকুরদাসের বসতবাটীর দেওয়াল মাটির ও চাল খড়ের ; তাই অধিকারী বিয়ে দিতে অসম্মত হন। শেষ পর্যন্ত ক্ষীরপাইয়ের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য নামক এক সরলস্বভাব, বলশালী কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা দিনময়ীর সঙ্গে বিবাহে সম্মত হলেন ঠাকুরদাস। নম্র ও সরলস্বভাবের দিনময়ী শ্বশুরবাড়ীর পরিবারে অনেক সদস্যের মধ্যে নিজেকে সব সময় প্রচ্ছন্ন করেই রাখতেন। বিদ্যাসাগর যখন সারা দেশে বিখ্যাত, তখনও কিন্তু তিনি আজীবন প্রচ্ছন্নতার অভ্যাস কাটিয়ে

সামনে এগিয়ে আসতে পারেন নি। প্রায় ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্তান না-হওয়ায় আত্মীয়-স্বজনদের বহুপ্রকারের তুক্‌তাক্ এবং সমপরিমাণ গঞ্জনার ফলে দিনময়ী দেবী আরও বেশী করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাসে। তারপর বিদ্যাসাগরের আরও চারটি কন্যা-সন্তান জন্মে। কিন্তু যৌবনে ও মধ্যবয়সে বিদ্যাসাগর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পরিবার হিসাবে বাস করার সুযোগ কদাচিৎ পেয়েছেন। ঠাকুরদাস বীরসিংহে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের তত্ত্বাবধান করতেন আর বিদ্যাসাগর কলকাতার বাসার খরচ চালিয়ে বীরসিংহে সংসারের ব্যয়ভার বহন করতেন। পিতা-মাতার একান্ত অনুগত ও কর্তব্যপরায়ণ বলে এই ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর অবশ্য মাঝে মাঝেই বীরসিংহে যেতেন এবং কলেজের দীর্ঘ অবকাশগুলি বীরসিংহেই কাটাতেন। তাঁর মা, স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা কখনও কখনও কলকাতায় এসে বৌবাজারের বাসায় কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন। কিন্তু এই যাতায়াতে পারিবারিক জীবনের স্থিতি, নিশ্চিতি ও সম্পর্কের গভীরতা গড়ে উঠতে পারে নি। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে কর্মবহুল সময়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে পাঠ্যসূচীর আধুনিকীকরণ, জনশিক্ষা প্রসার, বিধবাবিবাহ প্রচলন ইত্যাদি নানাবিধ কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনের এই সময়টা বলিষ্ঠ চিন্তার দ্বিধাহীন প্রকাশে, পরিশ্রমী মননে ও কর্মের সংঘাতে তাঁর অসাধারণ মানসিক ও শারীরিক শক্তির পরিচয় বহন করছে। বস্তুতপক্ষে এই কয়েক বৎসর তিনি যে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেছিলেন, যে কোনও মহাপুরুষের জীবনেই তার তুলনা পাওয়া কঠিন। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে পুঁথিপত্র ঘেঁটে তিনি কাটিয়েছেন রাতের পর রাত। কখনও নিকটবর্তী বন্ধু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ীতে, কখনও বা লাইব্রেরীতে সারতেন রাতের খাওয়া*। সকালে খেতেন সুকিয়া স্ট্রীটে বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। এইরূপ প্রচন্ড পরিশ্রম ও ক্রমাগত রাত্রিজাগরণের ফলে তিনি দুরারোগ্য শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততায় যখন বিভিন্ন দায়িত্বের ভার বহন করছেন, তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনও পারিবারিক জীবন ছিল না। স্ত্রীর পরিচর্যা, সন্তানের স্নেহ-ভালবাসা পরিবারের মধ্যে একটি বিশ্বাস ও শান্তির পরিমন্ডল মানুষকে নোতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করে, নব নব কর্মোদ্যমে অনুপ্রাণিত করে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে ছিল সেটির অভাব। তাঁর সবচেয়ে কর্মমুখর ও সংঘাতপূর্ণ দিনগুলিতে তিনি ছিলেন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিদ্যাসাগর অতি বড়মাপের মানুষ ছিলেন ; সাধারণ মানুষের মানদন্ডে তাঁকে বিচার করলে হয়ত তাঁর মহত্ত্বের প্রতি সুবিচার করা হবে না। কিন্তু তবুও মানুষের স্বাভাবিক অনুভব ও আবেগ তাঁকেও সমানভাবে আলোড়িত করত। তাই নানা দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনের মধ্যেও তাঁর স্ত্রীর ও সন্তানদের সঙ্গের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৮৭৬ সালের আগে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সপরিবার বাস করার সুযোগ লাভ করেন নি। যখন সেই সুযোগ এল, তখন বিদ্যাসাগর ৫৬ বছরের প্রৌঢ়। সন্দেহ নেই, বিদ্যাসাগরের অন্তরেও মানবিক আবেগগুলি তাঁকে সাধারণ মানুষের মতোই আলোড়িত করত। পাঁচটি সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও অবস্থাগতিকে বিদ্যাসাগর সন্তানদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বঞ্চিত ছিলেন। নারায়ণ সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে যখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বসবাস করতে এলেন, তখন তাঁর বয়স ১৬/১৭ বৎসর ; পুত্রের সঙ্গে

তখন মিত্রবৎ আচরণ করার কথা। সুতরাং, নারায়ণকে কাছে পেয়েও তাঁর সন্তানবাৎসল্য তৃপ্ত হয়নি। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই অতৃপ্ত সন্তানস্নেহের ফল্গুধারা প্রকাশ পেয়েছে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামক একটি রচনায়[৪]। প্রভাবতী বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। কলকাতায় 'প্রবাসে' বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারেই স্নেহ-মমতার,আদর-যত্নের স্বাদ পেতেন। রাজকৃষ্ণের মাকে বিদ্যাসাগর মা বলে ডাকতেন এবং তিনিও বিদ্যাসাগরকে সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। তাঁদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর অনেকদিন কাটিয়েছেন। যখন বৌবাজার বা মেছুয়াবাজারে বাসা ছিল, তখন শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিংবা বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনে রাজকৃষ্ণের বাড়ীতে এসে থাকতেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর উত্তরপাড়াতে ঘোড়ার গাড়ী দুর্ঘটনার পর এই বাড়ীতেই বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন বিদ্যাসাগর। রাজকৃষ্ণের পরিবারের মানুষজনের শুশ্রূষাতেই তিনি শেষপর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠেন। প্রভাবতী ছিল বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী। ১৮৬৪ সালে মাত্র তিন বৎসর বয়সে কলেরা রোগে তার মৃত্যু হয়। এই শিশুর স্পর্শে, তার অর্ধস্ফুট বাগ্‌ভঙ্গীতে, শিশুসুলভ চাপল্যে বিদ্যাসাগরের তৃষিত পিতৃহৃদয় শান্তি পেয়েছিল। এই শিশুটির হঠাৎ মৃত্যু বিদ্যাসাগরকে সন্তান-হারানোর বেদনায় আকুল করে তুলল। "প্রভাবতী সম্ভাষণে" এই শিশুর স্পর্শ-কণ্ঠ-রূপের স্মৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। "যখন চিত্ত বিষম অসুখে, উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময় তোমায় কোলে লইলে তোমার মুখচুম্বন করিলে আমার সর্বশরীর তৎক্ষণাৎ যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত।" বিদ্যাসাগর তখন চারটি সন্তানের পিতা ; কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে, সন্তানের প্রতি স্নেহে প্রায় বঞ্চিত। প্রভাবতীকে ঘিরে অবরুদ্ধ পিতৃস্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। এই রচনাটি বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এটি প্রকাশ করেন। সমাজপতির বক্তব্য, "মৃত্যুর তিনমাস পূর্বেও আমি তাঁহাকে (বিদ্যাসাগরকে) একান্তে 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' পড়িতে দেখিয়াছি"[৫]। এই রচনায় তাঁর তৃষিত পিতৃহৃদয়ের বার্তাটি নির্ভুলভাবে পাঠকের নিকট ধরা পড়ে যায়।

২

ঠাকুরদাস বীরসিংহে একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারকে যথেষ্ট কর্তৃত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি যে ব্যবহারে, স্নেহের দাক্ষিণ্যে পরিবারের সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন,—এ কথা বলা যায় না। প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের মধ্যে সন্তানকে মানুষ করার জন্য নিজে ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন এবং সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি সামান্য অবহেলাকেও ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র এবং পৌত্র নারায়ণকে অত্যধিক স্নেহ ও অকারণ প্রশ্রয়ে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বিনীত করে তুলেছিলেন। ঠাকুরদাস ঈশানচন্দ্র ছাড়া বাকী পাঁচ পুত্রকেই কলকাতায় শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এদের মধ্যে হরচন্দ্র ১২ বৎসর বয়সে, এবং হরিশচন্দ্র ৮ বৎসর বয়সে কলকাতায় কলেরায় মারা যায়[৬]। ঠাকুরদাস এই পুত্রশোকের আঘাতে কনিষ্ঠপুত্র এবং পৌত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রবণ ও দুর্বল হয়ে পড়েন। ঈশানচন্দ্র ও নারায়ণকে তিনি বীরসিংহে রেখে

স্থানীয় স্কুলেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতার কাশীবাসের পর বিদ্যাসাগর ঈশান ও নারায়ণকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। কিন্তু তখন নারায়ণের বয়স ১৬/১৭ বৎসর, ঈশানের আরও বেশী। তাছাড়া ঈশান তখন বিবাহিত। পিতার প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্যের জন্য বিদ্যাসাগর পিতার স্নেহচ্ছায়া থেকে ঈশান ও নারায়ণকে উদ্ধার করতে পারেন নি। একবার কেবল রসিকতা করে বলেছিলেন, "লোকে আপনাকে নিরামিশাষী বলে ; কিন্তু আপনি তো ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন।"[৭] পিতার এই অযৌক্তিক কাজকে মেনে নেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে সারাজীবন ধরে। নারায়ণ বিদ্যাসাগরের প্রত্যাশামত মানুষ হয়ে উঠতে পারে নি।

জ্যেষ্ঠপুত্র এবং খ্যাতিমান ব্যক্তি বলেই বিদ্যাসাগরের উপর স্বাভাবিক ভাবেই একটু বেশী দাবি ছিল ঠাকুরদাসের। বিদ্যাসাগর সব সময়েই সেই দাবি পূরণ করেছেন। কিন্তু পরিবর্তে বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসের একটু বেশী স্নেহ বা সহানুভূতি পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরের জন্য গর্ব অনুভব করেছেন[৮]—কিন্তু পারিবারিক জীবনে তাঁর প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

একটি স্বপ্নদর্শনের ফলে ঠাকুরদাস সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সংস্কার-বিশ্বাসী ঠাকুরদাস স্বপ্নদর্শনের পর জ্যোতিষী ডাকিয়ে গণনা করিয়ে জানলেন যে বিদ্যাসাগরের শনির দশা শুরু হয়েছে—তাঁর আত্মবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটবে এবং তাঁকে দেশত্যাগী হতে হবে। জ্যোতিষী অবশ্য সতর্ক করে দিলেন, যেন এ কথা বিদ্যাসাগরকে না জানানো হয়। কারণ তা হলে জ্যোতিষী তিরস্কৃত হবেন। এই সমস্ত গণনাতে ঠাকুরদাসের গভীর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রের এইরূপ গুরুতর বিপদের সম্ভাবনায় তাঁর সংসারত্যাগের সিদ্ধান্তে বিদ্যাসাগরের প্রতি কিছুটা ঔদাসীন্যই প্রমাণ করে। বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসের কাশীবাসের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে সত্বর বীরসিংহে গিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। দূরপ্রবাসে পিতার কষ্টের কথা ভেবেই বিদ্যাসাগর এই চেষ্টা করেছিলেন। ঠাকুরদাস তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে প্রায় রাজীও হয়েছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশানচন্দ্রই তাঁকে কাশীবাসে প্ররোচিত করলেন[৯]। ঠাকুরদাসের কাশীবাসকে যথাসাধ্য আরামপ্রদ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি বিদ্যাসাগর। তাঁর ধর্মাচরণের এবং সমস্ত ক্রিয়াকর্মের ব্যয়ভারও তিনি বহন করেছেন। ঠাকুরদাসের সেবা-শুশ্রূষার জন্য এবং তাঁকে সঙ্গদানের জন্য নিয়মিত ভাবে ভাই-বোন, জামাতাদের কাশীতে পাঠিয়েছেন এবং নিজেও মাঝে মাঝে গিয়ে নিজের হাতে ঠাকুরদাসের সেবা করেছেন। সংসারিক নানা বিষয়ে ঠাকুরদাসের পরামর্শ নিয়েছেন। বাদুড়বাগানে জমি কিনে বাড়ী করার আগে অনুমতি নিয়েছেন। ঠাকুরদাসও সংসারের খবর নিয়মিত পেতেন। তিনি বীরসিংহের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে সবাই পৃথগন্ন হওয়ার ব্যাপারটি পছন্দ করেন নি। এই অবস্থায় তাঁর রূঢ়-ভাষী কনিষ্ঠ পুত্রটির জন্য স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তা হয়েছিল। ঠাকুরদাসের কথায় বিদ্যাসাগর বারে বারে অর্থসাহায্য করে ঈশানচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন।[১০] তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর পারিবারিক বিষয়ে ঠাকুরদাসের অকুণ্ঠ ও সোচ্চার সমর্থন পেয়েছিলেন, একথা মনে হয় না। এজন্য বিদ্যাসাগরের মনে মনে যে ক্ষোভ ও অভিমান ছিল—এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই।

৩

ঠাকুরদাসের কাশীবাসের (ডিসেম্বর, ১৮৬৫) পর থেকে বীরসিংহের বড় পরিবার পরিচালনা করার মত কেউ রইল না বলে সংসারে অশান্তি লেগেই রইল। পরিবারে ছিলেন চার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি ছাড়াও, দুই বোন, ভগবতীদেবী, শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। দীনবন্ধুও বেশীরভাগ সময় বীরসিংহেই থাকতেন। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়ায় একটি স্কুলে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সেখানে ঘোড়ার গাড়ী দুর্ঘটনায় তিনি যকৃতে গুরুতর আঘাত পান। এই আঘাত থেকেই ক্যান্সার হয় বলে অনেকের ধারণা এবং তাতেই তিনি মারা যান। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিদ্যাসাগর অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। চিকিৎসায় সাময়িক উপকার পেলেও মাঝে মাঝেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। ১৮৬৭ সালের প্রথমদিকে, দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকার পর, একটু সুস্থ হয়েই বীরসিংহে বিশ্রাম নিতে যান। সেই সময়, পারিবারিক কলহের ফলে সংসারে কী গভীর অশান্তি হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলো। বিদ্যাসাগর শেষপর্যন্ত দেখলেন যে এইরূপ অশান্তির মধ্যে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করার থেকে পৃথগন্ন হওয়া ঢের ভাল। তিনি প্রত্যেকের সংসারখরচের টাকা যথাসময়ে দেওয়ার এবং প্রত্যেকের "পৃথক বাটী নির্মাণের" ব্যয় বহন করার দায়িত্ব নিলেন। এইভাবে অন্তত পারিবারিক কলহের অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক আদর্শ। পৃথক হলে সংসার ছারখার হয়ে যায়, এই ধারণা ছিল বহুল-প্রচলিত। তাই ভগবতীদেবীসহ বাড়ীর সকলেই এই পৃথগন্ন হওয়াতে বাধা দিলেন। কেবল "জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়কে তুষ্ট করার জন্য" শম্ভুচন্দ্র সম্মতি দিলেন।[১১] কেবল পারিবারিক শান্তি পাওয়ার আশায় বিদ্যাসাগর অবিচলিত চিত্তে তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেছিলেন। দুই বোনকে আলাদা বাড়ী আগেই করে দেওয়া হয়েছিল। শম্ভুচন্দ্র ও দীনবন্ধুর জন্য বাড়ী করে দিলেন। নারায়ণেরও আলাদা বাড়ী তৈরির ব্যবস্থা হলো। ঈশানচন্দ্রের জন্য "পৃথক বাটীর ব্যবস্থা ছিল না," কারণ তিনি সেই সময় কলকাতায় পড়াশুনা করছিলেন। কেবল মা ভগবতীদেবী বিদ্যাসাগরের নিকট থাকবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাতে পারস্পরিক তিক্ততার অবসান হলো না। যদিও নোতুন বাড়ী তৈরি এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য সমস্ত ব্যয়ভারই বিদ্যাসাগর বহন করেছিলেন, তবুও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নিন্দা ও কুৎসা বেড়ে গেল। কাশীতে ঠাকুরদাসও এই খবর পেয়ে খুশী হন নি। এমন কি শম্ভুচন্দ্র, যিনি নিজেকে বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুগত বলে দাবি করেন, তিনিও বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরেই লিখেছিলেন, যে, "আহারে পারিপাট্য থাকে না, এবং অনেক টাকা ব্যয় হয়" বলে বিদ্যাসাগর পৃথগন্ন হয়েছিলেন।

দীনবন্ধুর অসন্তোষ প্রকাশ পেল যখন তিনি "সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরীর" অংশ দাবি করলেন। দীনবন্ধুর বক্তব্য ছিল যে সংস্কৃত প্রেস যখন কেনা হয় (১৮৪৭), তখন তিনিও দুইশত টাকা কর্জ করে এনে দিয়েছিলেন এবং উদয়াস্ত পরিশ্রম করে প্রেসের ও ডিপজিটরীর উন্নতিসাধন করেছিলেন। সুতরাং প্রেস ও ডিপজিটরীর অর্ধাংশ তাঁর প্রাপ্য। দীনবন্ধু এই দাবি আদায়ের জন্য একটি দেওয়ানী মামলাও করলেন। শেষপর্যন্ত দ্বারকানাথ মিত্র ও দুর্গামোহন দাশের মধ্যস্থতায় এই বিবাদের মীমাংসা হয়। দীনবন্ধু লিখেছেন যে, "সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত সহোদরে সহোদরে বিবাদ করা নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য বিবেচনা করিয়া লিখিয়া দিতেছি যে

সংস্কৃত যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমার স্বত্ব ও অংশ থাকার যে দাবি করিয়াছিলাম, সে দাবি পরিত্যাগ করিলাম।"[১২] মামলাটির নিষ্পত্তি হলেও এই বিবাদ পরিবারে একটি অশুভ প্রভাব রেখে গেল এবং বিদ্যাসাগরের মনে রেখে গেল এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত স্মৃতি।

স্মরণীয় যে দীনবন্ধু বিদ্যারত্ন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের ন্যায় তিনিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর অলংকৃত কয়েকটি পদে কাজ করেছিলেন। দীনবন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে বিদ্যাসাগর লেঃ গভর্নর সেসিল বিডন্‌কে অনুরোধ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। দীনবন্ধু বরিশাল জেলায় দুই বৎসর-কাল ঐ কাজ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর কখনও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনও রাজপুরুষকে কোনও অনুরোধ করতেন না। কেবল দীনবন্ধুর প্রতি স্নেহের প্রাবল্যে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর বিডন্ কে ঐ অনুরোধ করেন এবং বিডন্ প্রথম সুযোগেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। দীনবন্ধু বিহারের শিক্ষাবিভাগে কিছুদিন ডেপুটি-ইন্সপেক্টরের কাজও করেছিলেন এবং সেই সময় অনেকগুলি স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় দরিদ্র মানুষের সেবায় তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। শেষজীবনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখে অক্লান্তভাবে রোগীর চিকিৎসা করে বেড়াতেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে ওষুধ ও প্রয়োজনীয় বই কিনে বীরসিংহে পাঠিয়ে দিতেন। দীনবন্ধুকে আর্থিক সাহায্যদান কিছুদিন বন্ধ ছিল ; কারণ দীনবন্ধু নিজেই সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করতে করতে তিনি নিজেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৮০ সালে দেহত্যাগ করেন।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২৮-১৯০৮) দীনবন্ধুর ন্যায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন না ; তবে তিনিও সংস্কৃত কলেজের বিদ্যারত্ন। তিনি কখনও কোনও চাকুরি করেন নি। পৃথগন্ন হওয়ার পর শিক্ষাবিভাগে ডেপুটি-ইন্সপেক্টরের চাকুরি নেওয়ার উদ্যোগ করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের অনুরোধে শেষপর্যন্ত তাঁর "একান্ত বশীভূত" এবং বীরসিংহ অঞ্চলে সমস্ত সেবামূলক কাজে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। শম্ভুচন্দ্রের দাবি, "দেশস্থ সকলেই জানিত আমি বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র ছিলাম," খুব অযৌক্তিক দাবি নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব কিছুটা "অবদমিত' হ'য়ে থাকত, তাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া তিনি, নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই, বিদ্যাসাগরকে তুষ্ট করে চলতে চাইতেন বলে অনেক সময় তাঁর নিজের বিচার-বিবেচনা এবং বিদ্যাসাগরের নির্দেশের মধ্যে বিরোধ বাধলে, তিনি বিদ্যাসাগরের ইচ্ছানুসারে প্রকাশ্যে কাজ করতেন, কিন্তু অপ্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধবাদী মতামতও প্রকাশ করতেন। শম্ভুচন্দ্রের এই দ্বৈত-চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না।

৪

১৮৬৮-৬৯ সালে বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। দীনবন্ধুর সহসা প্রেসের উপর দাবি তোলায় বিদ্যাসাগর মনে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। ভাইদের সঙ্গে তাঁর স্নেহের বন্ধন যেন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তিনি শম্ভুচন্দ্রকেও জিগ্যেস করেছিলেন তাঁরও প্রেসে দাবি আছে কিনা। সেই সময় বিধবাবিবাহের

জন্য ঋণের ভারেও জর্জ্জরিত ছিলেন ; যদিও আত্মমর্যাদার পরিপন্থী বলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'এডুকেশন গেজেটে'র ঋণশোধের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিল[১৩] তাকে সমর্থন করেন নি। অবস্থার চাপে প্রেস বিক্রি করে দেওয়ার চিন্তা হয়তো তাঁর মনে এসেছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি।

১৮৬৯ সালের মার্চ মাসের এক রাত্রে অকস্মাৎ অগ্নিকান্ডে বিদ্যাসাগরের বীরসিংহের বাড়ীটি ভস্মীভূত হয়। পৈতৃক ভিটেতে এ বাড়ীটি বিদ্যাসাগর অনেক যত্নে ও অনেক খরচে তৈরি করিয়েছিলেন। বাড়ীতে এমনভাবে আগুন লেগেছিল যে কোনও আসবাবপত্র পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি। দীনবন্ধু, ভগবতীদেবী এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অবশ্য কোনও ক্ষতি হয়নি। এই বাড়ীটি বিদ্যাসাগরেরই ছিল। ঠিক কিভাবে আগুন লেগেছিল তা জানা যায় নি বটে, কিন্তু গ্রামবাসীরা অনেকেই এই অগ্নিকান্ডকে পারিবারিক শত্রুতার ফল বলে মনে করতেন। এরপর বিদ্যাসাগরের আর কোনও নিজস্ব বাড়ী ছিল না বীরসিংহে।[১৪] অগ্নিকান্ডের পর বীরসিংহে গেলে তিনি শম্ভুচন্দ্রের বাড়ীতেই থাকতেন। মাত্র দু'বারই ছিলেন শম্ভুচন্দ্রের বাড়ীতে।

মার্চ মাসে বাড়ী ভস্মীভূত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ঘটনাচক্রে বিদ্যাসাগর চিরকালের জন্য বীরসিংহ ত্যাগ করেন। আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রধানত শারীরিক কারণে তাঁর আর বীরসিংহে যাওয়া সম্ভব হয়নি। একটি বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করেই বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্ত।

বীরসিংহের নিকটবর্তী ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কেঁচ্‌কাপুর স্কুলের হেড পন্ডিত এবং স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী পরিবার হালদারদের ভিক্ষাপুত্র। মুচিরাম মনমোহিনী নামে কাশীগঞ্জ-নিবাসী কাশীনাথ পালধির বাল্যবিধবা কন্যাকে বিয়ে করার বাসনায় বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিদ্যাসাগর সাহায্য করতে রাজীও হলেন। এই সাহায্য বস্তুতপক্ষে আর্থিক সাহায্য নয়। মুচিরামকে এই বিয়েতে নিবৃত্ত করতে চাইছিলেন ক্ষীরপাইয়ের হালদাররা। নারায়ণ তখন কলকাতায়। তিনিই শম্ভুচন্দ্রকে চিঠি লিখে জানালেন যে বিদ্যাসাগর বীরসিংহে গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে মনমোহিনীকেও কলকাতা থেকে বীরসিংহে পাঠিয়ে দিয়ে শম্ভুচন্দ্রের বাড়ীতে থাকতে বললেন। এরপর বিদ্যাসাগর যথা সময়ে বীরসিংহে এলে ক্ষীরপাইয়ের হালদাররা এবং বীরসিংহ-রাধানগরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। হালদারদের আপত্তির কারণ মুচিরাম তাঁদের বাড়ীর 'ভিক্ষাপুত্র'—সুতরাং তাঁরা এই বিয়েতে মতামত দেওয়ার অধিকারী। তাঁরা এই বিয়ে কিছুতেই সমর্থন করবেন না। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দীনবন্ধু-ঈশানচন্দ্র-শম্ভুচন্দ্রের বিরুদ্ধে জোর করে বিধবাবিবাহ দেওয়ারও অভিযোগ করেন। প্রসঙ্গত বিধবাবিবাহ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে রামজীবনপুর-বীরসিংহ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বিধবাবিবাহ হয়। প্রথমে এই অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলি বিশেষত জাড়া গ্রামের জমিদার শিবনারায়ণ রায় বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন (তিনি ঐ সম্পর্কিত দরখাস্তে স্বাক্ষরও করেন।), কিন্তু পরে আপত্তি জানাতে শুরু করেন। দু'একটি অসবর্ণ বিধবাবিবাহে তিনি বাধা দিয়েছিলেন[১৫]। সুতরাং বিধবাবিবাহ নিয়ে ঐ অঞ্চলের জমিদারশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে শম্ভুচন্দ্র-দীনবন্ধুর একটি চাপা বিরোধ ছিল বলেই মনে হয়।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর বিয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে সম্মত হলেন এবং শম্ভুচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন মনমোহিনীকে তাঁর বাড়ীতে যেন আশ্রয় না দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরও শম্ভুচন্দ্রের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। স্পষ্টতই এই বিয়ে নিয়ে গ্রামে দুটি দল হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা বিদ্যাসাগরের মতামত অগ্রাহ্য করে বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাধানগরের কৈলাস মিশ্র এবং তাঁর অনুগত কয়েকজন[১৬]। দীনবন্ধু, ঈশানচন্দ্র এবং দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্রের পুত্রেরা এই বিয়ের সহায়ক ছিলেন। বিদ্যাসাগর বিয়ের সঙ্গে সংস্রব রাখবেন না বলেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করেছিলেন, যেন মুচিরাম ও মনমোহিনীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বর-কনে দু'জনেই হালদারদের অবাধ্য হলেন।

কিন্তু তবুও বিদ্যাসাগরের ধারণা ছিল যেহেতু তাঁর সম্মতি নেই, তাই এই বিয়ে হবে না। কিন্তু রাত্রে বিয়ে দেওয়া হয় এবং পরের দিন শঙ্খধ্বনি শুনে বিদ্যাসাগর জিগ্যেস করে জানতে পারেন যে মুচিরাম-মনমোহিনীর বিয়ে হয়ে গেছে। "একথা শুনিয়া ক্রোধে বিদ্যাসাগরের বদনমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল।"[১৭]

বিয়েতে বেশী নিমন্ত্রিত ছিল না এবং গোপনে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গদাধর পাল নিমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বন্ধুর প্রতি আনুগত্যবশত তিনি বিয়েতে যোগ দেননি। বিদ্যাসাগরের ভাইদের মধ্যে দীনবন্ধু ও ঈশানচন্দ্র যে এই বিয়েতে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন,—এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। দীনবন্ধুর ছেলে গোপাল, যে শম্ভুচন্দ্রের ভাষায় "মাতাল ও মূর্খ", সেও এই বিয়ের উৎসাহীদের মধ্যে অন্যতম। শম্ভুচন্দ্রের সহযোগিতা যথেষ্ট ছিল, যদিও তিনি লিখেছেন, "আমি বিদ্যাসাগরের একান্ত বশীভূত। অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না।" কিন্তু যুক্তি-প্রমাণ বিবেচনা করে শম্ভুচন্দ্রের এই বক্তব্যকে যথার্থ বলে মনে হয় না। এই বিয়ের প্রায় ২৬ বৎসর পরে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠিতে (১৩ ভাদ্র, ১৩০২) নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "ধর্মত অঙ্গীকার" করে জানিয়েছেন যে, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের "সম্পূর্ণ যত্ন ও অনুগ্রহেই" ঐ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। "তিনি যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরকালই মনে থাকিবে।"[১৮]

শম্ভুচন্দ্রের পরবর্তী কালের আচরণও এই বিয়েতে তাঁর সক্রিয় সমর্থনই প্রমাণ করে। বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ করা বা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার মত শম্ভুচন্দ্রের মানসিক জোর ছিল না। এই কারণে শম্ভুচন্দ্র খোলাখুলি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। আবার একবারে শেষ মুহূর্তে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সহমত হয়ে তাঁর অন্য ভাইদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতেও চাননি। পরে যখন এই ঘটনাটিই বিদ্যাসাগরের বীরসিংহ ত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখনও তিনি এই বিয়ের প্রতি তাঁর সমর্থন স্বীকার করে বিদ্যাসাগরের মর্মবেদনার পরোক্ষ কারণরূপে দেশবাসীর নিকট পরিচিত হতে চাননি। "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস" রচনার সময় তিনি তাঁর নিরপেক্ষতার মুখোশটি সযত্নে রক্ষা করতে চেয়েছেন, যদিও তাঁর অসংযত ভাষার জন্য তাঁর পক্ষপাত কোন্‌দিকে, তা ধরা পড়ে গিয়েছে। 'ভ্রমনিরাস'-এ শম্ভুচন্দ্র লিখছেন, "মুচিরামের বিবাহের সময় উক্ত বিবাহ ন্যায্য ও শাস্ত্র-সম্মত স্বীকার করিয়াও বিধবা-বিবাহ-বিদ্বেষী ক্ষীরপাইনিবাসী হালদারবাবুদের অনুরোধে পশ্চাদ্‌পরতার ও কাপুরুষতার পরিচয়

দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, বরং ঐ সময় তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।" বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি তীব্র আক্রমণে শম্ভুচন্দ্রের বিয়ের প্রতি সমর্থন শুধু নয়, বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর অবদমিত ব্যক্তিত্বের আক্রোশও প্রকাশ পেয়েছে। শম্ভুচন্দ্র সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও বিদ্যাসাগর অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে দীনবন্ধু এবং ঈশানচন্দ্র এই বিয়েতে সাহায্য করেছে। তাঁরা তা অস্বীকারও করেন নি। সকালে বিদ্যাসাগর যখন বিয়ের বিষয় জানতে চাইলেন তখন ঈশানচন্দ্র এই বিয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করেন। ঈশানচন্দ্র স্পষ্টই বল্লেন যে এই বিয়ে শাস্ত্র ও ন্যায়সম্মত বলে স্বীকার করে পরে বিদ্যাসাগর "লোকের খাতিরে' বিয়ে সমর্থন করলেন না। এই বাক্যবিনিময় অবশ্য সভ্য ও শালীন ছিল না ; কারণ দীনবন্ধুর পুত্র গোপাল অন্তরাল থেকে বিদ্যাসাগরকে শুনিয়েছিল যে গ্রামে তাঁকে (বিদ্যাসাগরকে) কেউ চেনে না ; সুতরাং তাঁরা ইচ্ছা করলে তাঁর ধোবা-নাপিত বন্ধ করে দিতে পারেন। বস্তুতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের উপর তাঁর পরিবারের লোকজনের, বিশেষ করে তাঁর ভাই ও তাঁদের পরিবারের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

এইরূপ বিতণ্ডার পর বিদ্যাসাগর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অভিমানভরে বীরসিংহ ত্যাগ করেন। বিহারীলাল ও চণ্ডীচরণের মতে, বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে জানতে পারার পরেই তিনি গ্রামত্যাগ করেন। শম্ভুচন্দ্র অবশ্য লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক দিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখালস্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, দেশস্থ বিদেশস্থ সম্পর্কীয় লোকের ও বিধবাবিবাহকারীদের মাসোহারা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় আসিলেন"। এরপর বিদ্যাসাগর আর বীরসিংহে পদার্পণ করেন নি।

বিদ্যাসাগর কী কারণে এই বিধবাবিবাহে সম্মতি দিয়েও শেষে বিয়ের সঙ্গে সংস্রব রাখতে অসম্মত হলেন, তা কিন্তু অস্পষ্টই রয়ে গেছে। হালদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধে তিনি আরব্ধ কাজ থেকে বিরত হবেন, এরকম চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। তিনি যদিও অভিযোগ করেছেন যে, তাঁকে হালদারবাবুদের নিকট মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হোল, তবুও তাঁর মত-পরিবর্তনের সঠিক কারণটি জানা যাচ্ছে না। ১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেসের এক-তৃতীয়াংশ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও এক-তৃতীয়াংশ কালীচরণ ঘোষকে বিক্রি করে দেন এবং ডিপজিটরী দান করেন ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে। বিধবাবিবাহের জন্য যে ঋণ হয়েছিল তা শোধ করার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নভেম্বর মাসেই যখন বিদ্যাসাগর নিকট-আত্মীয়দের চিঠি লিখে সাংসারিক কাজ-কর্ম ত্যাগ করে নিভৃত বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখনই বোঝা গেল যে তীব্র ক্ষোভ ও অভিমানে বিদ্যাসাগরের চিত্ত গভীর ভাবে আহত হয়েছে।[১১] সন ১২৭৬ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তিনি মা, স্ত্রী, দুই-ভাই এবং বীরসিংহের বন্ধু গদাধর পালকে চিঠি লিখে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। চিঠিগুলির ভাষা প্রায় একই। ২৫শে অগ্রহায়ণ ঠাকুরদাসকে অনুরূপ ভাষাতেই একটি চিঠি লিখলেন এবং সঙ্গে অন্য সবাইকে লেখা চিঠির নকলও পাঠিয়ে দিলেন। বৈরাগ্যের কারণ হিসাবে তিনি ঠাকুরদাসকে জানালেন, "সাংসারিক বিষয়ে আমার মতো হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোনও অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট

করিতে পারে না। এই প্রাচীন কথা কোনও ক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোক যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই।" স্পষ্টতই এই অভিযোগ বিদ্যাসাগরের গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি, এবং ঠাকুরদাসও সেই গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিদের বাইরে নন। ঠাকুরদাস অবশ্য বিদ্যাসাগরের ক্ষোভ ও অভিমানকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেছিলেন। দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্রও "গভীর আক্ষেপপূর্ণ" চিঠি লিখে বিদ্যাসাগরকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

যাই হোক্, বিদ্যাসাগরের মনে পারিবারিক কারণে অভিমান-সঞ্জাত বৈরাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এই সময় তাঁর দুইজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু তাঁকে পুনরায় সংসারের আবর্তের মধ্যে টেনে আনে। বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় সন ১২৭৬ সালের ১০ই ফাল্গুন। এই আঘাত তাঁর পক্ষে গুরুতর ছিল, কিন্তু তিনি তা সামলে নিয়ে দুর্গাচরণের পরিবারের নানা সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হলেন। বিদ্যাসাগরের নিভৃত বাসের ইচ্ছা আর পূর্ণ হল না। বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগরের ন্যায় মানবপ্রেমী ও সংবেদনশীল মানুষের সংসার ত্যাগ করে নিভৃতবাসের ইচ্ছাতে আহত চিত্তের সাময়িক ক্ষোভই প্রকাশ পেয়েছে ; এই ইচ্ছা কখনই তাঁর অন্তরের অটল সিদ্ধান্ত ছিল না।

৫

নারায়ণ যে বিধবাবিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন একথা জানতে পারেন বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রের পত্রে। শম্ভুচন্দ্র তাঁর স্বভাবমত আত্মীয়দের আপত্তি ও সম্ভাব্য অসহযোগিতা ইত্যাদি নানা কথা বলে বিষয়টি বিদ্যাসাগরের গোচরে আনেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সমস্ত আপত্তির সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে বিয়েতে মত দিয়ে জানালেন যে, "নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।" বস্তুতপক্ষে ঐ বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর জন্য বিদ্যাসাগর পাত্রের সন্ধান করছিলেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে শম্ভুচন্দ্রের বাড়ীতে কন্যাকে দেখে নারায়ণ নিজেই বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে দিনময়ীর এই বিয়েতে মত ছিল না ; কিন্তু পরে তিনি সানন্দে বধূবরণ করে নিয়েছিলেন। বিয়ের সময় নারায়ণের বয়স ছিল ২১ বৎসর। বিয়ে হয়েছিল কলিকাতায়। বিয়েতে ভগবতীদেবী ও দিনময়ীদেবী উপস্থিত থাকতে পারেন নি। কলকাতায় বিদ্যাসাগর দিনময়ী. নারায়ণ ও ভবসুন্দরীর জন্য পৃথক বাসা করে কিছুদিন তাঁদের সেখানে রেখেছিলেন। নিজেও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন।

নারায়ণের বিয়ের ঠিক পাঁচবছর পরে, ১৮৭৫ সালে, বিদ্যাসাগর তাঁর উইল তৈরি করেন। এই উইলে বিদ্যাসাগর "তাঁর পুত্র বলিয়া পরিচিত' নারায়ণকে "যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী" বলে বর্ণনা করে জানালেন যে "অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাহার সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। সেই হেতুবশতঃ বৃত্তিনিবন্ধন স্থলে তার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে ।"[২০] কিন্তু বিদ্যাসাগর নারায়ণের কুপথগামিতা ও যথেচ্ছাচারের কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ উইল ছাড়া অন্যত্র এমনকি ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নি। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক জীবনীকারেরা, যেমন শম্ভুচন্দ্র, বিহারীলাল ও চণ্ডীচরণও কোনও ঘটনার উল্লেখ করেন নি। শম্ভুচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে

পিতাপুত্রের সম্পর্ক নিয়ে কোনও মন্তব্যই করেন নি। চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নারায়ণ অনেক দলিল, চিঠিপত্র ইত্যাদি দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনীরচনায় সাহায্য করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে চন্ডীচরণকে নারায়ণের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি লিখেছেন, "নিজদোষে দীর্ঘকাল পিতার স্নেহমমতায় বঞ্চিত ছিলেন নারায়ণ।" বিহারীলাল লিখেছেন, "নারায়ণের প্রতি বিদ্যাসাগর নানা কারণে বিরক্ত হন। ক্রমে ক্রমে বিরক্তি বেড়ে পিতাপুত্রের মধ্যে অনতিক্রমনীয় ব্যবধান গড়ে উঠল।" বিহারীলাল আরও বলেছেন "কর্তব্যে ত্রুটি" হেতু বিদ্যাসাগর নারায়ণের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। কিন্তু চন্ডীচরণ বা বিহারীলাল কেউই নারায়ণের 'নানা দোষ' বা "কর্তব্য-ত্রুটির" কোনও নির্দিষ্ট উদাহরণ দেননি। বিদ্যাসাগর যে ভাষা উইলে ব্যবহার করেছেন তার থেকে মনে হয় যে নারায়ণের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল।

সন্দেহ নাই, নারায়ণের প্রতি বিদ্যাসাগরের বিরূপতার ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল। তবে আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুবান্ধব তাদের স্বাভাবিক স্বার্থপরতা ও ঈর্ষার বশে মাঝে মাঝে স্বনামে বা বেনামে মিথ্যা বা অর্ধসত্য অভিযোগ এনে সেই বিরূপতাকে উজ্জীবিত করে দিতেন। চন্ডীচরণ জীবনীরচনার জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র পেয়েছিলেন তার মধ্যে নারায়ণের বিরুদ্ধে "শতপ্রকার অভিযোগপূর্ণ স্বনামী ও বেনামী পত্রাদি" ছিল। চন্ডীচরণ লিখছেন, "তদ্দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, পুত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষবহ্নি প্রজ্বলিত রাখিতে অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন।" বিহারীলালও লিখেছেন, " অনেকে তাহার বিপক্ষে প্রায় গুরুতর অভিযোগ আনিত। তাহাতে পুত্রকে পুনর্গ্রহণের প্রবৃত্তি আর জাগিতে পারিত না।"[২১]

বিদ্যাসাগর অনেকের অনেক মানবিক ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্রের কী এমন ত্রুটি ছিল যে, ১৫/১৬ বৎসরেও তিনি তা ক্ষমা করতে সক্ষম হলেন না? দিনময়ীদেবী পুত্রের হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন ; নারায়ণও অনেক কাকুতিমিনতিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর অবিচলিত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর পুত্রের প্রতি এই বিরাগ গোপন করেন নি। শম্ভুচন্দ্রকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "নারায়ণের বাটী মেরামতের টাকা আমি দিব না। তুমি নারায়ণের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া. . . . .ইত্যাদি"।[২২] কিন্তু দিনময়ীদেবী মৃত্যুশয্যায় বিদ্যাসাগরের নিকট প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন যে নারায়ণ "পিতৃসেবার অধিকার পাইবেন।" তাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই নারায়ণ শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত্যুর পর তিনিই মুখাগ্নি করেন।

পুত্রকে ত্যাগ করার বেদনা তিনি সংগোপনে আমৃত্যু বহন করেছেন। বাইরে, এমনকি স্ত্রী দিনময়ীর মিনতি সত্ত্বেও নারায়ণের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন ; আবার নিভৃতে নারায়ণের ছবি দেখে অবরুদ্ধ পিতৃস্নেহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। নারায়ণের সঙ্গে যদিও বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, নারায়ণের স্ত্রী ভবসুন্দরী এবং পুত্র প্যারীমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। পরিবারের জন্য মাসিক অনুদানও নিয়মিত পাঠিয়ে দিতেন। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় নারায়ণ সপরিবার বীরসিংহে থাকতেন। নিজের চেষ্টায় তিনি একটি সব-রেজিস্টারের চাকুরিও যোগাড় করে নিয়েছিলেন।

নারায়ণের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারায়ণের জীবনের কোনও বিস্তৃত বিবরণও নেই।[২৩] ১৯২৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বীরসিংহে বসবাস করেছেন, এবং বিদ্যাসাগরের পুত্র বলেই সাধারণ মানুষের কাছে কিছু শ্রদ্ধা-সম্মান পেয়েছেন।

নারায়ণের জীবনের পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া গেলেও বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলায় জড়িত হওয়ার ফলে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় সরকারী নথিপত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ত্যাজ্যপুত্র রূপে সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই হাইকোর্টে মামলা করে নারায়ণ সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। সেই সময় তিনি নানা অজুহাতে অনুদান প্রাপকদের অনুদান বন্ধ করে দেন ; মেট্রোপলিটান কলেজকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দাবি করেন এবং একটি চুক্তি করে অর্থের বিনিময়ে কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব এক অধ্যাপকের হস্তে অর্পণ করেন ; অনুদান দেওয়া থেকে অব্যাহতি মিলবে এই ভরসায় ভগবতী বিদ্যালয়ের নাম বদলে করেন ঠাকুরদাস ইন্সটিটিউশন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় লাইব্রেরীটি বন্ধক দিয়েছিলেন ; কার্মাটারের বাড়ী বিক্রি করে দিয়েছিলেন ইত্যাদি। পিতার মৃত্যুর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি এই সমস্ত এবং আরও অনেক কিছু করেছিলেন বলে সরকারী নথিপত্রে ও বিদ্যাসাগর কলেজের পুরানো দলিল ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে।[২৪] এই সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে চরিত্রের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে বিদ্যাসাগর নারায়ণ সম্পর্কে খুব ভুল ধারণা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

৬

১৮৭৬ সালে বাদুড়বাগানে বাড়ীতে বসবাস শুরু করার পর থেকে, বিদ্যাসাগর পারিবারিক জীবনে কিছু সুখশান্তির আস্বাদ পেয়েছিলেন। স্ত্রী দিনময়ী ছাড়াও জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কন্যা-জামাতা তাঁদের সন্তানসন্ততি সহ ঐ বাড়ীতেই বাস করতেন। পুত্রের জন্য দিনময়ীদেবী সুখী ছিলেন না। নারায়ণকে নিয়েই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মনান্তর হোত। দিনময়ী লুকিয়ে পুত্রকে অর্থসাহায্য করতেন ; হাতে টাকা না থাকলে গহনা বিক্রি করে টাকা দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর যখন জানতে পেরেছেন তখন দুজনের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ তীব্র হয়ে উঠেছে।[২৫] বিদ্যাসাগর সম্ভবত তাঁর অনমনীয়তা ও আপসহীনতার জন্য মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ সম্যক অনুধাবন করতে পারেন নি। জীবনের শেষভাগে স্বামীস্ত্রী এক সাথে সংসার-যাত্রা নির্বাহের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুজনের মধ্যে এক অসংযমী সন্তানের ছায়া তাঁদের আন্তরিক মিলনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যাসাগর, বস্তুতপক্ষে, দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পাননি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বাদুড়বাগানের বাড়ীতে বাস করতে শুরু করার আগেই দুটি মৃত্যু বিদ্যাসাগরের জীবনে গভীর শোকের ছায়া বিস্তার করেছিল—এই শোক তিনি আমৃত্যু বহন করেছেন। কাশীতে কলেরায় আকস্মাৎ ভগবতীদেবীর মৃত্যু ঘটে (১৩ই এপ্রিল, ১৮৭১)। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মনের দিক থেকে যাঁর সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা, সেই মানুষটির মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এই মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর আরও কুড়ি বছর জীবিত ছিলেন ; মায়ের জন্য শোকের গভীরতা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একই রকম ছিল। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপাল সমাজপতি অকস্মাৎ কলেরায় মারা যান। তিনি সেই সময় কাশীতে ঠাকুরদাসের কাছে গিয়েছিলেন। এই মর্মান্তিক আঘাতে বিচলিত হয়ে পড়েন বিদ্যাসাগর। হেমলতার বৈধব্যযন্ত্রণায় তিনি এতই কাতর হয়েছিলেন যে, তিনি নিজেও আহারে কৃচ্ছ্র-সাধন শুরু করেন। অনেকদিন পর্যন্ত নিরামিষ এবং একাহারী ছিলেন। বাদুড়বাগানের বাড়ীতে গৃহপ্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই কাশীতে ঠাকুরদাসের জীবনাবসান ঘটে।

তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর বিয়ে দিয়েছিলেন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক সূর্যকুমার অধিকারীর সঙ্গে (১৮৭৫)। শিক্ষিত সুদর্শন যুবক—বিদ্যাসাগর তাঁকে নিয়ে এলেন মেট্রোপলিটান স্কুলের সুপারিন্টেডেন্ট করে। তারপর বিদ্যাসাগরের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতায় সূর্যকুমার ধীরে ধীরে উন্নতি করলেন। তার নিজেরও যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে তিনি লেখক হিসাবেও নাম করেছিলেন। কালক্রমে সূর্যকুমার হলেন গণিতের অধ্যাপক এবং ১৮৮৪তে হন মেট্রোপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল।[২৬] সিনেটের সদস্যও করা হয়েছিল তাঁকে। সূর্যকুমারকে বিদ্যাসাগর কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অনেকের মনে হয়েছিল তিনি তাঁর পরিত্যক্ত পুত্রের স্থান পূর্ণ করবেন। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে শঙ্কর ঘোষ লেনে মেট্রোপলিটান কলেজের সুবৃহৎ বাড়ী তৈরি করলেন বিদ্যাসাগর ও সূর্যকুমার। অকস্মাৎ ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সূর্যকুমারকে মেট্রোপলিটান কলেজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। কারণ কী ছিল তা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। সমসাময়িক ব্যক্তিরা এর কোনও কারণ নির্দেশ করতে পারেন নি। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন "১লা ভাদ্র জ্যেষ্ঠা বধূদেবী পরলোকে গমন করায় অগ্রজ মহাশয় নানারূপ দুর্ভাবনায় অভিভূত হইলেন এবং ক্রমশ তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ঐ বৎসর ২৫শে ভাদ্র সূর্যবাবুকে পদচ্যুত করেন।"[২৭] শম্ভুচন্দ্র ইঙ্গিত করেছেন, বিদ্যাসাগরের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতিই এই সিদ্ধান্তের কারণ। তবে সূর্যকুমার যে গুরুতর অন্যায় কিছু করেন নি সে সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায়। শরৎকুমার মিত্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "একদিন সূর্যকুমারের একটা কি সামান্য দোষ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"[২৮] বস্তুতপক্ষে সূর্যকুমারের তথাকথিত অপরাধ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত ছিলেন না বলে নির্দিষ্ট ভাবে কী অপরাধ তা কেউই বলতে পারেন নি। সূর্যকুমার অবশ্যই কিছু আন্দাজ করেছিলেন বা শুনেছিলেন। সূর্যকুমারের দ্বিতীয়া কন্যা সরযূবালা সূর্যকুমারের পদচ্যুতির সময় নিতান্তই বালিকা ছিলেন। সেই সময়ের ঘটনা তিনি পিতামাতার নিকট শুনেছিলেন ; এবং বিদ্যাসাগরের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর তাঁদের পরিবারকে যে অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। সরযূবালা লেখিকা ছিলেন এবং ধর্মে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি "দৈব ও পুরুষকার" নাম দিয়ে একটি বই লেখেন।[২৯] বইটিতে সূর্যকুমারের জীবনের নানা ঘটনাবলী ছাড়াও বিদ্যাসাগরের দলিলসংক্রান্ত মামলা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে। সূর্যকুমারের পদচ্যুতির বিষয়ে সরযূদেবী লিখছেন, যে বিদ্যাসাগর "অপরিচিত লোকের অস্বাক্ষরিত পত্র পড়িয়া" ধারণা করেন যে "স্কুল-কলেজে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।" তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, "যাঁহারা লাগালাগি কথা বেশ তৃপ্তি সহকারে শুনেন তাহাদিগকে কান-পাত্‌লা লোক বলে।" বিদ্যাসাগরের "এই রোগটি বিশেষভাবে" ছিল। যদিও অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন কাটানোর জন্য সরযূদেবীর মধ্যে অনেক ক্ষোভ ও ক্রোধ জমা হয়েছিল, তবুও তাঁর বক্তব্যের সত্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।

অনেকদিন পরে বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকায় ১৩৬০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় যতীন্দ্রমোহন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি, কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই, লিখেছেন যে, কলেজের

হিসাবে দু'তিন হাজার টাকার গরমিল ছিল বলে বিদ্যাসাগর সূর্যকুমারকে পদচ্যুত করেন।[৩০] এই বক্তব্য প্রমাণাভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাইহোক্ সূর্যকুমারের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে বিদ্যাসাগরের আর একটি অবলম্বন নষ্ট হয়ে গেল ; ফলে, শম্ভুচন্দ্রের ভাষায়, "ক্রমশ অবসন্ন হইতে লাগিলেন।"

জামাতা গোপালচন্দ্রের মৃত্যুর পর কন্যা হেমলতাকে গৃহকর্ত্রীর জায়গায় বসিয়ে এবং তাঁর সন্তানকে অজস্র স্নেহমমতা দিয়ে তাঁদের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতি একদিন বিলেত যাওয়ার কথা তুললেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর বিলেত যাওয়ার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মধুসূদনের কথা স্মরণ করে রসিকতার সুরে বললেন, "কি, ব্যারিস্টার হয়ে এসে চাকুরির জন্যে আমার কাছে উমেদারি করবি তো?" তারপর বললেন, "টাকাকড়ির অনটন হয়ে পড়েছে, অবস্থায় আর হয় না।" সুরেশ তখন বিফলমনোরথ হয়েছিলেন। কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং তাকে বিলেত পাঠাতে সম্মত হন। কিন্তু সুরেশ একদিন তাঁর মাকে বললেন, "আমার বাবা থাকলে কি আর তোমার বাবার কাছে আবদার করতে যেতাম।" এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর দৌহিত্রকে কাছে ডেকে "গভীর ক্ষোভ ও অভিমানে বহুক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাত" করতে লাগলেন। শেষে বললেন, "তোরা আমাকে পর ভাবিস? সে থাকলে তোদের জন্য যাহা করিত, আমি তার চেয়ে কি কম করিতেছি।"[৩১] এই আর্তস্বরই বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে শেষ কথা। তিনি সব আত্মীয়স্বজনকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের উচ্চাশা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং নীচতার জন্য কেউই বস্তুতপক্ষে সন্তুষ্ট হননি। বরং তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যাওয়ার জন্য হতাশাগ্রস্ত মানুষগুলি বিদ্যাসাগরের নিন্দা ও কুৎসা রটাতে ক্লান্তি বোধ করেন নি।

৭

সুখশান্তিহীন পারিবারিক জীবন বিদ্যাসাগরকে সতত বিক্ষত করত। এই অবস্থার জন্য অবশ্য তাঁর চরিত্রের অনমনীয়তা ও আপসহীনতাকেও কিয়ৎপরিমাণে দায়ী করা যায়। মানুষকে বিচার করার জন্য যে মানদণ্ডটি ব্যবহার করতেন, খুব অল্প কারণে সেটির ভারসাম্যে অনেক তফাত ঘটিত। ফলে বিদ্যাসাগর খুব স্বল্প প্রমাণেই মানুষের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতেন। বিদ্যাসাগরের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি তো জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ-নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাহাকে ভাল জানিবেন তাঁহাকে স্বর্গে দিবেন ; যাহাকে মন্দ জানিবেন, তাঁহাকে নরকে দিবেন।"[৩২] তাছাড়াও ছিল নিজের অনমনীয়তা। বিহারীলাল লিখেছেন, "মৈত্রী-বিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিগত মৈত্রীর পুনরুদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেন না। মৈত্রী-উদ্ধারের এরূপ অনাকাঙ্ক্ষা মানব-চরিত্রের মহত্ত্ব-পরিচায়ক নহে নিশ্চিতই ; কিন্তু কৃতাত্মনির্ভর ও তেজস্বী পুরুষে প্রায়ই এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।"[৩৩] সুতরাং বিদ্যাসাগরের বিক্ষত ব্যক্তিত্বের অন্তত একটি কারণ বিদ্যাসাগরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত ছিল।

পরিশিষ্ট—ক

বিদ্যাসাগরের জীবনের ও সমসাময়িক ইতিহাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাপঞ্জী

১৭৭২ রামমোহন রায়ের জন্ম।

১৭৭৪ ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮) ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৮৫ সালে তিনি পদত্যাগ করেন।

১৭৭৮ ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড প্রথম বাংলা-লিপিতে বাংলাভাষার ব্যাকবণ প্রকাশ করেন।

১৭৮১ কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৪ উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯২) ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৮৬ লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৩৮-১৮০৫) গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। কর্নওয়ালিশ ছিলেন হেস্টিংস-এর বিপরীত—'no apostle of the doctrine of assimilation' (Eric stokes)। জন শোর এবং চার্লস গ্রান্ট তাঁর পরামর্শদাতাদের অন্যতম ছিলেন।

১৭৯২ জোনাথান ডান্কানের উদ্যোগে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৯৩ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করে ভূমি-ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়। কোম্পানির চার্টার আইন পুনর্নবীকরণ করা হয়।

উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ব্যাপ্টিস্ট চার্চের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীরামপুরে আসেন; কিন্তু কোম্পানির সরকারের বিরোধিতায় মিশনারী কাজকর্মে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি; তিনি এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৭৯৯-তে শ্রীরামপুরে 'ব্যাপ্টিস্ট মিশন' স্থাপন করতে সক্ষম হন, কারণ শ্রীরামপুর ব্রিটিশ এলাকার বাইরে ছিল।

১৭৯৫ ইংল্যাণ্ডে Clapham Sect নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। চার্লস গ্রান্ট ও জন শোর এর সদস্য ছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, (১) ভারতকে সভ্য করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারীদের উপর বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা ও (২) দাস-ব্যবসায় বিলোপ করা।

১৭৯৮ লর্ড ওয়েলেস্লি (১৭৬০-১৮৪২) ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। ১৮০৫ সালে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের আদেশে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়।

১৮০০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৩ কোম্পানির চার্টার আইন পুনর্নবীকরণের সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজিত হয়। প্রথম ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় এবং

দ্বিতীয়ত "a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of the literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India." তৃতীয়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটে।

১৮১৪ রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমন।

১৮১৫ 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন রামমোহন রায়। এই সভায় সদস্য ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু (রাজনারায়ণ বসুর পিতা) ইত্যাদি। বেদপাঠ ও শাস্ত্র আলোচনা ছাড়াও নানা ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা, যেমন—পৌত্তলিকতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত।

১৮১৭ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ২০শে জানুয়ারি। মাতৃভাষায় স্কুল-পাঠ্য পুস্তক রচনায় উৎসাহ দিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্কুল বুক সোসাইটি'।

১৮১৮ বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়।

১৮২০ তদানীন্তন হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে ২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। (সন ১২২৭, ১২ই আশ্বিন)

১৮২১ Female Juvenile Society স্থাপিত হয় এবং এঁদেরই উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রয়াস হিসাবে কয়েকটি স্বল্পায়ু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৪ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা। ৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের ক্লাস আরম্ভ হয়। ১৮২৬ সালে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের বাড়ী তৈরি হয় পাশাপাশি।

১৮২৬ হেনরী লুঈ ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন।

১৮২৮ সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার জন্য ডিরোজিও "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন" নামে একটি সভা স্থাপন করেন।

চিৎপুর রোডের একটি বাড়ীতে রামমোহন রায় ২০শে আগস্ট 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

অক্টোবর মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ বীরসিংহে পরলোক গমন করেন।

নভেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুরদাসের সঙ্গে পড়াশুনার জন্য কলকাতায় আসেন।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন।

১৮২৯ ঈশ্বরচন্দ্র ১লা জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ-প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়।

১৮৩০ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ইত্যাদি রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপাত্র রূপে ১৭ই জানুয়ারি 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন।

রামমোহন ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ২৭শে নভেম্বর।

১৮৩১ ২৫শে এপ্রিল হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও পদচ্যুত হন। ২৩শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ-প্রভাকর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৮৩২ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় (রামমোহনের পুত্র) 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা' নামে বঙ্গভাষায় আলোচনার্থ এক সভা স্থাপন করেন ৩০শে ডিসেম্বর।

১৮৩৩ ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় ২৭শে সেপ্টেম্বর।

চার্টার আইনের পুনর্নবীকরণের সময় একটি ধারায় বলা হয়, "no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour of any of them, be disabled from holding any place, office or employment under this said company."

১৮৩৪ ক্ষীরপাইনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়।

১৮৩৫ রেভারেণ্ড উইলিয়াম অ্যাডাম ভারতে জনশিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন ১লা জানুয়ারি। তাঁর তিন খণ্ডের রিপোর্টের প্রথম দুই খণ্ড তিনি পেশ করেন যথাক্রমে ১লা জুলাই ও ২৩শে ডিসেম্বর। রিপোর্টে তিনি জনশিক্ষার দুরবস্থার চিত্রটি তুলে ধরেন।

৭ই মার্চ মেকলের বিখ্যাত মিনিট (Minute) পেশ করা হয় এবং এরই উপর ভিত্তি করে বেন্টিঙ্ক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সরকারী বরাদ্দের সমস্ত টাকা ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮৩৯ হিন্দু 'ল' কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে প্রশংসাপত্র লাভ করেন ঈশ্বরচন্দ্র।

১৮৪১ সংস্কৃত কলেজে ১২ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর ৪ঠা ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি ও প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ২৯শে ডিসেম্বর মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৪২ জুন মাসে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয়।

১৮৪৩ ১৬ই আগস্ট তত্ত্ববোধিনী সভার (স্থাপিত ১৮৩৯) মুখপত্র হিসাবে 'তত্ত্ববোধিনী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক ও বিদ্যাসাগর পেপার কমিটির অর্থাৎ প্রবন্ধ নির্বাচন কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন।

১৮৪৪ জনশিক্ষার উন্নতিকল্পে গভর্নর-জেনারেল হেনরী হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৭) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাতে ১০১টি মাতৃভাষায় স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। পাঠ্যসূচী ও শিক্ষক নির্বাচন বিষয়ে তিনি মার্শাল ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

১৮৪৬ ৬ই এপ্রিল মাসিক ৫০ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রূপে যোগ দেন। সেপ্টেম্বর মাসে সেক্রেটারী রসময় দত্তের নিকট সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন।

১৮৪৭ ১৬ই জুলাই রসময় দত্তের সঙ্গে মতান্তরের ফলে সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। এই বৎসর ছয়শত টাকা ধার করে বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সমান অংশীদারিতে 'সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরী' স্থাপন করেন। এই বৎসরই বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'অন্নদামঙ্গলে'র ১০০কপি ৬০০ টাকায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিক্রি করে প্রেসের ঋণ শোধ করেন। কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে মতবিরোধ হলে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের অংশ খরিদ করে নেন।

১৮৪৮ কলকাতায় পড়ার সময় ভাই হরচন্দ্রের কলেরায় মৃত্যু হয়। ১লা মার্চ বিদ্যাসাগর ৫ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরানী ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৮৪৯ গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ৭ই মে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের উদ্যোগেই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিশচন্দ্রও কলিকাতায় কলেরায় মারা যান।

প্রথম সন্তান নারায়ণের জন্ম হয় ১৪ই নভেম্বর।

১৮৫০ ৫ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরি ছেড়ে ৬ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৬ই ডিসেম্বর কলেজের সংস্কারের জন্য Notes on Sanskrit College পেশ করেন।

১৮৫১ ২২শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারীর পদের বিলোপ ঘটে।

১২ই আগস্ট বেথুনের মৃত্যু হয়।

এই বৎসর ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫২ সংস্কৃত কলেজের কৃতীছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-পদে নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট বিদ্যাসাগর এক প্রস্তাব পেশ করেন ১৩ই জানুয়ারি। সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

১৮৫৩ বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয়, বয়স্কশিক্ষার জন্য একটি নাইট স্কুল বা রাখাল স্কুল এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৫৮ সালে।

জুলাই-আগস্ট মাসে কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জে. আর. ব্যালেন্টাইন, এডুকেশন কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত শিক্ষা-সংস্কারের মূল্যায়ন করে যে রিপোর্ট দেন, বিদ্যাসাগর তাঁর উপর তীব্র ও তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের মধ্যেই তাঁর শিক্ষাদর্শের রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

১৮৫৪ বাংলা প্রেসিডেন্সীর লেঃ গভর্নরের পদ সৃষ্টি হয় এবং ১লা মে থেকে ঐ পদে নিযুক্ত হন এফ. জে. হ্যালিডে।

জানুয়ারি মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে । সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য যে বোর্ড অফ এগজামিনার্স গঠন করা হয়, বিদ্যাসাগর তার সদস্য হন।

৭ই ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর এডুকেশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে মাতৃভাষায় জনশিক্ষা সম্পর্কে যে Note দেন সেটিতেই জনশিক্ষা বিষয়ে তার চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯শে জুলাই তৎকালীন সেক্রেটারী অফ স্টেট স্যার চার্লস উড-এর বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপ্যাচে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়।

১৮৫৫ শিক্ষাবিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর রূপে মেদিনীপুর, হুগলী , নদীয়া ও বর্ধমান জেলার ভারপ্রাপ্ত হন ১লা মে। মাসমাহিনা আরও ২০০ টাকা বেড়ে মোট ৫০০টাকা হয়। ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে পদটিকে স্পেশাল ইন্সপেক্টর স্তরে উন্নীত করা হয়, কিন্তু মাইনে দুশ টাকাই থাকে। ৪টি জেলায় তিনি ১৯টি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। ৪ঠা অক্টোবর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য এবং ২৭শে ডিসেম্বর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য সরকারের নিকট গণস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পেশ করেন।

১৮৫৬ ১৬ই জুলাই বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। ৭ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা কালীমতির প্রথম বিধবাবিবাহ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন পানিহাটি-নিবাসী মধুসূদন ঘোষের সহিত কলিকাতা-নিবাসী ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। কয়েকদিন পরে রাজনারায়ণ বসুর এক কাকাও বিধবাবিবাহ করেন। এই বিবাহগুলিতে বিদ্যাসাগরের প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল।

১৮৫৭ ২৪শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর ফেলো নির্বাচিত হন।

সিপাহী-বিদ্রোহ ব্যারাকপুর থেকে উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতসরকারের নির্দেশে সংস্কৃত কলেজে সৈনিকদের অস্থায়ী হাসপাতাল হয় এবং কলেজের ক্লাস ৯২ নং এবং ১১০ নং বৌবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মোট ৮টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৫৮ জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে আরও ২৭টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ৩রা নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করেন।

১৮৫৯ পিতামহী দুর্গাদেবী অন্তর্জলী যাত্রা করে গঙ্গাতীরে প্রাণ বিসর্জন দেন। বীরসিংহে জাঁকজমক সহকারে পিতামহীর শ্রাদ্ধ হয়। মে মাসে বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

১৮৬১ এপ্রিল মাসে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ সালে শঙ্কর ঘোষ লেনের একটি ভাড়াবাড়ীতে কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬২ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পত্রিকা পরিচালনায় সঙ্কট দেখা দেয়। স্বত্বাধিকারী কালিপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরের হাতে দায়িত্ব দেন। ১৮৬২ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাস পালকে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেন।

১৮৬৩ ১৮ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

১৮৬৪ কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের নাম পরিবর্তন করে "হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন্" রাখা হয়।

১৮৬৫ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাশীবাস।

১৮৬৬ বিদ্যাসাগর কর্তৃক মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ।

১৮৬৬ মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলা প্রেসিডেন্সী, বিশেষ করে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার ব্যাপক জনসমষ্টি দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়। বিদ্যাসাগর বীরসিংহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দুর্গত মানুষদের জন্য একটি অন্নছত্র স্থাপন করেন। ৪/৫ মাস এই অন্নছত্র চলেছিল।

১৮৬৬ ২রা ডিসেম্বর মেরী কার্পেন্টারের (ব্রিস্টলে এদের বাড়িতেই রামমোহন রায় জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছিলেন) সঙ্গে উত্তরপাড়া থেকে কলকাতায় ফেরার সময় বিদ্যাসাগরের ঘোড়ার গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে। বিদ্যাসাগর যকৃতে সাংঘাতিক আঘাত পান। এই আঘাতজনিত অসুস্থতা থেকে বিদ্যাসাগর কখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি।

১৮৬৭ জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার সঙ্গে গোপালচন্দ্র সমাজপতির বিবাহ হয় জুলাই মাসে।

১৮৬৮ ২২শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামগোপাল ঘোষের মৃত্যু হয়।

১৮৬৮ ১৮ মার্চ বন্ধু সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়ের (চকদীঘি)) মৃত্যু হয়।

১৮৬৮ ঘাটাল-জাহানাবাদ অঞ্চলের কিছু ব্যবসায়ীর আয়কর অন্যায়ভাবে ধার্য করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের অভিযোগক্রমে বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়ে এই অঞ্চল পরিদর্শন করে তদন্ত করেন। অভিযোগের ফলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। মেজ ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সংস্কৃত প্রেসের মালিকানা দাবি। পরে বিবাদের সুষ্ঠু সমাধান হয়। ন্যায়রত্ন লিখিতভাবে স্বত্ব ত্যাগ করেন।

১৮৬৮-৬৯ বর্ধমানে ব্যাপক ম্যালেরিয়া মহামারীতে বিদ্যাসাগর বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের জন্য একটি ডিস্পেন্সারী স্থাপন করেন। বিনামূল্যে পথ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৬৯ মার্চ মাসে আকস্মিক আগুনে বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের বসতবাটী ভস্মীভূত হয়। তারপর প্রত্যেক ভাই ও বোনের জন্য পৃথক পৃথক বাড়ী তৈরি করে দেন। এই ঘটনার কিছু আগে সবাই পৃথগন্ন হন।

১৮৬৯ আগস্ট মাসে ঋণশোধের জন্য সংস্কৃত প্রেসের এক-তৃতীয়াংশ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং এক-তৃতীয়াংশ কালীরণ ঘোষকে মোট ৮ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে বিনামূল্যে 'বুক ডিপজিটরী' দান করেন।

১৮৬৯ জুন মাসে বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মুচিরাম-মনমোহিনীর বিধবা-বিবাহ দেওয়া হয়। ফলে তিনি চিরদিনের জন্য বীরসিংহ ত্যাগ করেন।

১৮৬৯ নভেম্বর মাসে আত্মীয়স্বজনের সংস্রব ত্যাগ করে নিভৃতবাসের ইচ্ছায় সকলকে চিঠি লিখে বিদায় নেন। কিন্তু সে ইচ্ছা ফলবতী হয়নি। এই সময়েই কার্মাটারে একটি ছোট বাড়ী তৈরি করেন।

১৮৭০ ২০শে ফেব্রুয়ারি বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

১৮৭০ মহেন্দ্র সরকার কর্তৃক 'Indian Association for Cultivation of Science' প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগর এক হাজার টাকা দেন।

১৮৭০ ১১ই আগস্ট পুত্র নারায়ণের সঙ্গে বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ হয়।

১৮৭১ ১৩ই এপ্রিল কাশীতে ভগবতীদেবীর মৃত্যু হয়।

১৮৭২ মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশনকে এফ. এ. পাস করার কলেজে উন্নীত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেন। এই বৎসরই পরীক্ষা দেওয়া শুরু হয়।

১৮৭২ মধ্যমা কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় জুন মাসে।

১৮৭৩ কাশীতে জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যু হয় ফেব্রুয়ারি মাসে।

১৮৭৪ অক্টোবর-নভেম্বর-এ স্বাস্থ্যের কারণে কানপুরে বাস। কাশী, লক্ষ্ণৌ ও প্রয়াগ ভ্রমণ।

১৮৭৪ ঘনিষ্ঠ বন্ধু জজ দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হয় ১৫ই ফেব্রুয়ারি।

১৮৭৫ তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে সূর্যকুমার অধিকারীর বিবাহ হয় ১৫ই জুন।

১৮৭৫ বীরসিংহের বিদ্যালয়, "ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব-প্রযুক্ত বন্ধ" হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ের কিছু আগে বালিকা বিদ্যালয় ও রাখাল স্কুলও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দাতব্য চিকিৎসালয় অবশ্য বন্ধ হয়নি।

১৮৭৫ ৩০মে শেষ উইল (এর আগে আরও দুটি উইল করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন) তৈরি করেন। এই উইলেই 'কুপথগামী ও যথেচ্ছাচারী' বলে পুত্র নারায়ণকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

১৮৭৬ ১১ই এপ্রিল কাশীতে ঠাকুরদাসের মৃত্যু। বিদ্যাসাগর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

১৮৭৬ এপ্রিলে কলকাতায় বাদুড় বাগানের (বর্তমানে বিদ্যাসাগর স্ট্রীট) বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ।

১৮৭৭ কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর সহিত কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ।

১৮৭৯ মেট্রোপলিটন কলেজে বি. এ. ক্লাস শুরু। ১৮৮৫-তে বড়বাজার এবং ১৮৮৭তে বহুবাজার শাখা বিদ্যালয় খোলা হয়।

১৮৮৭ মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজের শঙ্কর ঘোষ লেনের নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ হয় জানুয়ারি মাসে।

১৮৮৮ পত্নী দিনময়ীদেবীর জীবনাবসান হয় ১৩ই আগস্ট।

১৮৯০ বীরসিংহে বিদ্যালয় স্থাপন। বিদ্যাসাগর নিজেই নাম দেন 'ভগবতী বিদ্যালয়'।

১৮৯১ ২৯শে জুলাই ভোর রাত্রি ২-১৮ মিনিটে জীবনাবসান। নিমতলা শ্মশানে দাহকার্য সম্পন্ন হয়। পুত্র নারায়ণ মুখাগ্নি করেন।

পরিশিষ্ট—খ

বিদ্যাসাগরের রচনার কালানুক্রমিক তালিকা

নাম **প্রকাশের তারিখ**

বাসুদেব-চরিত **১৮৪২ ও ১৮৪৭ এর মধ্যে।**

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে প্রাসঙ্গিক অংশের ভাবানুবাদ। রচনাতে লেখকের নাম নেই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রের মধ্যে এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে সেই অপ্রকাশিত 'বাসুদেব-চরিত'ই তাঁহার প্রথম গ্রন্থরচনার সূচনা।" অন্য দু'জন জীবনীকার, বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র, বাসুদেব-চরিতকেই প্রথম গ্রন্থরচনার প্রয়াস বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

বেতালপঞ্চবিংশতি **১৮৪৭**

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকার হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখছেন, "কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বেতাল পচ্চীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দি পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছিলাম।" বেতাল একসময়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পড়া হোত।

বাংলার ইতিহাস **১৮৪৮**

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের, "Outlines of the History of Bengal for the use of youth in India." গ্রন্থের শেষ নয়টি অধ্যায় "বাংলার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড," রূপে অনুবাদ করেন। ১৭৫৬ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত ঘটনাবলী এই ইতিহাসে বিধৃত। বিদ্যাসাগরের কথায় বাংলার ইতিহাস, "ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যকবোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সংকলনপূর্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

জীবনচরিত **সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯**

রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বার্স, "Exemplary Biography নামক পুস্তকে বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী সংকলন করেছেন। "বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থীগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে এই আশায় আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" কিন্তু "সময়াভাব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাবশতঃ", তিনি সব জীবনীগুলি অনুবাদ করতে পারেন নি।

বোধোদয় **এপ্রিল, ১৮৫১**

প্রথম প্রকাশের সময় এর নাম ছিল শিশুশিক্ষা (চতুর্থ ভাগ)। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের

শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ নাম দেওয়া হয়।

এই বইটি চেম্বার্সের "Rudiment of Knowledge" অবলম্বনে রচিত হলেও অন্য গ্রন্থ থেকেও এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর কথায়, "অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি"।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা **নভেম্বর, ১৮৫১**

প্রথম শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপযোগী, আকারে ক্ষুদ্র গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের কথায়, "ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে, কিন্তু উপদেশ-সাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থসকল সহজে অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই।"

ঋজুপাঠ—প্রথম ভাগ **নভেম্বর, ১৮৫১**

পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান ও মহাভারত থেকে কিছু গল্পের সংকলন।

ঋজুপাঠ—দ্বিতীয় ভাগ

অযোধ্যাকাণ্ডের অংশবিশেষের সংকলন।

ঋজুপাঠ—তৃতীয় ভাগ

হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, ঋতুসংহার, বেণীসংহার, ভট্টিকাব্য গ্রন্থ হইতে সংকলিত। প্রত্যেক খণ্ডেই প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থকার।

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব **মার্চ, ১৮৫৩**

১৮৫১ সালে এডুকেশন সোসাইটির সেক্রেটারী মোয়াট-এর সভাপতিত্বে বেথুন সোসাইটি স্থাপিত হয়। সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে ভারতীয় ভাষায় প্রবন্ধপাঠের রীতি ছিল। ১৮৫৩ সালে সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সোসাইটির সভাপতির মত নিয়ে দুইশত কপি ছাপিয়ে বিলি করেন। একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর,কারণ প্রবন্ধ দুহাজার শব্দের বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না।

ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ **১৮৫৩**

ব্যাকরণ কৌমুদী, ২য় ভাগ **১৮৫৩**

ব্যাকরণ কৌমুদী, ৩য় ভাগ, **১৮৫৪**

ব্যাকরণ কৌমুদী ৪র্থ ভাগ **১৮৬২**

সংস্কৃত ভাষার অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তী ছাত্রদের জন্য রচিত। প্রকাশের পর থেকে ব্যাকরণ কৌমুদী বাংলাদেশে ছাত্রদের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ হয়ে আছে।

শকুন্তলা **ডিসেম্বর, ১৮৫৪**

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর' আখ্যানভাগের অনুবাদ। বিদ্যাসাগরের কালিদাসের প্রতি অসীম দুর্বলতা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। তাই বিদ্যাসাগরের অনুরোধে, "এই শকুন্তলা, দেখিয়া কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।"

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম পুস্তক জানুয়ারী, ১৮৫৫

বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ **এপ্রিল, ১৮৫৫**

বর্ণ পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ **জুন, ১৮৫৫**

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক। অক্টোবর, ১৮৫৫

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বই দু'টি Marriage of Hindu Widows নামে ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

কথামালা **ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬**

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং-এর অনুরোধে টমাস জেম্স্-এর ইংরেজী Æsop's Fables (১৮৪৯) এর ৬৮টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেন। প্রথম সংস্করণে ৬৮টি কাহিনী ছিল, ৩৭তম সংস্করণে ৭৪টি কাহিনী প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে শেষ সংস্করণে কাহিনীর সংখ্যা ছিল ৮৪।

চরিতাবলী **জুলাই, ১৮৫৬**

বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে বালিকাদিগের লেখাপড়ায় উৎসাহ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে"। এই সমস্ত কাহিনীগুলির কেন্দ্রীয় বক্তব্য হোল যে ব্যক্তিগত ঐকান্তিক চেষ্টায়, নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করেও মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করতে পারে। লক্ষণীয় যে, যেসব ব্যক্তিদের জীবন-কথা সংকলিত হয়েছে তাঁরা সবাই বিদেশী।

মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) **জানুয়ারি, ১৮৬০**

"তত্ত্ববোধিনী সভার" কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মূল মহাভারতের বাংলা গদ্য অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁর নিজের কথায় 'মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পৃথক প্রচারিত হয়, আমার এইরূপ অভিলাষ ছিল না। কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।. . . . . . .ফলত নানা কারণ-বশতঃ মহাভারতের অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।" বিদ্যাসাগর ৬২টি অধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন। সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। অনুবাদ শেষ করে কালীপ্রসন্ন উপসংহারে লিখেছেন, "বাস্তবিক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে, আমার অনুবাদ হইত না।"

সীতার বনবাস **১৮৬০**

বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি-রচিত 'উত্তরচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত ; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ গ্রন্থবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে।" এই বই তৎকালীন বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'Exile of Sita' নামে এই-বইটির ইংরেজী অনুবাদ করেন H. Jana Harding ১৯০৪ সালে।

আখ্যানমঞ্জরী **নভেম্বর, ১৮৬৩**

প্রথম প্রকাশের সময় (১৮৬৩) আখ্যানমঞ্জরীর কোনও ভাগ বা খণ্ডের উল্লেখ ছিল না। পরে "কলিকাতাস্থ কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আখ্যানমঞ্জরী যেরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুস্তকান্তর প্রস্তুত হইলে অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে। (১৮৬৮ সালে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপন।) শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগর তিন খন্ডে আখ্যানমঞ্জরীর পুনর্বিন্যাস করেন। মোট কাহিনীর সংখ্যা আটাত্তর, তার মধ্যে প্রথম ভাগে তেইশ, দ্বিতীয় ভাগে চৌত্রিশ এবং তৃতীয় ভাগে একুশটি কাহিনী আছে। কাহিনীগুলি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "এগুলি পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্বক সংকলিত হইল।

ভ্রান্তিবিলাস **ডিসেম্বর, ১৮৬৯**

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, "প্রত্যহ প্রায় পনের মিনিট লেখায় ব্যয় করে, পনের দিনের মধ্যে The Comedy of Errors অবলম্বনে বিদ্যাসাগর ভ্রান্তিবিলাস রচনা শেষ করেন। সেক্সপীয়রের নাটকটিকে তিনি কাহিনীরূপে বিবৃত করেছেন। নাটকের বিদেশী আবহকে তিনি ভারতীয় পরিবেশে রূপান্তরিত করে ভারতীয় মনের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার : প্রথম পুস্তক **আগস্ট, ১৮৭১**

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার : দ্বিতীয় পুস্তক **এপ্রিল, ১৮৭৩**

নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস **এপ্রিল, ১৮৮৮**

বিদ্যাসাগরের সুহৃদ্ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৭১ সালে মদনমোহনের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি অভিযোগ করেন যে বিদ্যাসাগরের "বেতালপঞ্চবিংশতি" বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের যৌথ রচনা ; বিদ্যাসাগর অন্যায় ভাবে একা নিজের নামে এই গ্রন্থ প্রচার করেছেন। বিদ্যাসাগর বেতালপঞ্চবিংশতির পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় এর জবাব দেওয়ার পর যোগেন্দ্রনাথের মুখ বন্ধ হয়। কুৎসা কিন্তু চলতেই থাকে। কিছুদিন পরে যোগেন্দ্রনাথ আবার দাবি করলেন যে শিশুশিক্ষার গ্রন্থস্বত্বের অংশ মদনমোহনের উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। এমনকি তিনি বিদ্যাসাগরকে উকিলের চিঠিও দিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিকট মদনমোহন লিখিত চিঠিপত্র পড়ে প্রকৃত সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে যোগেন্দ্রনাথ 'বিষণ্ণবদনে মৌনালম্বন করিয়া রহিলেন"। যোগেন্দ্রনাথ

তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। বিদ্যাসাগর, অনেক কুণ্ঠার সঙ্গে, যোগেন্দ্রনাথের কুৎসার জবাবে সত্য ঘটনা বিবৃত করেছেন এই পুস্তিকায়।

সংস্কৃতরচনা **নভেম্বর, ১৮৯০**

এই সংস্কৃত শ্লোকগুলি ছাত্রজীবনের রচনা। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে এগুলি সংকলিত হয়েছিল। সংস্কৃতে মৌলিক রচনা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আজীবন অনীহা ছিল। 'আমরা সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত রচনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি কেহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন, ঐ লিখিত সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত বলিয়া প্রতীতি হইত না। এইজন্য আমি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে কদাচ অগ্রসর হইতাম না।" সংস্কৃত রচনা সম্পর্কে এই ছিল তাঁর অভিমত।

শ্লোকমঞ্জরী **মে, ১৮৯০**

এটি বিদ্যাসাগর সংকলিত উদ্ভট শ্লোকসংগ্রহ। এই সংকলনে মোট পাঁচশত শ্লোক আছে; তার মধ্যে শেষ চল্লিশটি শ্লোক আদিরসাত্মক।

ভূগোল-খগোল দর্শন **এপ্রিল, ১৮৯২**

সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্র-শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় জন মিয়র নামে একজন সিভিলিয়ান সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃত শ্লোক রচনায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করতেন। তিনি একবার ঘোষণা করলেন যে পুরাণ, সূর্যসিদ্ধান্ত ও পাশ্চাত্ত্য মতে ভূগোলের বিষয়বস্তুর উপর একশত উৎকৃষ্ট শ্লোকের জন্য একশত টাকা পুরস্কার দেবেন। বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে মোট ৪০৮টি শ্লোক-রচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত) **সেপ্টেম্বর, ১৮৯১**

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি প্রকাশ করেন। কাজের চাপে এবং অসুস্থতার জন্য মাত্র দু'টি পরিচ্ছেদ লিখে যেতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর।

প্রভাবতী সম্ভাষণ **এপ্রিল, ১৮৯২**

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রভাবতী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা; মাত্র তিন বৎসর বয়সে এর কলেরায় মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগরের স্নেহ এই বন্ধু-কন্যাকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। প্রভাবতীর মৃত্যুর মাস চারেক পরে তিনি এইটি রচনা করেন এবং মৃত্যুর তিন-চার মাস আগে পর্যন্ত এটি বিরলে মাঝে মাঝে পড়তেন।। মোহিতলাল মজুমদারের কথায়, "এ বিলাপ তিনি প্রকাশ করিবার জন্য রচনা করেন নাই, কারণ ইহার মধ্যে যে মর্মন্তুদ দুঃখের অতি করুণ কাতরধ্বনি রহিয়াছে, তাহা অপরকে শুনাইবার জন্য উচ্চরোদন রব নহে।. . . . . . .আমার মনে হয়, ইহাতে মৃত মহাত্মার অনুমতি ছিল না, আমরা যেন সত্যিই অন্যায় কাজ করিয়াছি।" সাহিত্যবিতান, ১৩৪৯, পৃঃ ৬২।

রামের রাজ্যাভিষেক **১৯০৯**

১৮৬৯ সালে এটি রচনা করেন এবং সেই সময়েই ছাপা শুরু হয়। কিন্তু ঐ সময় শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর সেটি পড়ে মন্তব্য করেন, "বেশ হয়েছে।" তারপর নিজের রচনা আর সম্পূর্ণ করেন নি এবং ছাপাও বন্ধ করে দেন। পরে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত "রামের অধিবাসে," পিতার লিখিত অংশটি যোগ করে প্রকাশ করেন।

শব্দসংগ্রহ **১৯০১**

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সন ১৩০৮ সালে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ৭৪-১৩০) প্রকাশিত।

বাল্যবিবাহের দোষ **১৮৫০**

'সর্বশুভকরী' নামক এক স্বল্পজীবী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (শকাব্দ ১৭৭২, ভাদ্র) প্রকাশিত। এটিতে লেখক হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম না থাকলেও এটি বিদ্যাসাগরের রচনা বলেই স্বীকৃত।

বেনামী রচনা

বিদ্যাসাগরের বেনামে যে ৫টি পুস্তিকা আছে তার সবগুলিই ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিপূর্ণ। প্রত্যেকটিতেই প্রতিপক্ষকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। বিনয় ঘোষ ছাড়া বিদ্যাসাগরের সমস্ত জীবনীকারই স্বীকার করেছেন যে এই রচনাগুলি বিদ্যাসাগরের রচনা।

অতি অল্প হইল, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য **মে, ১৮৭৩**

আবার অতি অল্প হইল, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য **সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩**

ব্রজবিলাস, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য, **নভেম্বর, ১৮৮৪**

বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা কস্যচিত তত্ত্বান্বেষিণঃ **নভেম্বর, ১৮৮৪**
(দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার নাম হয় 'বিনয় পত্রিকা')

রত্ন-পরীক্ষা, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য **আগস্ট, ১৮৮৬**

বিদ্যাসাগর সম্পাদিত রচনা

অন্নদামঙ্গল, ১ম ও ২য় খণ্ড **১৮৪৭**

রঘুবংশম্ **জুন, ১৮৫৩**

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ **১৮৫৩**

সর্বদর্শনসংগ্রহ **১৮৫৩-১৮৫৮**

শিশুপালবধম্	১৮৫৭
কুমারসম্ভবম্	১৮৬১
কাদম্বরী	১৮৬২
মেঘদূতম্	এপ্রিল, ১৮৬৯
উত্তরচরিতম্	নভেম্বর, ১৮৭০
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্	জুন, ১৮৭১
হর্ষচরিতম্	মার্চ, ১৮৮৩

রচনা-সংকলন

বিভিন্ন সময়ে বিদ্যাসাগরের রচনার নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

১. গ্রন্থাবলী

প্রথম 'গ্রন্থাবলীর' দুইটি খণ্ড নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সন ১৩০২ সালে প্রকাশ করেন। ভূমিকায় নারায়ণ লিখেছেন, "কার্যটি বহু ব্যয় ও সময় সাধ্য! এতদিনে উহার দুই খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইল।" দুইখণ্ডে মোট ৮টি বই ছিল। নারায়ণ লিখছেন, "এই আটখানি পুস্তকের মূল্য পৃথক ধরিলে ৭৷৷ টাকা হয়, কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য দুই খণ্ডের মূল্য চারিটাকা মাত্র নির্দিষ্ট হইল। গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিতে পাইলে পিতৃদেবের রচিত শিশুপাঠ্য ও অপর পুস্তকগুলি প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।" বলা বাহুল্য গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।

২. **বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী ঃ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকাশকাল, সন ১৩৪৪-৪৬।**

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসংরক্ষণ সমিতি বীরসিংহে স্মারক নির্মাণ, মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর হল' নির্মাণ (রবীন্দ্রনাথ দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন) ছাড়াও বিদ্যাসাগরের সমগ্র রচনাবলী, সাহিত্য (১৩৪৪), সমাজ (১৩৪৫), শিক্ষা ও বিবিধ (১৩৪৬)—এই তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সম্পাদনা ও প্রকাশনার সৌষ্ঠবে এইটি শ্রেষ্ঠ।

৩. **বিদ্যাসাগর রচনাবলী ঃ দেবকুমার বসু সম্পাদিত। ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৬৬, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৬৯।**

৪. **বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। গোপাল হালদার সম্পাদিত। ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ।**

এ ছাড়া নির্বাচিত রচনা-সংকলন প্রকাশ করেছেন আরো কয়েকজন।

শিক্ষা-সংক্রান্ত দলিল

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে বৃহত্তর জনসমষ্টির নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট মান ঠিক করে দেওয়া। বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষা পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে না ; আবার ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল, সংস্কৃতের সাহায্যে মাতৃভাষাকে শক্তিশালী করতে হবে এবং ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান আহরণ করে মাতৃভাষাকে সম্পদশালী করতে হবে। তবেই মাতৃভাষার মাধ্যমে যথার্থ যুগোপযোগী শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবে। সংস্কৃত কলেজে সংস্কারের লক্ষ্য ছিল এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করা যাঁরা মাতৃভাষায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার, বস্তুতপক্ষে, জনশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ।

ক ঃ নিচে উদ্ধৃত ৪টি দলিলে সংস্কৃত কলেজে সংস্কারের রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে ; বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত শিক্ষা-চিন্তাটিও প্রকাশ পেয়েছে। দলিল চারটি হোল, (১) এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারী মোয়াটকে লেখা একটি চিঠি যাতে সংস্কৃত কলেজের পাঠসূচী ইত্যাদির সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন বিদ্যাসাগর। এটি ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫০ সালে লেখা। ১৮৫১-৫২ সালে এডুকেশন কাউন্সিল এই প্রস্তাব কার্যকর করার নির্দেশ দেন। (২) ১৮৫৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেণ্টাইন কাউন্সিলের নির্দেশে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দেন, সেই রিপোর্ট, (৩) বিদ্যাসাগরের জবাব এবং (৪) কাউন্সিলকে লেখা বিদ্যাসাগরের ১৮৫৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরের চিঠি।

(১) এফ. জে মোয়াটকে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি ঃ

To

F. J. MOUAT, ESQ., M.D.,

Secretary to the Council of Education.

Sir,

I have the honour to submit, for the information of the Council of Education, a report on the Sanscrit College, drawn up aggreeably to the instructions conveyed in your letter No. 3538 dated the 5th instant.

I beg leave to remark that it has long been in my contemplation to submit a report of the nature now furnished, but circumstances deterred me from such a step. I am now, however, happy to have an opportunity of carrying out my wishes, as a matter of duty, under the sanction of the Council.

Report

1. **Grammar Department.**—Under the present system this department consists of five classes.* The works studied are Mugdhabodha, Dhatupatha, Amarakosha and Bhatti Kavya ; the fifth class studying 17 pages of Mugdhabodha ; the fourth class, 42 pages of the same work ; the third class. 100 pages ; the second class, the remaining 90 pages of the same book, together with Dhatupatha ; and the first class, a few books of Bhatti Kavya and a certain portion of Amarakosha. † Four years # are the prescribed period for continuing in this department ; but five years are necessary to enable a student to pass through the five grades. For want of a better system, the advantage gained is very little compared with the length of time spent by students in this department.

Mugdhabodha is a very short compendium of grammar. The author Vopadeva seems to have had brevity simply in view. Having had this for his object, he has, consequently, made his work extremely difficult. The Sanscrit is in itself a very difficult language, and to begin its study with a difficult grammar seems in my opinion; not to be a well-chosen plan. Experience shows what difficulties one has to surmount when studying his grammar in this style. Young lads who begin to study Sanscrit, on account of the extreme difficulty of the Grammar Mugdhabodha, only learn by note what their instructors say, without being able of themselves to understand the contents of the work they read. Thus 5 years pass in the study of grammar alone, without getting any essential introduction to the language itself. It seems to be an astounding fact that one should be studying a language for 5 years and scarcely understand a bit of it. Moreover, the Mugdhabodha, with all its

*After the foundation of the college in 1824, there were only two Grammar classes, one of the Mugdhabodha and another of Panini. The second Mugdhabodha Grammar class was established in January 1825 ; the third in November 1825 , the fourth in May 1846 ; and the fifth in January 1847. The Panini class was dropped in January 1828.

†At first the Mugdhabodha Grammar and a few books of the Bhatti Kavya, were read from the beginning to the end in all these classes. Though called first, second, third and fourth, the promotions from each of these classes, were to the Sahitya or Literature class. The present division of study of different parts in different classes, and the study of the Amarakosha and Dhatupatha were introduced by orders of the Council of Education, dated the 31st October 1846.

#The original period for study was 3 years—extended to 4 years in 1840.

voluminous commentaries, which last, however, are not read in the college, is an imperfect grammar. So, under the present system, the first 5 years of a student of the Sanscrit College, is almost lost to useless purposes. After all his toil and trouble, his acquirements in grammar are very imperfect. Again, Dhatupatha, another of the works studied in this department, is a collection of Sanscrit roots in verse. Amarakosha, the third work of study, is a dictionary also in verse. These two works when mastered, I admit, are of some assistance to the study of literary works. But the advantage gained is not at all commensurate to the time and labour required to get them by heart. Besides, almost all the standard Sanscrit poetical works, which are the main part of Sanscrit literature, being accompanied by excellent commentaries by Mallinatha, supersede altogether the use of the study of the abovenamed two works, Dhatupatha and Amarakosha. I beg leave to say that this commentators is not like his brethren who "blanch the obscure places and discourse upon the plain." Under the above considerations, I do not think it a good plan to spend the first 5 years of study in the Sanscrit College in reading Mugdhabodha, Dhatupatha and Amarakosha. Bhatti Kavya, the fourth and last work of study in this department, is a poem, the theme of which is Rama and his adventures. This work was purposely written to exemplify the rules of grammar. It is not altogether ill-adopted for the grammar department.

After all these considerations, I beg leave to propose the following remodelled system of study for the grammar department. Should the Council be pleased to adopt the suggestion, I do think, in my humble opinion, that in 4 years, the time prescribed now for grammar study, the students shall have a thorough knowledge of grammar, and tolerable proficiency in literature besides, and they will not experience that difficulty in the Sahitya class which they do now, being made all at once, just after finishing an imperfect grammar, to begin with the standard works, without having had an insight into the language.

The system I would propose is this : The boys instead of beginning the grammar at once in the Sanscrit language, should learn some of the most fundamental rules dressed in the easiest Bengali ; then they should go on with two or three Sanscrit "Readers" to be compiled. These "Readers" should consist of easy selections from the Hitopadesha, Panchatantra, Ramayana, Mahabharata and from other works suited for the purpose. This will take the students some two years. After this they should begin with Siddhanta Kaumudi, Bhattoji Dikhshita, the study of which they should continue to the highest

class of the grammar department. Of all the Sanscrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject. It is at once complete and simple. Along with Siddhanta Kaumudi the students should also study Raghu Vansha and selections from Bhatti Kavya, Dashakumar Charita, etc., etc. * I beg leave also to propose that instead of five classes there should be four, and the fifth be considered as a section of the fourth, both studying the same books, and the promotions from both the classes being to the third. By this arrangement a year will be coveniently saved, and the period for the grammar department instead of being five shall be four years.

2. Sahitya or General Literature.—The students coming from the grammar department have to study in this class for 2 years. Whilst here, they read the following works :—

(1) Raghuvansa.
(2) Kumarsambhava.
(3) Meghaduta.
(4) Kiratarjuniya.
(5) Shishupalabadha.
(6) Naisadha Charita.
(7) Shakhuntala.
(8) Vikramorvashi
(9) Ratnavali
(10) Mudrarakshasa.
(11) Uttara Charita.
(12) Dasakumara Charita.
(13) Kadambari.

They also practise translation from Bengali into Sanscrit and *vice versa*, and attend the mathematical class.

The first 6 of the 13 books above mentioned are the standard poetrical works ; the seventh, eighth, ninth, tenth and eleventh are dramas ; the last two are prose compositions. Reghu Vansha is an historical poem in 19 books. Its theme is the adventures of Rama, those of his four immediate ancestors, and the advanures of his descendants down to Agnivarna. Kumarsambhava, from the name, would appear to be a poem all celebrating the birth of Kartikeya, the Mars of the Hindus. But the 7 books that are extant embrace a certain portion of the intended theme. The poem as it stands, describes the birth of Parvati, the mother of Kartikeya, the burning of Kamadeva, the god of love by Shiva, the Tapasya (austerities) of Parvati and her marriage with Shiva. Meghaduta is a poem in 118 slokas. A Yaksha or demi-god, having excited

*In a subsequent communication Pundit Eswar Chandra Sarma recommends the introduction into the first Grammar class of the "Vrittaratnakara," a highly esteemed work on prosody.

the wrath of his master Kuvera, the god of wealth was doomed, by the curse of the master deity, to remain in a state of separation, away from his beloved wife, in a distant land, for the full length of one year. The lover in his distressed condition addresses a cloud, to bear his message to his wife at Alaka, the capital of Kuvera. The Shakuntala and Vikramorvashi are dramas ; the first has for its subject the story of Shakuntala, the adopted daughter of a sage named Kanwa, and Dushmanta, a king ; the plot of the second is the story of Pururava, a king, and Urvashi, a nymph. All these are very excellent productions. They are by the immortal Kalidasa. Every one of them bears the stamp of his great genius. Shishupalabadha, Kiratarjuniya, and Naisadha Charita are epic poems, the first by Magha in 20 books, and the second by Bharavi in 17 books, the third by Shriharsha in 22 books. The death of Shishupala by the hand of Krishna, his cousin, is the theme of Magha's poem. The Kiratarjuniya contains the tapasya of Arjuna, his combat with Shiva in the disguise of a kirata or barbarian, and finally his acquisition of ceratin weapons as rewards from Shiva, who was pleased with his military prowess. The adventures of Nalarája from the subject matter of Naisadha Charita. The first-mentioned two works possess all the attributes of good epics, only now and then there are some very tedious passages. The 7th, 8th, 9th, 10th and 11th books of Shishupalabadha, though the finest specimens of poetry, and the 7th, 8th, 9th and 10th books of Kiratarjuniya have in many places very obscene passages. Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste ; there are occasional bursts, however, of fine passages. Uttara Charita by Bhavabhuti, is a drama, embracing the latter part of the career of Rama. Ratnavali is also a drama. Dhavaka is its author. He was paid by Rajah Shriharsha to write this work along with another, and attribute its authorship to him. The story of Rajah Udayana and Ratnavali is the plot of this drama. These two works are excellent in every respect. Mudrarakshasa, by Vishakhadatta, may be called a political drama. In its contents we find that Chanakya, the Prime Minister of Chandragupta, the Sandracottus of the Greeks, is applying his diplomatic skill to consolidate the newly acquired empire of his master, by baffling all the efforts of Rakshasa, the royal Prime Minister of subverted Nanda family, to subvert in turn the new dynasty. This also is a good piece of composition. Dasakumara Charita and Kadambari are in prose. In the first a certain number of friends are relating to each other the history of their travels. The style is pure and chaste. There are, however, some objectionable passages. Dandi is its author. Kadambari is a novel, or

rather an epic poem in prose. It is in 2 parts. The first part is a masterpiece of Sanscrit composition. The author, Vanabhatta, did not live to complete his admirable work. His son wrote the second part. The production of the son is far inferior to that of the father.

Having laid all this before the Council, I beg leave to state there is not much alteration required in the purely literary studies of this class. With regard to mathematical studies I will speak hereafter, when I report on the Jyotisha class. The change I would propose is this ; Raghu Vansha, as I have proposed in my report of the grammar department, should be transferred to the first grammar class, and the Dashakumara Charita, instead of being read entire here, be studied in selections in one of the grammar classes, and that Shishupalabadha, Kiratarjuniya, and Naisadha Charita, having many objectionable passages, as stated before, instead of being read entire, be studied in selections. The first part only of Kadambari should be read. All the other works should be read entire. In addition to this I beg leave to propose that two other works, Vira Charita and Santishataka, be studied in this class. The former is the first part of that drama of which Uttara Charita is in the second, being in no way inferior to it. The Santishataka is an excellent didactic poem. The students should practise translating as before. They should also write' essays in Sanscrit and Bengali.

3. **Alankara or Rhetoric Class**—After Sahitya the students come to this class and continue in it for two years. * They read in this class the following works on rhetoric :—

(1) Sahitya Darpana.

(2) Kavya Prakasha.

(3) Kavya Darshan.

(4) Rasagangadhara.

They also read those poetical works which from want of time they cannot go on with in the Sahitya class. Besides this, they have for their exercise, translations and compositions. They also attend the mathematical class.

With regard to this class I beg leave to propose the following change. The text-books should be Kavya Prakasha and Dasharupaka. Generally Sahitya Darpana is the work read ; but I prefer Kavya Prakasha and Dasharupaka on the following grounds. Kavya Prakasha is a much more profound work than Sahitya Darpana, and is acknowledged to be the highest authority on the

*Formerly the period of study in this class was one year, which was extended to two years by order of the Council, dated the 28th November 1846.

subject. The best commentators, such as Mallinatha, quote this work for their authority. The Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, however, speaks nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of rhetoric. Besides this is the highest authority in its own department. Kavya Prakasha and Dasharupaka could be read in less time than Sahitya Darpana. So the former two have every claim to be preferred to the latter, and after reading the two first, to read the last also would be waste of time. The purely literary works, should my suggestions regarding the studies of the grammar and Sahitya departments be adopted, will not require to be studied as class books in this (rhetoric) class. The hours that will thus be saved from the immediate objects of the class should be devoted to the study of mathematics and other works of which I will make mention afterwards.

4. **Jyotisha or Mathematical Class.**—The students of the Sahitya and Alankara classes attend this class and study Lilavati and Vijaganita. Lilavati is a treatise on Arithmetic and Mensuration by Bhaskaracharya. Vijaganita is a treatise on Algebra by the same author. Both of these works are very meagre. They are in a great measure without any method, and do not contain all that is contained in similar English books. From a curious taste they have been rendered needlessly difficult. The rules and questions are all in verse. On account of this the students take so great a length of time as four years to study these two books. The examples are too few. *

Great changes are required in this branch of study. For the present complete treatises on Arithmetic, Algebra and Geometry should be compiled from the best English works on those subjects. After studying these, the students will be able to read Lilavati and Vijaganita with great facility. The higher branches of Mathematics should be attempted to be translated afterwards, and when ready should be adapted as class books. I would now propose that a popular

*The chair of mathematics was first created in June 1826, down to 1835, the students of the Sahitya and Alankara classes attended this class as at present. In 1835 it was made a separate class, i.e., instead of the Sahitya and Alankara class students attending this class, the students of Alankara were promoted to this class, and studied here for one year. In 1839 this arrangement was set aside, and the Smriti and Nyaya class students were required to attend certain set hours. This arrangement was again put aside in April 1846, and the students of the Sahitya and Alankara classes were again made to attend this class and that arrangement continues to the present day. From the very establishment of the class Lilavati and Vijaganita were the Text-books. Kshetratattwadipika, a Sanskrit translation of geometry, as contained in Hutton's Mathematics, was read in the class once for all in 1839. This book is not better than Lilavati and Vijaganita.

treatise on Astronomy. Such as Herchel's be compiled in Bengali, and be read in the mathematical class. These works might have been studied in English ; but their appearance in Bengali will be of great use also in the Vernacular schools. Besides the Sahitya and Alankara students, the students of the Smriti and Nyaya classes should attend the lectures of the Professor of Mathematics.

Here the junior department of the Sanscrit College is considered to terminate.

I beg leave to propose that the study of Bengali books, treating on useful and entertaining subjects, be introduced in the classes of the junior department. The works should treat of such subjects as the following :—

For the Fourth Grammar Class.—Pretty stories about animals.

For the Third Grammar Class.—Rudiments of knowledge, as in Chambers's Educational Course.

For the Second Grammar Class.—Moral Class Book, as in Chambers.

For the First Grammar Class.—Miscellaneous subjects, such as Art of Printing, Loadstone, Navigation, Earthquake, Pyramids, Chinese Wall, Honey Bee, etc.

For the Sahitya Class.—Biography, as in Chambers, and miscellaneous reading on useful and entertaining subjects selected and translated from Telemachus, Rasselas, Mahabharata, etc.

For the Alankara Class.—Essays on Moral, Political, and Literary Subjects, and a popular treatise on the Elements of Natural Philosophy.

Should the Council be pleased to introduce these Bengali books, the students of the Sanscrit College will, with little difficulty, acquire great proficiency in Bengali, and through the medium of that language, derive useful information, and thereby have their views expanded before they commence their English studies.

Of the abovementioned Bengali works, the biography is already published ; rudiments of knowledge and moral class book are in the press, and almost all the other works are in the course of preparation. The adoption of these books will entail on the Council no expense whatsoever.

I beg also to state that the preparation and the publication of the rudiments of Sanscrit grammar in Bengali and that of the Sanscrit selections shall need no pecuniary assistance of the Council.

The preparation of the works for the Mathematical class, namely, Arithmetic, Algebra, Geometry and popular treatise on Astronomy, suitable for the use of the Sanscrit College, will need the patronage of the Council of Education when the state of the education funds will admit of this being afforded.

5. **Smriti of Law Class.**—After the Alankara the students come to this class, and continue in it for three years. The works read are—

(1) Manusanhita.
(2) Mitakshara, 2nd Section
(3) Vivada Chintamani.
(4) Dayabhaga.
(5) Dattaka Mimansa.
(6) Dattaka Chandrika.
(7) Ashtavinshati Tattwas.

The institute of Manu is the highest authority on the subject of Hindu Law. It treats of social, moral, political, religious and economical laws. It is in a manner an index of Hindu society in ancient times. Mitakshara, by Vijnaneshwara, is a commentary on Yajnavalkya's Code. The second section treats of civil and criminal laws, the former including the law of inheritance, Mitakshara is acknowledged to be the highest authority in the North-Western Province. Vivada Chintamani, by Vachaspati Mishra, is a compilation of civil and criminal laws. This work is the authority in the Province of Bihar. Dayabhaga, by Jimutavahana, is a treatise on inheritance. This work is the authority in Bengal. Dattaka Mimansa and Dattaka Chandrika are treatises on the adoption of children and their civil rights. The Mimansa is the authority in the North-Western Provinces and the Chandrika in Bengal. The Ashtavinshati Tattwas are by Raghunandana, With the exception of the Daya and Vyavahara Tattwas, the former on the law of inheritance, the later on the court procedure, the other 26 Tattwas are treatises on the forms of religious ceremonies.*

With regard to this class I beg leave to observe that the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued. Though they are of use to the Brahmans as a class of priests, they are not at all fitted for an academical course. The other works should be allowed to keep their place. Their study makes one conversant with the Hindu law of every part of India.

6. **Nyaya Class.**— The Nyaya system of philosophy principally treats of Logic and Metaphysics, and occasionally touches upon subjects relating to

Chemistry, Optics, Mechanics, etc. The same description applies more or less to the other systems, excepting Mimansa and Patanjala, which treat of religious ceremonies and abstract contemplation of the deity respectively. The years of study in this class are four,†the work studied are the following :—

(1) Bhashaparichchheda.
(2) Siddhanta Muktavali.
(3) Nyayasutras with Vitti or commentary.
(4) Kusumanjali.
(5) Anumana Chintamani and Didhiti.
(6) Shabdashaktiprakashika.
(7) Paribhasha.
(8) *Tattwa Kaumudi.
(9) Khandana
(10) Tattwa Viveka. #

Bhashaparichchheda, by Vishwanatha Panchanana, is an elementary treatise on all the departments of Nyaya. Siddhanta Muktavali is a commentary on the Bhashaparichchheda by the author himself. Nyaya Sutras are by Goutama, the founder of this school of philosophy. Kusumanjali treats of the existence of the deity and that of a future state. The line of argumentation on the whole is similar to what is to be found in modern European works on the same subject. The author is Udayanacharya. Anumana Chintamani is work of the modern school of Nyaya Philosophy, on deduction, by Gangeshopadhyaya. His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle ages of Europe. The treatise is what Bacon would call a "cobweb of learning". In the study of this work insurmountable difficulties are to be met with. Anumana Didhiti is its commentary, by Raghunath Shiromani. He is the dictator in the modern Nyaya School of Philosophy. Shabdashaktiprakashika, by Jagadisha, is a treatise on the import of words. Paribhasha, by Dharmaraja, is a short treatise on the Vedantic doctrines. Tattwa Kaumudi, by Vachaspati Mishra,

*The 28 Tattwas were introduced by order of the Council of Education, dated the 10th June 1846.

†From 1824 to 1835, students from the Alankara class were promoted at their option either to the Nyaya or Smriti class. For the remaining 5 or 6 years they studied in either of the classes, of such as liked, studying 1 or 2 years in the Nyay class, joined that of Smriti. In 1835, it was compulsory on every one to study 2 years in the Nyaya class and the remaining portion in Smriti. This continued up to 1846, when by order of the Council of Education, dated the 28th November, the period was extended to 4 years.

#The books marked 5, 6, 7, 8, 9, 10 were introduced by order of the Council of Education dated the 17th February 1847.

is a short but comprehensive treatise on the Sankhyá system of philosophy. Khandana is by Shriharsha. The object of the author in this work is to refute all the then existing systems of philosophy, and to establish his favourite, the Vedantic. This work is of high repute. The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call "muddy metaphysics." Tattwa Viveka, by Udayanacharya, aims at refuting the Bouddha or atheistical doctrine and providing the necessity of a maker of the universe. The style of this work has the opposite faults of being abstruse and diffuse.

After the above observations, I beg leave to suggest that this class, instead of being called the Nyaya or Logic Class, be called the Darshana of Philosophy Class, and that the study of Anumana Chintamani and Didhiti, Khandana and Tattwa Viveka be discontinued, and in their place be studied the following works on the other systems of philosophy, excluding the Mimansa or rule of religious ceremonies :—

(1) Sankhyapravachana.
(2) Patanjala Sutra.
(3) Panchadashi.
(4) Sarvadarsanasangraha.

The period of study in the Sanscrit College is 15 years.

One is expected to have a perfect knowledge of Sanscrit learning in so long a period. But no one may be considered to have such knowledge who is not familar with all the systems of philosophy prevalent in India. True it is that the most part of the Hindu systems of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is underiable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. Should the Council be pleased to adopt the suggestions that I will submit in the succeeding part of my report regarding the English department, by the time that the students come to the Darshana or Philosophy class, their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have an ample opportunity of comparting the systems of Philosophy of their own, with the new Philosophy of the western world. Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of Philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of Philosophy in India, is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other, and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

7. **English Department.** *—The present mode in which this very useful department is conducted is very unsatisfactory. There is no rule as to what students are expected to study English, but it is entirely left to their own option. They commence the study when they please, leave it off at their own option, and commence again when it suits their purpose. Many students on being attached to the grammar classes, at their first admission, immediately commence English, but from difficulty of the first principles of both languages, the greater part being unable to carry on both at once, some after a short time neglect their English and others the Sanscrit. It is the case with many to retire from the English class just before the examinations. The very same students come again to be admitted at the beginning of the next session. There is another circumstance which causes great confusion, which is that one English class is constituted of students of various Sanscrit classes. Take, for instance, the components of the third and fourth classes. The third class consists of 13 boys, 4 of whom belong to the Smriti class, 1 to the Nyaya, 1 to the Alankara, 3 to the third Grammar class, and 4 to the fourth Grammar class. The fourth class consists of 33 boys, 2 of whom belong to the Alankara class, 5 to the Sahitya, 2 to the first Grammar class, 6 to the second, 10th the third, 6 to the fourth, and 2 to the fifth Grammar class. From the circumstance of students of various Sanscrit classes coming to attend the English class, it becomes altogether a difficult affair to secure regular attendance in the latter. Again, the study of English being optional, some portions only of each Sanscrit class are students in the English department. Such students, particularly those from the lower classes, cannot go on with their Sanscrit studies with that degree if attention which the non-English reading students can. But the studies of the class being the same with all, the progress in both the languages is greatly impeded.

The English department, if continued to be conducted in this irregular style, is not expected to be productive of any satisfactory results. After the creation of the English department in this institution a similar irregular mode of conducting in rendered it useless, which caused its abolition by the late General Committee of Public Instruction. If better arrangements be not made, the present English department will also become useless.

*The English department was established in May 1827 It was abolished by the orders of the General Committee of Public Instruction in November 1835 It has been re-established in October 1842 by the orders of the Council of Education

Under the above considerations, I beg leave to suggest the following arrangement, which, I am persauaded, if steadily pursued, will be productive of beneficial results. The arrangement I would propose is as follows :—

The students would not be allowed to commence English till they have acquired some proficiency in the Sanscrit language : the pupils of the same Sanscrit class shall go on with the same English studies : the study of English instead of being optional be compulsory ; should there be any one very unwilling to be taught in English, he be given to understand that he will not be allowed to commence English at any subsequent stage of his Sanscrit study, as to create for him alone a separate class is altogether out of the question.

Under the proposed system of Sanscrit study, the students of the Sahitya class, it is assumed, will be well acquainted with the Sanscrit language. Therefore I beg leave to propose that the study of English be commenced in the Alankara class. In that case the students will be able to devote to the study of English nearly double the time they do now ; and their minds, having received culture, they will not have to begin with such trite subjects as young beginners are obliged to commence with. From the Alankara class to the last year of study in the college is some 7 or 8 years and a diligent student in the course of that period will have ample opportunity of making himself familiar with English language and literature.

8. **Fifth Grammar Class.**—Another very important circumstance I beg to bring to the notice of the Council. The fifth Grammar Professor, Pundit Kasinath Tarkapanchannana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.

From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his persent salary, rupees 40 a month and the present librarian, Pundit Girish Chundra Vidyaratna, a very distinguished ex-student of the institution, be appointed to the chair of the fifth Grammar Professor with his present salary rupees 30 a month, to be raised to rupees 40 when a favourable opportunity offers.

9. **Promotions.**—With regard to the promotion of boys from one class to another, the present practice of the college is to keep them in each class

for the allotted number of years, and send them at the expiration of the time to the higher class, without any consideration as to the degree of their acquirements.

Under this arrangement it so happens that a student, not-withstanding he may have finished his course in the class, is not allowed to join the higher one if he has not finished his allotted years, whilst another, let him be now deficient soever in the studies of the class, is promoted to the higher class, simply if he has merely completed the prescribed time. Therefore I beg leave to propose that promotions take place on the principle of merit, not years : only with this limitation, that no one will be allowed to remain in the college beyond the period prescribed by the scholarship rules. I am persuaded that under this arrangement all students above mediocrity will finish their collegiate course of study in less than the time now prescribed.

10. **Discipline.**—The laxity of general discipline in the institution at present is notorious. It is highly desirable that strict and steady attention should be paid to ensure regularity of attendance, to put a stop to students constantly leaving their classes on trivial pretences, and to prevent needless noise, talking and general confusion. There is no inherent cause whatever why the discipline in this college should not be equal to that which obtains in any English institution. The same methods require only to be enacted and enforced.

In conclusion, I beg leave to observe, that the changes now proposed by me in the system of the college are the results of a long and anxious consideration of the subject. They are extensive, but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable. Should the Council be pleased to adopt these suggestions, I have sanguine hopes that the happy and speedy results, under an efficient and steady supervision, will be, that the college will become a seat of pure and profound Sanscrit learning, and at the same time a nursery or improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow-countrymen*

SANSCRIT COLLEGE, I have & c
The 16th December, 1850

Sd/- Iswar Chunder Sarma
Professor of Sahitya in the Sanscrit College.

*Approved by the Council and ordered to be adopted in the next session of 1851-52.

(২) কাউন্সিল এই সংস্কার-প্রস্তাব সমর্থন করলেও স্বদেশীয় কোনও ব্যক্তিকে দিয়ে মূল্যায়ন করিয়ে নিয়ে একধরনের কর্তৃত্বমূলক আত্মসন্তুষ্টি লাভ করতে চেয়েছিল। এ ছাড়া ব্যালেন্টাইনের পরিদর্শনের কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। শাসক জাতির এই অহমিকাবোধ অস্বাভাবিক ছিল না।

ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টটি নিচে উদ্ধৃত হোল,

From my personal intercourse with the accomplished Principal Ishwar Chandra Vidyasagar I have derived the gratification I was led to anticipate both by his reputation and by his report on the college, on which the council sometime ago did me the honour to request my opinion.

With the arrangement of the classes in the Sanskrit College, and with the apparent zeal both of teachers and pupils, I have been much pleased. The course of studies (if the appliances of the institution suffice for its being completely carried out), is very full especially in the English division of the course. On some points of detail, in regard to the selection of class-books, I may have occasion to offer remarks in the sequel. Leaving out of consideration here various topics on which I shall have opportunities of consulting with Pandit Ishwar Chandra by letter, I address myself to the question which I conceive the council to have proposed to me, viz, is there anything in the working of the Calcutta Sanskrit College, or of the Benares Sanskrit College, which might be advantageous adopted by the one from the other ? To reply briefly, I think there is, in both—although in consequence of the difference of local circumstances, the two institutions may still judiciously be left to differ in several respects. The bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom, and uniformity is dearly purchased when purchased by the sacrifice of more serious interests.

A noticeable source of distinction between the two institutions is the fact that the Benares Sanskrit College contains no Bengalees, while the Calcutta College contains nothing else. The Bengalees who are students of Sanskrit College, participating in the general desire for the acquisition of English, which they see in those around them, may advantageously be introduced to the study of English at that point in the course which Pandit Ishwar Chandra has fixed upon. It does not follow that the same arrangement would work will at Benares. To supply instruction to him who graves it and to force instruction on him who does not seek it, are very different things. At the sametime I quite approve of its being compulsory, as it is now in the Sanskrit College, to begin English at the stated date, whether the pupil feel inclined

to it or not, this arrangement being rendered indispensable by the system of class-teaching, the introduction of which into the Calcutta Sanskrit College, has been effected by its present Principal. On the advantage of the class system, in enabling the same teacher to take change of a very much greater number of pupils it is necessary to dwell. Of the difficulties in the way of adopting the system, to the same extent, at Benares, this is not the occasion to peak. It may suffice here to remark that the Bengali boys are in general more pliant than those of the upper provinces, and that Calcutta is so far Inoculated with Anglican feeling, consciously or unconsciously, that an argument from Calcutta to the upper provinces is very apt to mislead. This holds also conversely and therefore, I would offer any suggestion, for the imitation of either college by the other, under this express proviso, that regard be had to the different circumstances of the two places.

Holding, then generally, that the Sanskrit course, in the Calcutta Sanskrit College, is a good one and also (with a complete staff of teachers) the English course, I yet desiderate sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuding the learner that 'truth is double'. This danger is no chimerical one. To take an example ; I am acquainted with Brahmans who, being well-versed in Sanskrit literature and also familar with English, are aware that the European theory of logic & correct, and also the Hindu theory, while at the same time, while at the some time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other. If this be the case with the very best of those who have studied both Sanskrit and English independently, it is not likely that the case will be different with the general run of pupils similarly trained. One reason why this is to be regretted, is that men so educated cannot satisfactorily communicated to their educated fellow-countrymen who are unacquainted with English much of that valuable knowledge which they themselves have gained through the English. They cannot show that our English Sciences are really developments and expansions of truths, the germs, of which the Sanskrit system contain, and therefore, to the mind of their hearers those valued germs appear to be ignored by, or opposed to English Sciences, when they might easily be shown to be involved in it. It is unnecessary to dwell upon this consideration, because the very constitution of the present Sanskrit College, with its English course and its Sanskrit course, implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe, and to interpret between the two removing unnecessary prejudice by pointing

out real argument where these were seeming discordance and conciliating acceptance for the advaning Science of Europe by showing European Science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation.

With the view of determining what points in the Hindu system corresponded with points in European science, some years ago I took up the system called the Nyaya, and (in a work now partly printed in Sanskrit and English, under the title of a Synopsis of Sciences) I showed the points, in that comprehensive system, from which our various sciences branch out. Some portions of this work I have read and discussed with Pandit Iswar Chandra in company with one of my coadjutors, Pandit Vethala Shastri of the Benares College. Pandit Iswar Chandra promises to introduce it to the notice of his classes, and to communicate to me by letter any doubts or difficulties that may arise in the course of the study, so that the crudeness incidental to a first attempt of such a kind may be gradually eliminated in due time. The next volume will commence with the theory of Inductive Investigation. In dealing with this important branch I hope to enjoy the advantage of Iswar Chandra's co-operation. I observe that the places in his list Mill's great work on the subject. As introductory to the perusal of that work I have prepared an abstract of it,—in which I have trained, to some extent, the correspondence between its technical terminology and that of the Nayaya system in its treatment of the some topics. This abstract (printed by order of Government N.W.P.) being from its price etc. more suitable for a class-book than the entire work. I propose its adoption into the course. At the annual examination, I should be glad to supply questions on this and other works here suggested, the replies to which might not only furnish evidence as to the progress of the pupils, but might be so contrived as to lead to a still more complete determination of the way in which the mind of the native literate might be best conciliated to Baconian Speculations.

Besides the Nyaya system, there are two other systems taught in the college viz, the Sankhya and the Vedanta. A text-book of each of the three has been printed, with English version and notes, for the use of the Benares College. This with equal advantage be read in the Sanskrit College here, and the criticism both of the pupils and of the teachers might here also lead to a more complete determination of the precise relation between the philosophical nomenclature of India and of Europe. As there is much in the two systems lastnamed that finds its counterpart in the speculations of Bishop Berkeley, I have reprinted Berkeley's 'Inquiry', with commentary indicative of these

correspondences. I should like that the acuteness of the Calcutta Sanskrit college should be brought to bear upon this exposition also. Where speculation, in countries so widely separated as India and Europe, has arrived at similar or identical conclusions, the convirtion of the fact should naturally tend to beget mutual respect, and mutual respect must naturally tend to facilitate the reception, by the less advanced nation, of the science and philosophy of the more advanced one.

In offering these remarks and suggestions, I have had in vew almost exclusively the desirableness of bridging the charm between the Sanskrit and the English—between the learning of India and the science of England, because the endeavour to bridge the chasm is what peculiarizes the measures introduced during the last few years, into the Benares College, and it was this peculiarity (if I mistake not) that attracted the attention of the council. Pandit Iswar Chandra is perfectly competent to work the some system, and to aid me in improving it. As the Sanskrit College at present stands, there is a good Sanskrit course, and good English course, but the pupil is left to determine himself whether the principles included in these correspond to one another, or altogether conflict, or correspond partly add if so how far. The pupil left to determine this for himself, does not, as we have seen, determine it satisfactorily at all, and therefore (not in the way of substitution for any part of the established course, but as an additional feature necessary to the completion of the design) I have suggested the employment of the treatises above mentioned. If the general principles of this report obtain the approval of the council, as I have reason to believe they have the concurrence of the intelligent Iswar Chandra, I shall co-operate with him most gladly in endeavour to complete the arrangements for such a course of Anglo-Sanskrit education as shall raise up successive bands of men qualified thoroughly to interpret the mind of Europe to that of India for this is indeed the great end of such an institution as we may hope for in the Sanskrit College.

(৩) বিদ্যাসাগর তাঁরই সমমর্যাদার আর একটি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে দিয়ে তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করার প্রয়াসকে আত্মমর্যাদাহানিকর বলে মনে করেছিলেন ; কিন্তু তখনই তাঁর প্রতিবাদ না করে ব্যালেন্টাইনের বক্তব্য খণ্ডনে নজর দিলেন বেশী। তাঁর চিঠিতে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনকে "false system of Philosophy" বলেও অভিহিত করলেন। এই তীব্র সমালোচনা পরবর্তী কালে অনেক হিন্দুরই— যেমন বিহারীলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— পছন্দ হয় নি। বিদ্যাসাগরের চিঠিটি নিচে উদ্ধৃত হল।

In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately introduced into this institution have met with the entire approbation of a man of Dr. Ballantyne's talents and abilities.

With regard to the adoption of class-books recommended by Dr. Ballantyne, I regret to say I cannot agree with him on all points. He appears to recommend the adoption of his abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Under the present state of things the study of Mill's work in the Sanskrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne's principal reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit of purchasing standard works at high prices. So we need not be deterred from the adoption of this great work on that consideration. Dr. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, "as introductory to the perusal of that work.' But the great author himself, in his preface, strongly recommends Archbishop Wheately's treatise on Logic as the best introduction to his work. I, therefore, leave the matter to the decision of the council. Dr. Ballantyne also recommends to adopt as class-books three text-books of each of the three systems of philosophy,—Vedanta, Nyaya, and Sankhya—printed with the English-versions and notes. Of these the Vedantasara, text-book on Vedanta, is already a class-book here, and its version in English might be read with advantage. The two other text-books recommended by him, the Tarkasangraha the text-book on Nyaya and the Tattwasamasa, that on the Sankhya, are very poor treatises in their own departments. We have better treatises in our curriculum. With regard to Bishop Berkeley's 'Inquiry', I beg to remark that the introduction of it as a class-book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbound reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanskrit course, we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's 'Inquiry' which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when by the perusal of that book, the Hindu students of Sanskrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta systems are corroborated by a philosopher of Europe, their reverence for these two system may increase instead of being

diminished. Under these circumstances, I regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adopting of Bishop Berkeley's work as a class-book.

I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanskrit and English courses in the Calcutta Sanskrit College are good and yet desiderates 'sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that 'truth is double', 'this danger,' says Dr. Ballantyne, 'is no chimercal one'. 'To take an example, he continues, 'I am acquainted with Brahmans who being well-versed in Sanskrit literature and also familiar with English, are aware that the European theory of logic is correct, and also the Hindu theory, while at the same time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other.' I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanskrit sciences and literatutes. Truth is truth if properly percieved. To believe that 'truth is double' is but the effect of an imperfect perception of truth itself—an effect which I am sure to see removed by the improved course of studies we have adopted at this institution. It must be considered as a singular circumstance if an intelligent student cannot perceive identity of truths where there is real identity. Suppose students read logic of any other department of science or philosophy both in Sanskrit and English. If they be found to assert, 'that the European theory of logic is correct and also the Hindu theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other', the hearer is naturally led to conclude that either they could not comprehend the subject with sufficient clearness, or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed, however, that there are many passages in Hindu philosophy which cannot be rendered into English with ease and sufficient intelligibiliy only because there is nothing substantial in them.

I further beg leave to state that I regret I cannot but differ a little from Dr. Ballantyne when he observes 'that the very constitution of the present Sanskrit College with its English course and its Sanskrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret

between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance, and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by shewing that European science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation.' 'It is not possible in all cases, I fear, that we shall be able to them real agreement between European science and Hindu shastras. Even if we take it for granted that we shall be able to point out agreement between the two, it appears to me, to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe. They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakable. Any idea when brought to their notice either in the form of a new truth or in the form of the expansion of truths, the germs of which their shastras contain they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to their old prejudices. To characterize them as a class I can do no better that quote the words of Omar. When Amru, the Arab General the conqueror of Alexandria wrote to Omar about disposal of the Alexandrian library, the Caliph replied, ~The contents of those books are in conformity with the Quran or they are not. If they are the Quran is sufficient without them ; if they are not, they are pernicious, let them, therefore, be destroyed.' The bigotry of the learned of India, I am ashamed to state, is not in the least inferior to that of the Arab. They believe that their shastras have all emanated from omniscient Rishis and, therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversation any new truth advanced by European science is presented before them, they laugh and ridicule. Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, especially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a scientific truth, the germs of which may be traced out in their shastras, instead of shewing any regard for that truth, they triumph and the supersitious regard for their own shastras is redoubled. From these considerations, I regret to say that I cannot persuade myself to believe that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths. Dr. Ballantyne's views may be successfully carried out in the North-West Provinces where his experience has made him arrive at his conclusions with regard to the learned of India.

But in Bengal the case is different. His remarks that 'regard be had to the different circumstances of the two places' and that 'the bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom' are very judicious. The local

circumstances of this part of India compel us to pursue a different course for the dissemination sound knowledge. I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at all interfere with he learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining their former ascendancy. To whatever part of Bengal is the influence of education extending, there the learned of the country are losing their ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of colleges and schools in different parts of the country has taught us what we can do, without attempting to reconcile the learned of the country. What we require is to extend the benefit to education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of vernacular class-book on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanskrit College should be directed. That the students of our Sanskrit College, when they shall have finished their college course will prove themselves men of this stamp we have every reason to hope. Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanskrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt. If the contemplated new organisation of the English Department be sanctioned, there is every possibility of their being able to attain considerable proficiency in the English language and literature and thereby acquire a considerable amount of useful information. It is very gratifying to observe that they have lately begun to think in such a way as to promise that hereafter every qualified student will be found free from all the prejudices of his countrymen. A specimen of what may be expected from the Sanskrit College here, I beg leave to enclose here in an English translation of a Bengali essay of the past session by a senior student [Ramkamal Sharma—student of the philosophy class] of this institution who has still about three years to finish his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature.

In conclusion, I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the council with great confidence that the Sanskrit College will become a seat of pure and profound Sanskrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.'

(৪) বিদ্যাসাগরের বক্তব্য জানার পরও এডুকেশন কাউন্সিল ১৮৫৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর যে সিদ্ধান্ত নিলেন তাতে মনে হয় তাঁরা বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি সম্যক অনুধাবনের চেষ্টা না করে ব্যালেন্টাইনের বক্তব্যকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বিদ্যাসাগরকে ব্যালেন্টাইন সংকলিত এবং তাঁর অনুমোদিত বইগুলি ব্যবহারের নির্দেশ দেন। অধিকন্তু তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে উপদেশ নেওয়ারও ইঙ্গিত দেন। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয় তাঁরা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যালেন্টাইনের পরিদর্শনকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি এইরূপ নির্দেশকে আত্মমর্যাদাহানিকর বলে মন্তব্য করলেন এবং যে সংস্কারগুলি তিনি শুরু করেছেন, সেগুলি যথাযথভাবে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিলেন। তাঁর চিঠিটি এইরূপ—

My dear Sir,

After the most attentive consideration of the orders of the Council in reference to Dr. Ballantyne's report on the Sanskrit College, I feel compelled to inform you that those orders, if carried out in their integrity, will involve a degree of interference with the scheme of study lately adopted by me with the sanction of the council that will not only make my position in the college somewhat unpleasent but will tend, I am convinced, to impair the usefulness of the institution itself.

In the hurry and bustle of closing the college and of preparing to go home I am unable to write officially on the subject. But before I leave Calcutta I am anxious to state to you briefly some of the more important objections to the carrying out of Dr. Ballantyne's plan which have ocurred to me.

For the present at least I am unwilling to mix up with the discussion of an important matter any question of a personal character in being forced to adopt a plan of study which I cannot approve of or in being obliged to communicate to a fellow principal in the same position in the service with myself on the progress of my classes,—conditions which I suspect few educated Englishmen will be found to submit to. Waiving such personal considerations I will come at once to the real question at issue.

Dr. Ballantyne's suggestions seem to me to be based upon the assertion that without their adoption the danger of the Anglo-Sanskrit scholar being a follower of 'double-truth' cannot be avoided. I will not pretend to question that Doctor's experience among his learned friends at Benares. But of this I am certain that not a single instance can be pointed out in Bengal of any sensible man who has studied English as well as Sanskrit being persuaded that 'truth is double.'

Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of the English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled, if supported and encouraged by the council, to furnish you with a body a youngmen who will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the educated eleves of any of your colleges, whether English or Oriental. To enable me to carry out this great—this darling object of my wish I must (excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered. So far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises—such for instance as his excellent edition of the Novum Organum in English, I will avail myself of them most readily and cheerfully. But if compelled to adopt all his compilations without any reference to my own humble judgement as to their utility and value or to their adoptation to the peculiar wants of the itstitution over which I have the honour to preside 'my occupation is gone.' Such a system would break in upon and interrupt my own plan of instruction and in spite of my sense of duty as a servant of the council the responsibility which I now keenly feel will be assuredly weakened if not destroyed.

I hope these hings, somewhat ramblingly and hastily thrown out, will receive the kind and indulgent consideration of the Council, so as to induce them to modify their Resolution of the 14th ultimo so far as not to make the course of study in the Sanskrit College a compulsory one.

If required I shall be happy to send in an official and consequently a more formal letter on the subject after the termination of the holidays.

বিদ্যাসাগরের এই চিঠি পাওয়ার পর কাউন্সিল আর কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। বরং দেখা যাচ্ছে যে ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের মাসমাহিনা বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়। ১৮৫৪ সাল থেকেই কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এর নাম হয় ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইন্সট্রাক্‌শন (DPI)। ১৮৫৫-৫৬ সালের DPI-এর বিবরণীতে বিদ্যাসাগরের সংস্কারের প্রশংসাই করা হয়েছে।

"The course of instruction at the Sanskrit College adapted, as it has of late been, to modern ideas and to purposes of practical utility, is being successfully carried on and administered by its able Principal, Pandit Ishwarchandra Sharma, and is producing results, the effects of which upon the education of the lowest classes cannot be overrated."

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার নিয়ে সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংঘাত গুরুতর রূপ ধারণ করে নি বটে, কিন্তু জনশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রশাসন বিদ্যাসাগরের জেদের কাছে নতি স্বীকার করেনি। কারণ বিদ্যাসাগরের জনশিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি মেনে নেওয়া তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে সম্ভব ছিল না।

খ. জনশিক্ষা প্রসারে ও পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

বিদ্যাসাগর, বস্তুতপক্ষে, জনশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টায় সংযুক্ত থাকতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কার্যকরী হওয়ার পরই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে পদাধিকার বলে (ex-officio) সুপারিন্টেডেন্ট বা মাতৃভাষার স্কুলগুলির পরিদর্শক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের জন্য স্কুল পরিদর্শকের চাকুরি নিতেও আগ্রহী হয়েছিলেন।

জনশিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা, প্রয়োগ এবং ফলাফল নিম্নলিখিত দলিল-গুলিতে পাওয়া যায়। জনশিক্ষাসংক্রান্ত হ্যালিডের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা এবং বিদ্যাসাগরের "Notes on Vernacular Education" এর উপর ভিত্তি করেই তৈরী হ'য়েছিল। হ্যালিডে সেই নোটটি তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে ভারত সরকারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দলিলগুলি হলো ঃ

(১) Notes on Vernacular Education এবং হ্যালিডের পরিকল্পনা।

(২) তৎকালীন DPI, গর্ডন ইয়ংকে পাঠানো (৮ই অক্টোবর, ১৮৫৫) রিপোর্টের অংশ বিশেষ।

(৩) ১৮৫৬-৫৭ সালে কাউন্সিলকে পাঠানো বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের অংশবিশেষ।

(৪) ১৮৫৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বাংলা সরকারের এক জুনিয়র সেক্রেটারীকে লেখা একটি চিঠি।

১. *Notes on Vernacular Education.*

1. Vernacular Education on an extensive scale, and on an efficient footing, is highly desirable, for it is by this means alone that the condition of the mass of the people can be ameliorated.

2. Mere reading and writing, and a little of Arithmetic, should not

comprise the whole of this Education ; Geography, History, Biography, Arithmetic, Geometry, Natural Philosophy, Moral Philosophy, Political Economy, and Physiology should be taught to render it complete.

3. The elementary works already published, and fit for adoption as class-books, are the following :—

1st. Shishushikha, in 5 parts. The first three parts teach Alphabet, Spelling, and Reading ; the fourth is a little treatise on the Rudiments of Knowledge ; the fifth, a free translation of the Moral Class Book of "Chamber's Educational Course.'

2nd. Pashwabali, or Natural History of Animals.

3rd. History of Bengal, free translation of Marshman's work.

4th. Charupath, or Lessons on useful and entertaining subjects.

5th. Jeebuncharita, a free translation of the Lives of Copernicus, Galileo, Newton, Sir William Herschel, Grotius, Linnoeus, Duval, Sir William Jones, and Thomas Jenkins, in "Chambers's Exemplary Biography."

4. Treatises on Arithmetic, Geometry, Natural Philosophy are in the course of preparation. Treatises on Geography, Political Economy, and Physiology, and the Historical Works and a series of Biographies will have to be compiled. For the present, the Histories of India, Greece, Rome and England will suffice.

5. One Teacher for each school will not be sufficient. Two each at least will be required. Every school will very likely contain from three to five classes, which for one teacher to manage efficiently is impracticable.

6. The salary of Pundits should be at least Rupees 30, 25, 20 per month qualification and other circumstances being taken into consideration. When all the books enumerated above shall be ready for adoption, every school should have a Head Pandit at Rupees 50 a month.

7. Arrangement should be made for the teachers receiving their salaries regularly every month, in their own Stations, without being required to quit their posts.

8. Four Zilas for the present should be selected for operation, namely, Hughli, Nadia, Burdwan, and Midnapur. There should be 25 schools for the present, to be distributed as expediency suggests. These should be established in towns and villages not in the vicinity of English colleges and schools. In

the neighbourhood of English colleges and schools, Vernacular education is not properly appreciated.

9. The success of Vernacular education greatly depends on an active and efficient supervision, as well as the amount of encouragement given to the successful pupils. With Natives in general, the acquisition of knowledge, for the sake of knowledge itself, has not as yet become a motive. It is therefore necessary, that Lord Hardinge's Resolution, which has so long been in abeyance, should be strictly enforced.

10. The following plan of superintendence appears to be much less expensive and far more efficient than any other could possibly be.

11. Two Native Superintendents, each on a salary of Rs. 150 a month, including their travelling charges, to be employed, one for Midnapur and Hughli, the other for Nadia and Bardwan. They are frequently to visit the schools, examine the classes, and rectify the mode of teaching.

12. The Principal of the Sanskrit College to be nominated, the Ex-officio Head Superintendent with no other additional allowance than his travelling charges, which at the most will not exceed Rs. 300 per annum. He is to visit the schools once a year, and to report to the authorities, with whom will rest the management of Vernacular Schools.

13. The preparation and adoption of class-books, and the selection of teachers to be entrusted to the Head Superintendent.

14. The Sanskrit College, besides being a seat of general education, to be also considered as the Normal School, for the training of Vernacular teachers.

15. Thus the training of teachers, preparation and adoption of class-books selection of teachers and general superintendence will be united in one office. This circumstance will remove many inconveniences.

16. An Assistant Head Superintendent to be appointed with Rs. 100 a month. His duty will be to assist the Principal of the Sanskrit College in training up the teachers and preparation of class-books, and to officiate for him while visiting the Vernacular schools.

17. The Patshalas, or indigenous schools under Gurumohashoys, such as they are now, are very worthless institutions. Being in the hands of teachers, generally incompetent for the task they undertake, these schools require much improvement. It will be the duty of the Superintendents to inspect these

schools and give the teachers as much instruction as they can as to the mode of teaching. It will also form a part of the duty of the Superintendents to watch opportunities to introduce, as far as practicable, the class-books above-mentioned. In fact, the Superintendents will take every care to make these schools, as far as possible, useful institutions.

18. Those schools founded by Natives, or Missionaries, which are in the hands of competent teachers, of course deserve attention and encouragement. The Superintendents will be required to visit such schools and to report on their respective claims to encouragement.

19. The Superintendents will also be required to consider it as part of their duty to persuade the inhabitants of towns and villages, within their respective beats, to establish schools upon the model of Government schools.*

The 7th February 1854

(Signed) Ishwar Chandra Surma.

*Selections from the Records of the Bengal Government, No. XXII, pp. 65-74.

হ্যালিডে নিম্নে উদ্ধৃত চিঠিটির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের Notesটিও ভারতসরকারের রর কাছে পাঠিয়ে দেন।

From
The Under-Secretary to the
Government of Bengal,

To
The Under-Secretary to the
Government of India,
Home Department.

Dated Fort William, the 16th November 1854.

SIR,

With reference to the letter from your office noted in the margin, I am directed to inform you, that on receipt of that letter, the Government of Bengal put itself in communication with the Council of Education, with a view to determining the best mode of establishing and extending a sound system of vernacular Education in these Provinces.

No. 749, dated 4th Nov. 1853.

Vide Pro. 24th Nov. 1853. Nos. 126-128

2. The Council of Education gave their careful attention to the subject and have recently reported the result to Government.

3. The Lieutenant-Governor was at that time a Member of the Council of Education, and in that capacity he stated his views of the course proper to be taken, in a Minute, which it seems best, since it still expresses the Lieutenant-Governor's opinions, to set out at length in this place.

The Lieutenant Governor wrote as follows :—

Vernacular Education

(1.) I have very carefully considered this matter, and shall proceed now to state very briefly what steps should, in my opinion, be taken to give effect to the determination of the Most Noble the Governor General in Council, as expressed in the enclosure to Mr. Beadon's letter to the Council of Education, dated 19th November last.

"(2). In the province of Bengal we have a vast number of indigenous

Schools. I have carefully inquired about them from several well-informed persons, Native and European, and I am assured that these Schools are universally in a very low and unsatisfactory condition, the office of School-master having, in almost all cases, devalued upon persons very unfit for the business.

"(3) Our object should be, if possible, and as far as possible, to improve these Schools, and we cannot do better than follow the excellent example of the late Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces, and establish a system of Model Schools as an example to the indigenous Schools, and a regular plan of visitation by which the indigenous School-masters may gradually be stimulated to improve up to the models set before them. By degrees this system may be extended over the whole of Bengal ; but as in the North-Western Provinces, I think it will be wise to begin with a manageable extent of Districts, say four or five Zillahs in the neighbourhood of Calcutta and the Zillahs of Behar.

"(4) If the plan takes root in these Districts, and the Schools produce their expected result in the improvement of indigenous Education now prevalent, it will spread almost spontaneously to neighbouring Zillahs, and each successive extension will be easier and more economical than the earlier attempts.

"(5) I append a memorandum on the subject, drawn up by the energetic and able Principal of the Sanscrit College, who, as is well known, has long been zealous in the cause of Vernacular Education, and has done much to promote it, both by his improved system in the Sanscrit College and by elementary works which he has published for the use of Schools.

"(6) I approve generally of the plan which is contained in the Principal's memorandum, and would wish to see it carried into effect.

"(7) According to this plan, the monthly expense of say 20 Schools, distributed over four Zillahs, and allowing for rewards and a rather more liberal allowance to the Head Superintendent that the Principal has proposed for himself, would be about Rupees 21,000 per annum, or Rupees 5,250 for each Zillah. Mr. Thomason's first plan allowed Rupees 4,500 to each Zillah annually ; but in Mr. Thomason's plan a large extra expense was incurred for European superintendence, with which, in Bengal, I should for the present be willing to dispense. I am aware that Native superintendence is not often to be depended upon without European overlooking; but Pundit Ishwar Chunder

Surma is an uncommon man, who has shown great energy and zeal in this matter, and I should be well pleased to let him try an experiment, in the result of which he is greatly interested, and which I really think will succeed in his hands. My estimate accordingly provides for an allowance to him for this duty of Rupees 200 a month, including travelling charges. This, in addition to the Rupees 300 he draws as Principal, will be a fair remuneration. He has asked for none.

"(8) It would be the duty of the Superintendent and his Staff to visit all Vernacular Schools within their limits, which might be open to their inspection, and to aid and encourage them in every possible way. There is a method of doing this, which has been found successful by a zealous Missionary, and which, together with other methods, might be employed by the Superintendent. It is to supplying books to a promising indigenous School-master, and give him a small pecuniary reward for every boy in his School capable, after a time, of reading and understanding these books, upon condition of being allowed to introduce a superior class of Teachers into the School, as soon as it shall become fit for it. By these means a number of indigenous Schools may possibly be greatly improved at a small comparative expense.

"(9) Something must be allowed for this, and similar attempts in the financial estimate, but it is impossible to say how much.

"(10) Mr. Long, the Missionary, of whom I spoke, has found the expense not to exceed Rupees 75 per mensem for three Schools of 100 boys each, after introducing a greatly improved, though still simple system of tuition, or Rupees 25 for each School, which is reasonable enough.

"(11) It would also be the business of the Superintendent and his Staff to encourage and assist Zemindars and other persons in the interior to establish village Schools at their own expense, and to supply them with proper Masters and books.

"(12) If these measures were adopted, and if at the same time direct encouragement were given to Vernacular Education, by a regular system of preferring for even the lowest offices under Government persons able to read and write, there can be no doubt that a great impulse would be given to the desire for Education which already exists in Bengal ; and by a judicious encouragement and dissemination of approved Vernacular books through the Schools, and occasionally by the establishment of Libraries in fit places, a powerful impression might, in a reasonable time, be made on the Native mind.

"(13) It is the opinion of the Principal of the Sanscrit College, and of others whom I have consulted on the subject, that although admission to the Government Model Vernacular Schools ought at first, and for some time, to be gratuitous, they are certain, at no distant time, to be self-supporting, as all the indigenous Schools now are. Hence the extension of the plan now proposed will not involve a proportionate expense, and though I think it safe (agreeing with our President on that point) to following Mr. Thomson's example in beginning with a few Zillahs at first, I should be prepared to extend it as soon as ever we had been able to feel our way with certainty. There is a second method, by which I whould propose experimentally to further the spread of sound Vernacular Education.

"(14) I append to this Minute a letter from the Rev. Mr. Long, in which he sets forth what he is doing in the way of Vernacular Education in the Zillah of the 24-Pergunnahs, and ask for a Grant in aid.

"(15) Mr. Long teaches, or proposes to teach, in his Schools, History, Biography and Geography, with especial reference to Bengal and India ; Arithmetic, Writing by dictation. Natural History, Grammar and Etymology. He makes use of the indigenous Schools as a foundation to work upon, and he aims at their improvement. He asks for a Grant of Rupees 25 a month, and thinks that this would enable him to double the number of his Schools. He has at present three, he says further, that in visiting indigenous Schools, he is frequently in want of means to give improved books, or pecuniary rewards, and thus to encourage and stimulate improvement. For this he asks further for Rupees 15 per mensem. Total Rupees 40 per mensem. This is a small Grant for such a promise of result. He agrees gladly to have his Schools at all times inspected by Government officers.

"(16) Now I believe that Mr. Long has in this case set an example which will be followed by many Missionaries. Their Schools are numerous and may be made still more so.

"(17) It is notorious that the Missionary Vernacular Schools have succeeded where ones have failed, and with proper inspection, we can be sure of their good working. I think that the time has come when he may wisely use the services of these labourious, zealous, and earnest men. I would recommend that Mr. Long's request be granted by the Government, and that the same be done, within reasonable limits, as to her similar request, that may be made. Nor would I confine this part of the plan to Missionary Vernacular Schools.

I would aid purpose similarly her approved Vernacular Schools that might come forward for the purse. And I think it probable that in this manner we may, in many arts of Bengal, assist the spread of Vernacular Education more rapidly and more economically than by any other means, and perhaps more actively.

"(18) I should propose to use the services of our Native Superintendent as an Inspector and Examiner in such cases of Grants in aid.

"(19) If the plan succeeded as I should expect, we might extend the system over Bengal at a much smaller expense than has been estimated for the commencement of the undertaking ; but it is obvious that the system was extended, we should require a largeı Staff of superintendence, and the time will then I think have arrived for placing the whole business in Bengal and Behar, and the rest of the Lower Provinces, order a European officer, as has been done in the North-Western Provinces.

"(20) I have no information which enables me at present to propose distinct plan for Behar, yet the Zillahs of the Behar Province ought to be left uncared for. They are proverbially in a state of darkness very different from Bengal, where indigenous Schools abound.

"(21) For the present I should advise that a capable Civil Officer would be selected, acquainted with the Behar Province, and that to should be con mitted the duty of organizing a system of Model Schools and indigenous School—encouragement similar to that which in hands of Mr. Reid proved so successful in the neighbouring zillahs the North-Western Provinces.

"(22.) The same Officer might be made use of in giving and superintending Grants in aid in the Behar zıllahs. There are eight zillahs in the Province, equal to the number with which the experiment was commenced in the North-Western Provinces. I should not estimate the sense as likely to exceed that allowed for the same number of zillahs Mr. Thomason. *viz.*, Rupees 36,000 per annum, exclusive, as in North-Western Provinces, of the salary of the Superintendent, which oppose would be, if a Covenanted Officer were selected, Rupees 1,000 mensem. This estimate is also exclusive of Grants in aid of exist-Schools.

"(23) The eight zillahs of Behar would thus be provided for, as are the same number in the North-Western Provinces, at an expense say Rupees 50,000 per annum. Four zillahs in the Lower Provincı would for the present

cost Rupees 21,000 and Grants in aid might be degrees make up a total of a lakh of Rupees. As we advance, the Schools would cost less, but the superintendence might cost much more.

"(24) Putting it at the same rate as the North-Western Provinces, and Behar, the whole annual ultimate expense of Model Schools and superintendence, besides Grants in aid in the Lower Provinces, would not equal two lakhs of Rupees. But this estimate allows nothing for the gradual introduction of the paying system, by which (if the Government were to use its patronage to the encouragement of the scheme) it is certain that a large part of the expense would be covered. It allows nothing also for the operation of grants in aid, by which, I am convinced, our expenses would be very greatly reduced, the same effect being produced in every School where it is employed at less than half the cost.

"(25) On the whole I would recommend that we should propose to Government an annual expenditure of Rupees 50,000 in Behar and Rupees 21,000 in Bengal. We cannot say how much will be required for Grant in aid But we might ask for a discretionary authority to comply with applications, reporting monthly, or if necessary weekly, the amount so granted.

"(26) In like manner we should intimate that an expenditure will be required for Vernacular School-houses and for books, and the encouragement of Vernacular literature for the use of Schools, of which we cannot estimate the amount, but which we propose to ask for as required, and to extend on permission obtained.

"(27) This will leave a large margin for gradual extension, and for Vernacular Education in the Non-Regulation Provinces, regarding which much has already been done in Assam, but on which we are not now, I think, prepared to make any recommendation.

"(28) I have said nothing about Normal Schools for the Education of School-masters. At present very good School-masters are being trained for us in the Sanscrit College, which is becoming, in the hands of the Principal, a sort of Normal School for Bengal ; but the question of a Normal School for Behar will eventually call for consideration.

"(29) I think it would be wise that the experiment now to be made should be conducted at first by the direct agency of Government, and that we should advise the Government to take it into its own hands."

4. In order that the Most Noble the Governor General in Council may be aware of the opinions of the Members of the Council of Education on this proposition, copies of their Minutes are herewith submitted.

5. After giving them every attention, the Lieutenant-Governor remains of opinion that the plan he has proposed is the best for the purpose, and as such he directs me to submit it for the consideration and orders of the Most Noble the Governor General in Council.

I have the honor to be, & c.,
(Signed) HODGSON PRATT,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal.

বিদ্যাসাগরের নোটে যে শিক্ষার পাঠ্যসূচী দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী। বিদ্যাসাগর জনশিক্ষা বা মাতৃভাষায় শিক্ষা বলতে কেবল সাক্ষরতা বা যোগ-বিয়োগ করার শিক্ষাকে শিক্ষা বলে মনে করতেন না। তাঁর প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষায় মানসিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয়ত বিদ্যাসাগর এটি অবৈতনিক শিক্ষা হবে বলে ধরে নিয়েছিলেন। যদিও হ্যালিডে তাঁর চিঠিতে বলেছিলেন যে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এই স্কুলগুলি অদূরবর্তী ভবিষ্যতে 'স্বয়ম্ভর' (self-supporting) হবে বলে তাঁরা আশা করেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের নোটে এ সম্পর্কে কোনও কথা নেই। বরং তিনি শিক্ষকদের যে মাসমাহিনা নির্দেশ করেছেন, এবং মাহিনা দেওয়ার যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তাতে মনে করা অযৌক্তিক নয় যে অন্তত প্রথমদিকে সরকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে বলেই তাঁর ধারণা ছিল।

মডেল স্কুলগুলির পরিদর্শক হিসাবে তার যা অভিজ্ঞতা হোল তা তাঁর রিপোর্টগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে।

এই স্কুলগুলি স্থাপনের সময় বিদ্যাসাগর যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন রিপোর্টে (৮ই অক্টোবর ১৮৫৫) তার বর্ণনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের শ্লথগতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু সবার উপরে, তিনি ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন সরকারের সদিচ্ছা, বস্তুতপক্ষে, আন্তরিক ছিল না। তাছাড়া, সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের সীমিত সামর্থ্যে এবং grant-in-aid কৃপণ করুণায় জনশিক্ষা প্রসার সম্ভব নয়।

(২) Report on the measures taken by the Assistant Inspector of Schools, South Bengal, towards carrying out the instructions regarding Vernacular

Education conveyed in Secretary Grey's letter to the address of the Director of Public Instruction No. 115 dated the 20th April 1855.

On the 1st May 1855, I took charge of the office of Assistant Inspector of Schools. Previous to taking charge, I had submitted to the Director of Public Instruction a memorandum of the measures which I would adopt on being appointed to my new post. These measures were all sanctioned by that officer in his letter of the 26th April 1855, which authorized me to enter upon my duties, and forwarded for my guidance, the Minute of His Honor the Lieutenant-Governor when a member of the late Council of Education, together with other papers on Vernacular Education as noted in the Margin.

Letter from the Reverend Mr. Long to the Hono˝√√rable Haliday of the 27th February 1954.

Letter from Secretary to the Government of Bengal to the Director of Public Instruction No. 115 dated the 20th April 1855.

2. Agreeably to my memorandum aforesaid, I first engaged myself in selecting my Sub-Inspectors, and having selected them, despatched them to the interior to inspect suitable towns and villages for the Model Schools. I was next engaged in examining a large number of candidates for teacherships in the new schools, out of whom I selected 92. Most of these men, however were found not competent to take immediate charge of schools. The establishment of a Normal School became therefore necessary to give them a previous training, and a plan for such an institution being submitted was sanctioned by Government, and the school duly opened by the middle of July.

3. By the middle of June the Sub-Inspectors returned from the interior and submitted their reports. I selected five villages in each district for the Model Schools. It appearing most expedient to open the schools first in the District of Nuddea, I submitted a report on the 25th to the Director (through the Inspector of Schools South Bengal) soliciting his sanction to the establishment of schools in that District, and to the commencement of operations from the first of July following for which I made the necessary arrangements. In this report I made no mention of the expenditure to be incurred on account of the schools, because I understand from the papers forwarded for my guidance that, that point had been settled. But the Director was of opinion that it was necessary to obtain the orders of Government upon the subject and therefore desired that my report should have reference

to it. Accordingly, on the 28th, I sent in a second report, proposing the establishment of six schools in each Zillah, and the appointment of three teachers to each school at a monthly cost of 70 Rupees.

4. His Honor had proposed in his Minute the establishment of five schools in each Zillah with two teachers to each school, at an expenditure not exceeding as I understood fifty five Rupees per month. But as a fresh reference was to be made to Government upon the subject, as above stated, and as it appeared to me that the requirements of each district could not be well met by five schools. I proposed in my second report the establishment of six. I also took this opportunity to propose the appointment of three instead of two teachers to each school, as I had reason to believe that the latter number would not be sufficient. In this report I solicited sanction to the establishment of schools in all the four districts, because I thought it most convenient to obtain the orders of Government upon the subject at once, instead of submitting the point on four different occasions.

5. On the 30th June I waited upon the Director and found him very anxious for the immediate commencement of operations. I also understood from the conversation I had with him, that in anticipation of the sanction of Government I might adopt measures for opening the schools. Measures were accordingly taken by me to commence operations in Nuddea.

6. When at the beginning of July I again waited upon the Director in the hope of receiving final instructions, he shewed me a letter from the Inspector in which I found objections were taken by the latter officer to my report in consequence of no mention having been made in it of the following points : Course of instruction, class books, Sale of books in the schools, Distance and direction of schools from Police Thannahs, Rules for attendance, Schooling fees etc. I explained to the Director that the first two points had not been mentioned by me, because they had been settled in His Honor's Minute, and the third, fourth and fifth points were admited by him to be too unimportant to retard our operations. With reference to the sixth, namely schooling fees, the Inspector had strongly urged that the system should be introduced from the opening of the schools, and in this view the Director appeared to agree. I represented to him that personally I also was strongly in favour of the fee system but that I did not think it expedient to introduce it into the new schools from the commencement, as its introduction, might to a certain extent, throw impediments to our success. It was on this consideration alone, that His Honor was pleased to suggest in his Minute, that admission into the new schools, should at the beginning and for some time be gratuitous.

I further represented to him that in case fees were insisted upon I and my Sub-Inspectors would be placed in a very awkward position, as we had told the villagers in positive terms that the schools would be free at the commencement. The Director however, did not agree with me, and directed me to think over the matter again. Thus this important point remained unsettled, and operations were consequently postponed.

7. I have observed in paragraph 5 that measures had been taken by me to commence operations at the beginning of July. Teachers had accordingly been sent by me to some villages to await the opening of the schools there. I was now obliged to recall them, but at Kancharaparah a school had been opened through a misunderstanding of my instructions before the teachers who had been sent there could be called back. When on my way to Bolagore I visited that village on the 6th July, to postpone the opening of the school that was to be established there, and heard that it had already been opened, I thought long on the propriety or otherwise of stopping it. But as I expected to receive the final orders within a few days, I came to the conclusion, that the one which has been opened might be allowed to go on. But unfortunately those orders directed me to strike out Kancharaparah from the list of villages for model schools, in consequence of representations made to the Director by certain Missionary Gentlemen that the new school would be prejudicial to the interests of an English school which they have at Ghoshparah, a village about 4 miles distant from Kancharaparah.

8. On the 6th July, as aforesaid I was obliged to go the interior, agreeably to engagements which I had made with the inhabitants of Bholagore and Krishnagore Vernacular School Committee to visit those places to report upon the application of the former for a Model School, and of the latter for a grant-in-aid. I also went over to Boinchee to make certain enquiries regarding the vernacular school there.

9. I returned from the interior by the middle of July and on the 26th of that month, I submitted a third report upon the establishment of the model schools. In this report I explained at length the inexpediency of introducing schooling fees from the beginning.

10. I waited upon the Director on the 6th August and learned that final orders had that day been passed upon the subject of the schools, and I was referred to the Inspector for information regarding them. When I called upon that officer in the course of the day, he shewed me the orders in question, which authorized me to open model schools in five villages in each of the Zillahs noted in the margin at a monthly cost of 50 Rupees per each school.

The orders also required that the schools were to be opened on the understanding that the inhabitants of each village should build a suitable school house, and engage to keep it in repair, and that measures should be adopted to erect a gallery and attach a garden or playground to each school house. The Inspector promised to send a copy of these orders for my guidance, but as the same was not received up to the 14th, I called his attention to the subject, and got a reply from him on the same day, embodying the purport of the orders.

Nuddea
Hooghly
Burdwan
Midnapur

11. The above orders threw fresh difficulties in my way. I had made arrangements with the inhabitants of sixteen out of the twenty villages where schools were to be established, for the erection of school houses only, without any reference to galleries and playgrounds, which I did not know would be required. With the inhabitants of the remaining four villages, who were generally not in easy circumstances, I had stipulated that a portion of the expenses for the school houses would be defrayed by Government. In making this latter arrangement, I was guided by His Honor's Minute from which it will be seen that His Honor meditated the construction of these buildings at the expense of the State. I was personally directed by His Honor to the same effect when I was sent by him to the interior in May 1854.

12. Accordingly on the following day 15th August, I wrote to the Inspector representing that if the condition of galleries etc. was enforced our operations could not immediately be commenced, because it would then be necessary to send the Sub-Inspectors again to the villages selected to sound the inhabitants as to whether they were prepared to meet the additional expenditure of galleries etc. and if not fresh villages will have to be selected, the inhabitants of which would act up to the conditions.

13. On the 16th I received a reply from that officer explaining that galleries etc. were not to be considered as conditions, but that it should be ascertained if the villagers were unwilling to give this additional aid. The letter also authorizes me to open schools in the sixteen villages, the inhabitants of which had agreed to erect school-houses, and stated that a reference had been made to the Director regarding the remaining four. On the next day, I received another letter from the Inspector conveying authority to me to open schools in all the twenty villages. The important question of schooling fees was also decided by the Director and I was directed by the Inspector in a letter dated 15th August to postpone the introduction of the same for a period of six months, after which it was not to be deferred, if possible.

14. Operations were accordingly commenced in the district of Nuddea, and on the 23rd August a school was established at Belgorea. Since then fifteen schools as per Margin have been opened up to this day.

Nuddea, Hooghly, Burdwan, Midnapur.

15. After operation has commenced I received a letter from the Inspector on the 28th August enquiring whether any pledge had been given by me to the inhabitants of the four villages who were unable to defray the total cost of school houses, that schools would be established in them, and if otherwise. directing me to select other villages in their stead. It is true I had given no *positive* pledge at the beginning to the inhabitants of the villages in question but on receipt of the Inspector's letter of the 17th August authorizing me to open schools in all the twenty villages, I had assured them that schools would be established in their villages. The requisition of the 28th Item, was therefore rather late. A school had already been opened at Jowgong one of the four villages on the 26th August, or two days before the receipt of the Inspector's last letter referred to. I may here mention however, that the people of two of the four villages have subsequently been induced by me to bear the entire expense of school houses.

16. I now beg to enter upon an account of the other measures adopted by me in connection with Vernacular Education. In my memorandum sanctioned by the Director I had proposed that arrangements should be made to make the School Books as cheap as possible. To this subject I directed my attention, and have been able to compile two new books for beginners and to revise and make cheap editions of others. I am also compiling other class-books myself, and have engaged competent parties in the same task. I hope that at no distant period the following books would be ready for use.

Outlines of Geography

Geography of India.

Biography.

Arithmetic.

Elements of Natural Philosophy.

Popular treatise on Physiology.

Popular treatise on Astronomy.

History of Greece.

History of Rome.

History of England.

History of India.

Rasselas.
Telemachus.
Aesops Fables.

17. I proceed now to offer a few observations on the remarks made by the Inspector in his Quarterly Report, dated 23rd August 1855 and in his letter to the address of the Director dated 13th September following regarding myself. In the former the Inspector states in the 3rd paragraph that I submitted a Report at the end of June for the establishment of Model schools, but the scheme being incomplete and information on certain important points wanting, I was requested to forward a revised Report after making the necessary enquiries, which I did after visits to the interior by myself and my Sub-Inspectors. In respect to this paragraph, I beg to observe that in my Report I merely mentioned the names of the villages I had selected for the Model Schools and solicited sanction to their establishment with permission to use places which the villagers proposed to lend temporarily for our schools before the School Houses would be ready. I proposed no scheme of instruction whatever because I was directed to work out which was recommended by His Honor in his Minute and sanctioned by the Government of India. I do not see on what important points information was wanting, because to my understanding all important questions had been settled by his Honor in his Minute. There was one point only in which information was wanting, it is the distance and direction of the villages selected for our schools from the Police Thannah. But this point did not strike me as very important. It is true I went to the interior before I submitted my third Report, but as I have above explained, I did so in conformity with arrangements made for that purpose with the villages and not to gather information for my report as the Inspector supposes.

18. Again in the 3rd Paragraph of his letter to the Director of the 15th ultimo, the Inspector states that he has taken charge of the indigenous schools himself, because it appeared to him that I preferred that some one else should undertake that duty. I do not remember to have either written or said anything upon this subject, which led the Inspector to this conclusion. All that passed regarding it was that the Inspector in a conversation between us asked me one day whether I had any objection to his visiting the Pautshallahs under Gooro Mohasoys near Goburdanga in Nuddea, to which I replied in the negative. As regards my not having directed my attention to the improvement of those schools from the beginning, I beg to refer to the 9th paragraph of my

memorandum in which it was proposed that I should commence the inspection of the Pautshallahs when the Model Schools were in a settled condition. The Memorandum was approved of by the Director and my attention was therefore entirely directed to the establishment of Model Schools.

19. I take the opportunity to mention the serious inconvenience to which I have been put for want of writer and contingent allowances. At present I am very frequently obliged to copy my letters statements etc. myself, the letters remaining unentered in the Letter Book. In the same manner I write my Bengalee letters to the several Sub Inspectors and Head Masters of the vernacular schools, but for want of hands no copies are kept of them and consequently no Bengalee records are preserved. As respects the contingent expenditure, I beg to state that in the beginning of May last, I had agreeably to verbal instructions from the Director purchased stationery to the amount of 45 Rupees the bill for which has not yet been passed and paid. There are other contingent charges I have to incur for which no provision has yet been made.

Sd/Eshur Chunder Shurma
Assistant Inspector of Schools
South Bengal *

(৩) মডেল স্কুল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ১৮৫৬-১৮৫৭ সালের একটি রিপোর্ট (Report for the quarter ending January 1857) থেকে অংশবিশেষ ঃ

"The progress made by the pupils of the Model Schools is really surprising, considering that the oddest among them have not been established more than eighteen months. The pupils commenced with the Alphabet, and have gone through almost all the Class Books at present available ; such as—

1. Boronoporichoy, or Spelling Book.
2. Rijupat, or Simple Lessons.
3. Kathamala, or Select Fables of Æsop.
4. Nitisar, or Moral Stories.
5. Bodhodoy, or Rudiments of Knowledge.
6. Pashawabali, or Animal Biography.
7. Charitabali, or Exemplary Biography.

' Education Department Consultation, 1 November, 1855, No. 51A

8. Nitibodh, or Moral Class Book.
9. Bhugul Bibarun, or Geography.
,10. Banglar Itihas, or History of Bengal.
11. Patiganit, or Arithmetic.
12. Charupat, or Useful and Entertaining Lessons on Miscellaneous Subjects.
13. Jeeban Charita, or Biography.

This course, it will be seen, includes Geography, History, Biography, Arithmetic, &c.

The first admission into our Schools were, for the most part, from the Indigenous Schools under the Gurumohashoys. At the commencement I was under an apprehension that trained up as the pupils were in the faulty system in use in those Schools, our system would be distasteful to them. I have, however, been agreeably surprised to find that, attracted by the novelty of our system, they have, by dint of great vertion and unwearied zeal, made so much progress in so short a time.

Some of the pupils of the Model Schools have entered the Calcutta and Hooghly Normal Schools, and others the Bengali Class of the Medical College. The admission of such pupils into the Normal Schools is certainly an advantage to those Institutions. They have been found to be surperior to outside candidates, owing to their having received a regular preparatory training in the Model Schools. I have consequently every reason to hope that these pupils will make better Teachers in a shorter space of time than their other class-fellows. The time, I think, is arrived when the system of pupil Teachers may be introduced......

The list of books given above does not comprise the whole course attended for the Model Schools. Those that were ready for use have been introduced in them. Others are under active preparation. The complete course will include History, Biography, Geography, Arithmetic, Geometry, Elements of Natural Philosophy, Natural History, Moral Philosophy, and Political Economy. I am aware that this course would be considered by many persons as high for the pupils of Vernacular schools. They think that the course of instruction should be a very committed one.

This opinion appears to have been formed under an impression that the Students of those Schools are generally the children of the working classes, who cannot afford to keep them there for the period necessary to complete

any extensive course. This impression is certainly erroneous. There are three different classes of pupils in the Vernacular Schools, the children of the higher, middling, and lower classes. The first classes having means at command will generally withdraw their children from the Vernacular Schools after they have acquired a tolerable knowledge of Bengali and transfer them to English Schools or Colleges. The class, from straitened circumstances, will, in many cases, not be able to keep their children in School for the whole time required to complete the course, and will generally withdraw them as soon as they will able to read and write and have learnt a little of Arithmetic and Mensuration. But the second class, whose children constitute the majority of the pupils in the Vernacular Schools, have the will to give them tolerably complete Education, which, however, for want of means, can never do in English. They must, therefore, continue their children in the Vernacular Schools to finish a complete course, and this class of pupils the aforesaid course, in my humble opinion, to be absolutely necessary.

It has been stated, in the preceding para that the children of the working classes form the minority in the Model Schools. Parties I know complain on this account, saying that the object of these Schools, which were opened more for the masses than for any other class, has not been attained. As far as I am aware, Government had no such object in view ; the Schools were established for setting on foot a complete course of instruction in Bengali and thereby affording opportunities to the natives generally for imitation. Then again these Institutions are regulated on principles which will always act as a great drawback on the working classes. Here children are not only required to buy their slates, books, &c., but have to pay monthly Schooling Fees. Labour in this country is so cheap that the earnings of the working classes are scarcely sufficient for their maintenance. They cannot, therefore. be expected to incur extra charges for the education of their children. If those classes are to be educated, the Education must be imparted to them gratis so long as their condition is not bettered ; otherwise, it is not reasonable to expect that those classes will reap any material advantage under the system in force in the Vernacular Schools.

The success of Vernacular Education will depend materially upon the encouragement given in the way of providing the *Alumni* of those Institutions with offices under Government. People are eager to give their children an English Education, because they believe that such Education would ensure

for them public employment, and that Education in any other language would be of no avail. This latter impression should be removed from their minds by providing Vernacular Students with suitable employment. They should, for instance, be nominated to lower posts in the Judicial or Revenue Departments, receiving promotion as they distinguish themselves by their abilities and experience. It may, I believe, be safely affirmed that Subordinate officers from this class would be more efficient as well as trustworthy than the class of men who at present fill those offices.

The inhabitants of nearly all the villages in which our Model Schools have been established continue to feel a lively interest in their welfare. People who were at first not favourably disposed towards them, have commenced to appreciate their usefulness, and are by no means behind their neighbours in their zeal for the welfare of those Institutions. For instance, in the District of Hooghly, Kissennagore is considered as the chief seat of Hindu learning next to Nuddea. The orthodox Pundits of that viilage had, on the opening of the Model School there, not only slighted that Institution, but spoke of it disparingly before others. The same men having witnessed the rapid progress made by the pupils of the School have begun to send their children to it. In the same way the inhabitants of the village of Seakhalla, in Hooghly, with the view to manufacture bricks for the School-house, have, in consequence of not being able to procure other fuel, cut down several aswattha trees, which, in the eyes of orthodox Hindus, are considered sacred, and the feeling of them an act of impiety. Again, in the village of Protappore, in Midnapore, the principal inhabitants are so anxious for the continuance of the School in that village, that they have agreed to defray from their own pockets any amount of Schooling Fees which may remain unrealized at the close of the month, as well as purchase books for such of the students as cannot afford to do so in consequence of their inability to meet those charges. These Schools may also be said to have excited a desire in the inhabitants of the Mofussil for imitating them, and in consequence many aided Schools have been established.

(৪) বিদ্যাসাগরের ২৯শে সেপ্টেম্বরের (১৮৫৯) চিঠিটি তাঁর হতাশার প্রতিফলন। সরকারী অর্থে ও সরকারী পদ্ধতিতে তাঁর পরিকল্পিত জনশিক্ষা প্রবর্তন যে অসম্ভব, তা অনুধাবন করেছিলেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারের কোনও বিরূপ সমালোচনা থেকে বিরত ছিলেন। বরং তিনি প্রস্তাব দিলেন যে সরকার যেন উচ্চশ্রেণীর (উচ্চবিত্তশ্রেণীর) ছাত্রদের একটি সুসম্পূর্ণ

শিক্ষা দেওয়ার দিকেই নজর দেন, কারণ জনশিক্ষা কাঙ্ক্ষিত হলেও দেশের সমূহ জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি ইংল্যাণ্ডের ন্যায় সভ্যদেশেও সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। বিদ্যাসাগরের এই পরাজয় ও হতাশা তার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল অনিবার্য।

"From Baboo Eshwar Chundra Sharma, to Rivers Thompson, Esq., Junior Secretary to the Government of Bengal,—(dated the 29th September 1859)

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your Predecessor's circular letter No. 288, dated the 17th June last, relative to the practicability of promoting really cheap Schools for the masses in Bengal, and in reply to state that, in my humble opinion, it seems almost impracticable, in the present circumstances of the country, to introduce any system of education with such limited expenditure as is contemplated by Government, *viz.* Rupees 5 to 7 a month for each School. Men, who are qualified to teach mere reading, writing and a little of Arithmetic with any degree of success, however great their attachment to their Native villages may be, cannot be induced to accept service on such low remuneration. I am not aware of the qualifications of the man instanced by Mr. Harrison in his report, but I feel certain that his reluctance to accept the post offered to him proceeded from other causes than his particular attachment to his village ; for I understand that he has subsequently accepted a post, out of his own village, of smaller emoluments than that at first offered to him.

I have no precise information about the system pursued in the Hulkabundee Schools in the North-Western Provinces. But presuming that, that system has been adopted in the Behar Schools, I would beg to observe that in many respects it is similar to that prevailing in the indigenous Schools of Bengal. The course of instruction in the Behar Schools is, I understand, limited to letter writing, and Zemindar and Shopkeeper's accounts, and the only difference between them and the Bengal Schools is, that few printed books of an improved character are nominally used in the former. If the object of Government be to promote such a system of education in Bengal, a small monthly pay to the Goroomohashoys, the introduction of a few printed books in their Schools, and placing those Schools under Government inspection would easily secure that object. But I must remark that such education, insignificant as it would be, will not extend to the masses, if by that word is meant the labouring classes ; for even now, both in Behar

and in Bengal, few, if any, from these classes are to be found among the pupils of those schools.

This state of things is to be ascribed to the condition of the labouring classes. It is generally so low that they cannot afford to incur any charge on account of the education of their children. Neither can they continue their boys in School, after the latter have attained that age when they become fit for any sort of work, which would secure some kind of remuneration however trifling it may be. They think, and perhaps rightly, that if this children learnt a little of reading and writing, it will not better their condition, and therefore they feel no inducement whatever in sending them to School. It is too much to expect that they would educate their children merely for the sake of knowledge, when even the higher classes do not yet properly appreciate the benefits of education. Under such circumstances it is needless to attempt the education of the labouring classes. But should it be in the contemplation of Government to try the experiment it must be prepared for giving education free of all charges. It may be mentioned here, that experiments have been made by private individuals, the results of which have not however been satisfactory.

An impression appears to have gained ground, both here and in England, that enough has been done for the education of the higher classes and that attention should now be directed towards the education of the masses. This impression has evidently been caused by the too favourable character of the Reports and Minutes on education. An enquiry into the matter will however show a very different state of things.

As the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale. By educating one boy in a proper style the Government does more towards the real education of the people, than by teaching a hundred children mere reading, writing and a little of Arithmetic. To educate a whole people is certainly very desirable, but this is a task which, it is doubtful, whether any Government can undertake or fulfil. It may be remarked that, notwithstanding the high state of civilization in England, the masses there are no better than their brethren in this country on the point of education."*

*Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, October 1860, No. 58